প্রাণিসম্পদ ম্যানুয়াল

সম্পাদনায়ঃ

মোঃ সফিকুর রহমান
বিএসসি এ.এইচ (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)
এম.এস ইন এবিজি (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ)
ম্যানেজার
সরকারী হাঁস মুরগি খামার, রাজবাড়ী

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

www.dls.gov.bd

হাঁস-মুরগী পালন

মডিউল -১

হাঁস-মুরগী পালনের প্রাথমিক নিয়মাবলী ঃ

১.১ অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাঁস-মুরগীর ভূমিকা ঃ

বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম । মানুষের প্রধান মৌলিক চাহিদা খাদ্য । খাদ্য হিসাবে পোল্ট্রির ডিম ও মাংস আমিষ সরবরাহে অন্যান্য খাদ্য হতে অধিক গ্রহণযোগ্য ও উপাদেয় । পোল্ট্রিজাত খাদ্য দ্রব্য যেমন দেহে শক্তি যোগায় ঠিক তেমনি দৈহিক বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে । বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ, জনসংখ্যার একটি বড় অংশ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। তাদের মৌলিক চাহিদার খাবার টুকুই জুটে না। তারপর সুষম খাদ্যের কথা তো কল্পনা করাই যায় না। তাদের নানা রকম পুষ্টিহীনতা আছেই। হাঁস-মুরগী পালন করলে এ পুষ্টিহীনতা দূর করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা যায় । বর্তমান সময়ে তাই সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে লাভজনকভাবে হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র পরিসরে পারিবারিক পোল্ট্রি উৎপাদন উন্নয়নশীল দেশসমূহের গ্রাম ও শহরতলী এলাকার লোকদের খাদ্য নিরাপত্তা ও দরিদ্রতা নিরসনে যথেষ্ট অবদান রাখে । পোল্ট্রি উৎপাদন পরিবারের বেকার জনগোষ্ঠিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে । ফলে দরিদ্র জনগন অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় করতে পারছে, তাদের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকায় মাংস ও ডিম যোগ হচ্ছে ফলে তারা রোগ-বালাই দ্বারা কম আক্রান্ত হওয়ায় ঔষধ খরচ ও চিকিৎসা খরচ বেঁচে যাচ্ছে । সঞ্চিত অতিরিক্ত অর্থ দরিদ্র জনগন তাদের স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের পিছনে ব্যয় করতে পারছে ।

নিম্নে হাঁস-মুরগি পালনের গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ননা দেয়া হলো ঃ

১. স্বল্প ব্যয়ে অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন করা ।
২. স্বল্প মূলধনে পোল্ট্রি ব্যবসা শুরু করা যায় এবং অর্জিত আয় হতে পরিবার প্রতিপালন করা সম্ভব ।
৩. আধুনিক পদ্ধতিতে পোল্ট্রি খামারের জন্য খুব বেশী জমির প্রয়োজন হয় না বিধায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের পক্ষে এ ব্যবসা করা সম্ভব ।
৪. পোল্ট্রি ব্যবসায় অল্প সময়ে অধিক উপার্জন হয় বিধায় দরিদ্রতা নিরসনে এর গুরুত্ব অপরিসীম ।
৫. পোল্ট্রির মলমূত্রে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান । জৈব সার হিসাবে পোল্ট্রির মলমূত্র গুরুত্বপূণ । এ ছাড়া পোল্ট্রির মল মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় ।
৬. খামারীগন বন্যা, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি পোল্ট্রি পালন/ব্যবসার মাধ্যমে পুষিয়ে নিতে পারেন ।
৭. পেল্ট্রি খাদ্য, টীকা, ঔষধ পত্র, ও অন্যান্য উপকরণাদি/সরঞ্জামাদি উৎপাদন ও বাজার জাতকরনের সাথে বহু লোকের কর্মসংস্থান জড়িত ।

পোল্ট্রির সংজ্ঞা, মুরগির বিভিন্ন জাত ও বৈশিষ্ট্য ঃ

আধুনিক পোল্ট্রির সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক। সাধারনতঃ আমারা যেসব পাখি বানিজ্যিক বা সখের উদ্দেশ্যে নিয়ে বাসায় বা ঘরে পুষে থাকি, তাদের সবাইকে নিয়েই পোল্ট্রির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। মুরগি, হাঁস,কবুতর টার্কি, কোয়েল ,কাকতুয়া ইত্যাদি পোল্ট্রির অর্ন্তভুক্ত । মোরগ মুরগির জাত তাদের উৎপত্তিস্থান ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী করা হয়েছে। যেমন

ক) আমেরিকান জাত

বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ -

পায়ের নালা পালকবিহীন

কানের লতি লাল রংয়ের

ডিম উৎপাদন ও মাংস উৎপাদন মধ্যম

আকার মাঝারি

গায়ের চামড়া হলুদ

ডিমের রং বাদামী

কয়েকটি জাতের নাম ঃ

পস্নাইমাউথ রক (Plymouth Rock)

রোড আইল্যান্ড রেড (Rhode Island Red)

ইংলিশ জাত

বৈশিষ্ট্য

- কানের লতি লাল
- ডিম ও গোস্ত উৎপাদন মধ্যম ধরনের
- গায়ের চামড়ার রং হলুদ
- আকার মাঝারি ৩½- ৪ কেজি
- ডিমের রং বাদামী

কয়েকটি জাত

- অষ্ট্রালরপ(Australorp)
- সাসেক্স (Sussex)

ভূ-মধ্য সাগরীয় অঞ্চলের জাত

বৈশিষ্ট্য

- কানের লতি সাদা
- ডিম ও গোস্ত উৎপাদন খুব ভাল
- গায়ের চামড়ার রং সাদা
- আকার মাঝারি ছোট
- ডিমের রং সাদা
- উৎপাদন ক্ষমতা বেশী।

কয়েকটি জাত

- হোয়াইট লেগহর্ন
- মাইনোরকা

এশিয়াটিক ক্লাস

কোন স্বীকৃত জাত নেই তবু যে গুলোকে অমরা জাত বলে থাকি তাদের বৈশিষ্ট্য হলঃ

- পায়ের নালায় পালক থাকতে পারে
- গায়ের চামড়া হলুদ
- কানের লতি লাল
- আকারে বেশ বড়
- ডিমের খোসার রং বাদামী

কয়েকটি জাত
আসিল (Asel)
কোচিন(Cochin)
বর্তমানে অনেক শংকর জাত বের হয়েছে তাদের নাম ,
লেয়ার -
লোহম্যান হোয়াইট/ব্রাউন, ইসা ব্রাউন, ব্যাবকক, বিবি -৩০০, ব্যাবলোনা হারকো, ব্যাবলোনা টেট্রা,হাবার্ড ব্রাউন,বোভান্স নেরা, ইসা ব্রাউন, ষ্টারক্রস ব্রাউন, হাইসেক্স ব্রাউন, সেভার ব্রাউন, ইসারোজ,গোল্ড লাইন।

ব্রয়লার

সেভারষ্টার ব্রো, সেভার মাষ্টার, ভেনকব, ইসা ভেডেট, ইসা আই ৭৫৭, ইসা এসপিকে, লোহম্যান মিট, রস-১০০, হাইব্রো , হাবার্ড ক্লাসিক।

১.২ হাঁসের জাত ও বৈশিষ্ট্য ঃ

পিকিং

উৎপত্তিস্থান চীন
গায়ের রং সাদা
ডিমের জন্য ভালো
গড়ে ১৫০- ১৬০ টি ডিম দেয়।
ওজন ৪ - ৪.৫ কেজি

মাসকোভি

আকারে বড়, মাংসের জন্য ব্যবহার করা হয়।
ওজন ৬ - ৭ কেজি হয়।
ডিম উৎপাদন ৮০ -১০০টি ।

ইন্ডিয়ান রানার

উৎপত্তি স্থান ভারত হলেও পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়। সাদা রংয়ের হাঁস। ওজন ১.৫ - ২ কেজি।

আরও উন্নত শংকর জাতের হাঁস আছে। ভিয়েতনামের চেরীভ্যালি জাত ডিম ও মাংসের জন্য পৃথক ভাবে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

মডিউল -২

হাঁস-মুরগির বাসস্থান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

২.১ মুরগির বাসস্থানের প্রকৃতি এবং ব্যবহৃত উপকরন ও সরঞ্জামাদি ঃ

মুরগি থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ মাংস এবং ডিম উৎপাদন পেতে হলে তাদের জন্য আরামদায়ক উপযুক্ত পরিবেশ ও আভ্যন্তরীন ও বহি:রস্থ সর্ব প্রকার শত্রুর আক্রমন হতে রক্ষা করার উপযোগী বাসস্থান প্রয়োজন হয়।

বাসস্থানের প্রকৃতিঃ

মুরগীর ঘর এমন ভাবে তৈরী করতে হয় যেন ঘরের ভিতর অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকে।

যেমন ঃ

- ঘরের ভিতর উৎপাদিত বিষাক্ত গ্যাস অপসারিত হয় ;
- ঘরে ব্যবহৃত লিটার আর্দ্রতামুক্ত থাকে;
- ঘরের ভিতর পর্যাপ্ত পরিমান বিশুদ্ধ বাতাস চলাচল করতে পারে;
- এক ঘর হতে অন্য ঘরের মধ্যে জীবাণু সংক্রমণ না হতে পারে;
  সমস্ত প্রকার প্রতিকুল আবহাওয়া ও পারিপার্শিক পরিবেশ থেকে মুরগী রক্ষা পায়।

মুরগির জন্য অনুকূল পরিবেশঃ

দৈহিক তাপমাত্রা

মুরগির জাত ,বয়স ,লিঙ্গ এবং উপযোগীতা অনুসারে এই তাপ ভিন্ন ভিন্ন হয় ঃ

যেমন-

- সদ্য উৎপাদিত বাচ্চা ১০৩ফা. (৩৯.৪সে:)
- ৩ সপ্তাহ বয়সে ১০৫ফা: (৪০.৬ সে:)
- পূর্ণ বয়সে ১০৭ফা: (৪১.৭ সে)
- হাল্কা জাতের মুরগির তুলনায় ভারী জাতের মুরগির দৈহিক তাপ কম;
- মুরগির তুলনায় মোরগের দৈহিক তাপ বেশী
- ব্রয়লার মুরগির দৈহিক তাপ কম
- মোলটিং সময়ে দৈহিক তাপ বৃদ্ধি পায় ।

এরুপ আবহাওয়া, অদ্রতা, বিষাক্ত গ্যাস, রোগজীবানুর বিস্তার সম্পর্কে বিভিন্ন কৌশলগত দিকগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে।
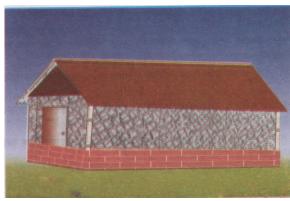
মুরগির ঘরের প্রকৃতিঃ

মুরগির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ প্রকার ঘর ব্যবহার করা হয় ।

যেমন-

(ক) উন্মুক্ত ঘর

(খ) পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘর

(গ) হাইরাইজ ঘর

(ক) উন্মুক্ত ঘর

চিত্র-১ উন্মুক্ত ঘর
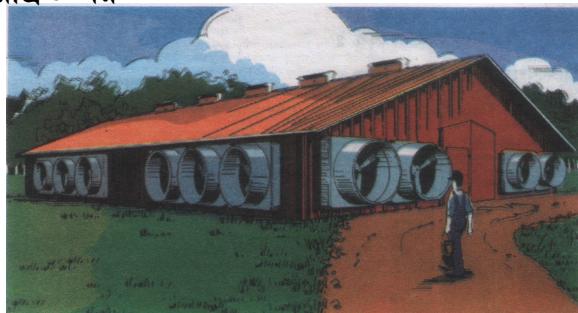
চিত্র নং - ২ উন্মুক্ত ঘর

চিত্র নং -২ বহুতল বিশিষ্ট

- এই ঘর প্রাকৃতিক আলো বাতাস চলাচলের জন্য চারদিকে অথবা উত্তর দক্ষিণে উন্মুক্ত রাখা হয়।
- এই প্রকৃতির ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি ভাবে স্থাপন করা হয়।
- উন্মুক্ত ঘর নিমার্ন খরচ কম।
- প্রাণিপাখির প্রবেশ ও আক্রমন হতে রক্ষার জন্য উন্মুক্ত স্থান তারের জাল দিযে ঘিরে বেড়া দিতে হয়।
- ঘরের ভিতর লিটার অথবা মাঁচা ব্যবহার করা যায়।
- এই প্রকৃতির ঘর সর্বাধিক ৩০ ফুটের (৯.০ মিটার)বেশী প্রশস্ত হলে ভেন্টিলেশন সমস্যা হয়।
- ঘরের লিটার ব্যবহার করলে খোলা স্থানের নিচের অংশ ১ হতে ১.৫ ফুট (৩০-৪৫ সে.মি.)উচুঁ দেয়াল থাকে মাঁচা বা খাঁচা ব্যবহার করলে কোন দেয়াল থাকে না।
- দোচালা ঘরের চালের ছাচ ৮ ফুট (২.৪ মিটার) এবং উভয় চালের শীর্ষ দেশ ১৪ ফুট(৪.২ মিটার) উচুঁ হয় । ছোট ঘর হলে ছাচ ৬ ফুট এবং শীর্ষদেশ ১২.০ ফুট হতে পারে।
- বৃষ্টির ছাট ঘরে প্রবেশ বন্ধ করার জন্য চালের ছাট ২.৫ হতে ৪ ফুট বাড়তি রাখা হয়।
- কংক্রিট ছাট হলে বহুতল ঘর নির্মাণ করা যায়।
- ঘরের দৈর্ঘ্য ইচ্চামত লম্বা করা যায়।
- ঘরে স্বংয়ক্রিয় খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলে সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক্রমে ঘরের দৈর্ঘ্য তৈরী করতে হয়।
- ঘরে বাতাস চলাচলের গতি সঞ্চারের জন্য বাতাসের অনুকূলে বেস্নায়ার বা প্যাডেস্টাল ফ্যান ব্যবহার করা হয়।
- খামারের একাধিক শেড থাকলে পরস্পর শেডের দূরত্ব কমপক্ষে শেডের প্রস্থের ১.৫ গুণ হওয়া প্রয়োজন।
- ঘরের মেঝে ইঁদুর প্রতিরোধক হওয়া উচিত।

(খ) পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘর

চিত্র নং ৪ পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘর

মুরগির বয়স ও উপযোগিতা অনুসারে ঘরে তাপ আর্দ্রতা ও আলোক নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

- ঘরে কৃত্রিম ভেন্টিলেশণ ব্যবস্থারের কারনে ইচ্ছেমত ঘরের প্রশস্ততা ও দৈর্ঘ নির্মাণ করা যায় ।
- পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরে খাদ্য ও পানি প্রদান যান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা সহজ।
- এই ঘরে পালিত মুরগির মধ্যে রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা কম , ফলে মৃত্যু হারও কম ।
- মুরগি অনেক বেশী উৎপাদশীল হয়।
- খাদ্য রূপান্তর হার অনেক বেশি হয় ।
- মুরগি অত্যাধিক আরাম ও স্বাচছন্দ্য বোধ করে।
- খামারে কম দূরত্বে একাধিক শেড নির্মাণ করা যায় । তবে ঘরের ভিতর থেকে দূষিত বাতাস নির্গমন পথ বরাবর কোন শেড নির্মাণ করা উচিত নয় ।

পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরের সমস্যা

- প্রাথমিক নির্মাণ খরচ বেশি।
- যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি নির্ভরশীল থাকতে হয়।
- কোন কারণে ১৫মিনিট বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকলে মুরগি মারা যায়।

(গ) হাইরাইজ ঘর

চিত্র নং ৫ হাইরাইজ ঘর

- এই ঘর দ্বিতল বিশিষ্ট হয় । উপরের তলায় মুরগি থাকে এবং নীচ তলায় মুরগির পরিত্যক্ত মল জমা হয়।
- প্রতি তলার উচ্চতা ৭ ফুট হিসেবে মোট ১৪ ফুট উঁচু হয়।
- নীচ তলায় বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে যাতে মল ভিজে না যায় তার জন্য নীচতলার মেঝে ১ ফুট উঁচু তৈরী দেয়াল করা হয়।
- এই ঘর উন্মুক্ত অথবা পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।
- প্রতি ব্যাচ মুরগি পালন অথবা একাধারে ৫-৬ বৎসর মুরগি পালন শেষে নীচে জমে থাকা মল পরিষ্কার করা যায়।
- উন্নত ভেন্টিলেশন ব্যবস্থার কারণে পরিত্যক্ত মল দ্রুত শুকায়, ফলে দুর্গন্ধ হয় না।
- ঘনঘন মল পরিষ্কার করার প্রয়োজন না থাকায় শ্রমের সাশ্রয় হয়।
- এই ঘরে মাঁচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন সহজ।
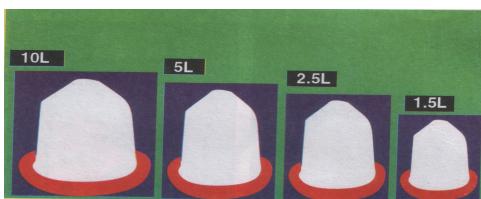
হাইরাইজার ঘরের অসুবিধা ঃ

- প্রাথমিক নিমার্ণ খরচ বেশী
- লিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালন করা যায় না।

খামারে ব্যবহৃত উপকরণ ও সরঞ্জাম

(১) ব্রুডার : ব্রুডারের ৩টি অংশ যেমন
ক) হোভার , খ) ব্রুডার হিটার গ) ব্রুডার গার্ড

(২) পানির পাত্র ঃ

চিত্র নং ৬ ঝর্না ড্রিংকার

চিত্র নং ৭ বেল টাইপ ড্রিংকার

ছোট বাচ্চা ,বাড়ন্ত বাচ্চা ও বিভিন্ন বয়সের মুরগির জন্য আজকাল বিভিন্ন প্রকার পানির পাত্র পাওয়া যায়। যেমন-
ক) ঝর্না ড্রিংকার খ) নিপল ড্রিংকার গ) কাপ ড্রিংকার ঘ) বেলটাইপ ড্রিংকার ঙ) ট্রাফ ড্রিংকার

(৩) খাবার পাত্র ঃ
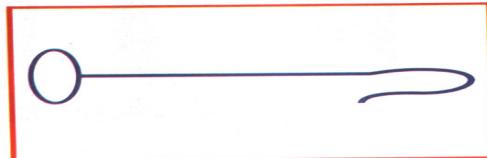
চিত্র নং ৮ প্লাষ্টিকের তৈরী ট্রাফ ফিডার

চিত্র নং ৯ প্লাষ্টিকের তৈরী টিউব ফিডার

ক) প্রথম খাবার পাত্র-কাগজ/চিকবাস্কের ঢাকনি /পস্নাষ্টিক ট্রে /থালা ইত্যাদি
খ) দ্বিতীয় খাবার পাত্র প্লাষ্টিক বা কাঠের তৈরী ট্রাফ ফিডার, গ্রীল সংযুক্ত ট্রাফ ফিডার, পাষ্টিকের তৈরী টিউব ফিডার , স্বংক্রিয় ফিডার

৪) মুরগি ধরার জন্য (ক্যাচিং) হুক

চিত্র নং ১০ মুরগী ধরার জন্য হুক

ক্যাচিং হুক মুরগির পায়ে আটকে মুরগি ধরা হয় । ১৪ গেজ তারের সাহায্যে এ হুক তৈরী করা যায় ।

(৫) মুরগি ধরার হার্ডল ঃ

- হার্ডল স্থানান্তর যোগ্য এক ধরনের বেড়া
- র্হাডলের সাহায্যে মুরগি একত্রে জমা করে ধরা হয়।
- হার্ডলের গায়ে দরজা থাকে। দরজার ভিতর হাত ঢুকিয়ে জমা করা মুরগি ধরতে সুবিধা হয়।

- হার্ডল সাধারণত : পাষ্টিকের সাহায্যে তৈরী করা হয়া।
- একাধিক হার্ডল পরস্পর সংযুক্ত করে প্রয়োজনমত বড় করা যায়।
- হার্ডলের আকার ৪ ফুট - ৫ ফুট অথবা সুবিধামত মাপের পাওয়া যায়।
- মুরগির প্রতিশেধক টীকা, বাছাই ও বাজারজাত করার জন্য মুরগি ধরতে হার্ডল ব্যবহার করা হয় ।

২.২ মুরগি পালন পদ্ধতি

ক) লিটার পদ্ধতি, খ) মাঁচা পদ্ধতি গ) মাঁচা ও লিটার পদ্ধতি ঘ) খাঁচা পদ্ধতি

২.৩ ক) লিটার পদ্ধতি

চিত্র-১১ লিটার পদ্ধতিতে মুরগী পালন

লিটার পদ্ধতিতে শুকনা ও দুর্গন্ধ মুক্ত তুষ, কাঠের গুড়া, খড় ও অন্যান্য অপ্রচলিত জিনিস লিটার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। লিটার ব্যবস্থায় দুইভাবে লিটার ব্যবহার করা যায়। যথা ঃ হালকা লিটার ও ডিপ লিটার ব্যবস্থা ।

লিটার পদ্ধতির উপকারিতা ঃ

*ঘর শুকনা ও দুর্গন্ধমুক্ত থাকে।

*লিটার ব্যবহার করলে মেঝেতে পায়খানা লেপ্টে যায় না।

* মুরগির জন্য আরমদায়ক ও স্বাস্থ্যকর বিছানা তৈরী হয়।

*খাদ্য রুপান্তর হার বেশী হয়।

* লিটারের মধ্যে এক প্রকার ভিটামিন ও্র আমিষ জাতীয় খাদ্য উপাদান তৈরী হয়।

* ডিমের মধ্যে রক্তকণিকা হয় না।

* ডিম পাড়া শেষে বাতিল মুরগির ওজন বেশী থাকে এবং বিক্রয় মূল্য বেশি হয়।

* লিটারের মুরগি পালন সহজ।

* ব্যবহৃত লিটার উন্নতমানের জৈব সার এবং মাছও প্রাণিপাখির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার কার যায়।

লিটার পদ্ধতিতে মেঝের স্থান

(ক) ১ দিন হতে ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত

মুরগির জাত	লিটার পদ্ধতি		মাঁচা বা স্লাট পদ্ধতি		খাঁচা পদ্ধতি	
	বর্গ ফুট	বর্গমিটারি	বর্গ ফুট	বর্গমিটারি	বর্গইঞ্চি	বর্গ সে.মি:
সাদা জাত	০.৭৫	০.৭০	০.৬০	০.০৫৬	১৮	১১৬
রঙ্গিন জাত	০.৮৫	০.০৭৮	০.৭৫	০.০৭০	২০	১২৯
ব্রয়লার জাত	১.০০	০.০৯২৯	০.৮৬	০.০৮০		

(খ) ৭ সপ্তাহ বয়স থেকে ১৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত

মুরগির জাত	লিটার পদ্ধতি		মাঁচা বা স্ট পদ্ধতি		খাঁচা পদ্ধতি	
	বর্গ ফুট	বর্গমিটারি	বর্গ ফুট	বর্গমিটারি	বর্গইঞ্চি	বর্গ সে.মি:
সাদা জাত	১.০০	০. ০৯২৯	০.৮৬	০.০৮	৪৫	২৯০
রঙ্গিন জাত	১.২০	০.১১	১.০০	০. ০৯২৯	৫৪	৩৪৮

(গ) ১৮ সপ্তাহের উর্দ্ধে

মুরগির জাত	লিটার পদ্ধতি		মাঁচা বা স্ট পদ্ধতি		খাঁচা পদ্ধতি	
	বর্গ ফুট	বর্গমিটারি	বর্গ ফুট	বর্গমিটারি	বর্গইঞ্চি	বর্গ সে.মি:
সাদা জাত	১.৫০	০.১৪	১.২৫	০.১১	৬৫"-৭০"	৪১৯-৪৫১
রঙ্গিন জাত	১.৭৫	০.১৬	১.৫০	০.১৪	৭০"-৭৫"	৪৫১-৪৮৪

মাঁচা বা স্লাট পদ্ধতির উপকারিতা

* মাঁচার ফাঁক দিয়ে পায়খানা নীচে পড়লে পিরিস্কার করতে সুবিধা হয়।
* রোগ বিস্তারের সম্ভবনা কম
* মাঁচার উপর স্বাস্থ্যকর অবস্থা বজায় থাকে
* মাঁচার উপর মুরগির স্বাচ্ছন্ধ্যবোধ করে
* ডিম পরিষ্কার থাকে।
* তুলনামূলকভাবে লিটার পদ্ধতির চেয়ে মুরগিপ্রতি কম স্থানের প্রয়োজনস হয়।

স্লাট **বা মাঁচা পদ্ধতির সমস্যা**

চিত্র-১২ স্লাট **বা মাঁচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন**

* মাছির উপদ্রব হয় * দুর্গন্ধ হয় * স্টের উপর ডিম ভাংগার সম্ভবনা বেশী।
* মুরগির প্রতি খাদ্য রূপান্তর হার কম। * স্ট নির্মাণ খরচ বেশী। * স্টের /মাঁচার নীচ দিয়ে শীতের সময় ঠান্ডা বাতাস ঢুকলে ক্ষতি হয়।

২.৪ স্লাট কাম লিটার পদ্ধতির বিবরন

চিত্র-১৩ স্লাট কাম লিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালন

ঘরের ভিতর ২ ভাগ স্লাট এবং ১ ভাগ লিটার ব্যবহার করা হয় উন্মুক্ত ঘরে উভয় দিকের নেট ঘেঁষে এবং পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্য বরাবর সাধারণত : স্স্লাট মাঁচা স্থাপন করা হয়। বৃষ্টির দিনে উন্মুক্ত ঘরে স্স্লাটের উপর বৃষ্টির ছাট পড়লে তেমন ক্ষতি হয় না । স্স্লাটের উপর পানি ও খাবার পাত্র স্থাপন করা হয়৷৷ ডিম পাড়ার বাসা ৫০ ভাগ লিটারের উপর এবং ৫০ ভাগ স্স্লাটের উপর থাকে। স্স্লাটের উপরিভাগ লিটার মেঝে হতে ২৭ ” উঁচু হয়। স্স্লাটের নীচে তারের জাল দ্বারা ঘেরা থাকে এবং জালের ফাঁকে দিয়ে বাতাস ঢুকে মুরগির জমাকৃত পায়খানা শুকায়, ফলে গন্ধ হয় না । প্রয়োজন মত স্স্লাটের নীচ হতে পায়খানা পরিষ্কার করা হয়। শীতের সময় স্স্লাটের ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা বাতাস প্রবেশ বন্ধ করার জন্য অপসারণযোগ্য পস্নাষ্টিক পর্দা দ্বারা তারের জালের উপর ঢেকে দেয়া হয়।

স্লাট-কাম লিটার ঘরের উপকারিতা

এই ঘরে দুর্গন্ধ খুব কম হয়
এই ঘরে ব্রিডার মুরগি পালন করলে লিটারের উপর মিলন হয়।
পানি পড়ে লিটার ভিজার সম্ভাবনা থাকে না ।
স্স্লাট-কাম লিটার পদ্ধতির অসুবিধা
নির্মান খরচ বেশি
মাছির উপদ্রব কিছুটা হয়
খাঁচার তুলনায় মুরগি প্রতি বেশি স্থান প্রয়োজন।
এই পদ্ধতি ব্রিডার মুরগির জন্য বেশি উপযোগী।
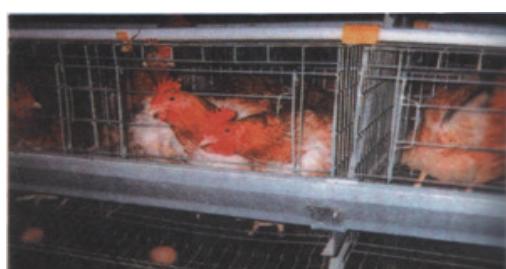
ঘ) খাঁচা পদ্ধতি

চিত্র-১৪ খাচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন।

খাঁচার মধ্যে বাচ্চা ব্রুডিং থেকে শুরু করে লেয়ার মুরগি পালন বর্তমানে অনেক বেশী জনপ্রিয়। সারা বিশ্বে শতকরা ৭৫ ভাগ মুরগি খাঁচা পদ্ধতিতে পালন করা হয়।

খাঁচা পদ্ধতির উপকারিতা

* পরিচর্যা সহজ
* সহজে ডিম সংগ্রহ করা যায়
* মুরগি প্রতি অনেক কম স্থানের প্রয়োজন হয়
* অসুস্থ মুরগি সহজে চিহ্নিত করা যায়।
* রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা কম
* ডিমের গায়ে ময়লা লাগে না
* কৃমির আক্রমণ সম্ভাবনা কম।
* অনুৎপাদনশীল মুরগি বাছাই সহজ

২.৫ হাঁসের বাসস্থান ও তার প্রকার ভেদ
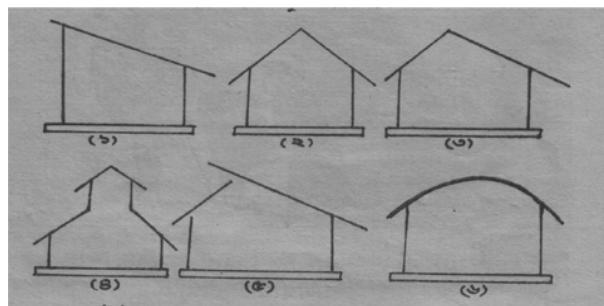
গৃহপালিত পাখিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষা করে আরাম ও নিরাপদ স্থানে বাসস্থান দেয়াই গৃহস্বামীর লক্ষ্য । হাঁস খুব বেশী গরম ও খুব বেশী ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না । হাঁসের ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে বেশী খারচ না করে সীমিত খরচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ । আবার বাসস্থান নির্মাণ করতে গিয়ে এমন নড়বরে ঘর রাখা উচিৎ নয় যাতে শিয়াল, বাউরাল ,নেউল, চিকা ,ইদুর ইত্যাদি হাঁস ও হাঁসের বাচ্চার ঘরে প্রবেশ করে ক্ষতি করতে পারে। হাঁসের ঘর নির্মাণের প্রাক্কালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার ।

১। জায়গা নির্বাচণ ঃ হাঁসের ঘরের জন্য সাধারণত: খোলা ,উচু ও রৌদ্র থাকে এমন জায়গা বাছাই করা উচিৎ । বালু মাটি, ড্রেন কাটার সুবিধা আছে এবং ঘাস জম্মাতে না পারে এমন জায়গা নির্বাচন করা উত্তম। ঘরের সংগে বড় গাছ বা জংগল থাকা উচিত নয়। মুরগীর খামারের সন্নিকটে হাঁসের ঘরের জায়গা নির্বাচন করা ঠিক নয়।

২। ঘরের নমুনা ঃ

কি নমুনার ঘর ,কত হাঁস পালন করা হবে ইত্যাদি চিন্তা ভাবনা করে ঘর তৈরী করতে হবে। অল্প হাঁসের জন্য ছোট ঘর এবং বেশী হাঁসের জন্য বড় স্থায়ী ঘর তৈরী করাই ভাল । লম্বা, সরু এবং চারকোণা ঘর তৈরী করা উচিত। গ্রামীন পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পারিপাশিক অবস্থার বিষয় চিন্তা ভাবনা করে ঘরের চালা নির্বাচন করতে হবে।

১। সেড টাইপ ২। গেবল টাইপ ৩। সেমি গেবল টাইপ ৪। মনিটর টাইপ ৫। সেমি মনিটর টাইপ ৬। গোল টাইপ।

চিত্র-১৫ হাঁসের ঘরের বিভিন্ন নমুনা

ঘরের ব্যবস্থাপনা ঃ

১। তাপ ঃ ঘরের তাপ নিম্ন ৪.৪ ডিগ্রী সেঃ উর্দ্ধে ৩৭.৮ ডিগ্রী সেঃ হাঁস মুরগির জন্য মারাত্মক । ঘরের তাপ সাধারনত ১২.৮ ডিগ্রী সেঃ থেকে ২৩.৯ ডিগ্রী সেঃ পর্যন্ত উত্তম।

২। আর্দ্রতাঃ আবহাওয়া ভাল থাকলে হাঁসের শারীরিক বৃদ্ধি, লোম গজানো এবং ডিমের উৎপাদন ভাল হয় । তাছাড়া অপ্রাকৃতিক পরিবেশ ডিম উৎপাদনে ক্ষতি করে। হাঁস সাধারণত ৭০% আর্দ্রতা সহ্য করতে পারে। শতকরা ৩০% কমে পাখনা ঝরে যায়। ঘরের আদ্রতা ৭০% এর উর্দ্ধে হলে ককসিডিয়া ও কৃমির উৎপাত বাড়ে এবং হাঁসকে অস্থির অবস্থায় দেখা যায়। প্রতিকারের একমাত্র উপায় ঘরের লিটার শুকনা রাখা এবং বায়ূ চলাচলে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা।

(৩) আলো (কৃত্রিম) ঃ কৃত্রিম আলো সাধারণত : হাঁস-মুরগীর দৈহিক বৃদ্ধি, রতিক্রিয়া এবং ডিম উৎপাদনে সহায়তা করে । হাঁসের বাচ্চার অন্তত ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত রাতে আলোর ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়। এতে খাদ্য বেশি খাবে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাবে। ডিম দেয়া হাঁসের জন্য ১৪-১৬ ঘন্টা

আলো সরবরাহ উত্তম। এই অতিরিক্ত সময় কৃত্রিম আলো সকাল অথবা বিকালে যোগ করে অথবা উভয় সময় ভাগ করে দিলেই চলবে। ৩০০ বর্গফুট জায়গার জন্য ১টি ৬০ ওয়াট বাল্ব যথেষ্ট । ব্রয়লার হাঁস ও মুরগীর জন্য সারা রাত্রি আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
(৪) মেঝে এবং মেঝের পরিমাপ ঃ মেঝে স্যাঁতস্যাঁতে না হয় এবং ইঁদুর প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ৭-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত বাচ্চার জন্য তারের জালের মেঝে এবং বয়স্ক হাঁসের জন্য পাকা মেঝে বাঞ্ছনীয়। মেঝের পরিমাপ বাচ্চা ও বয়স্ক হাঁস পালন অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ।
(৫) বাতাস চলাচল ব্যবস্থা (ভেনটিলেশন)ঃ দেয়ালের শতকরা ৪০ ভাগ হিসেবে ঘরের লম্বালম্বি বেড়ার তারের জালের ব্যবস্থা বা বাঁশের সাহায্যে ছিদ্র ওয়ালা বেড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
(৬) লিটার (বিছানা) আর্দ্রতা শোষণ করতে পারে এমন বস্তু লিটার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে । ধানের খড় বা গমের টুকরা , ধানের তুষ, কাঠের গুড়া ইত্যাদি লিটার হিসাবে ব্যবহার করা যায় । লিটার সর্বদা শুকনা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ব্যবহার করলে উঁচু লিটার (৩ " - ৪ ") ব্যবহার না করে পাতলা লিটার (১ "-২ ") ব্যবহার করতে হবে।
(৭) খাবার ও পানির পাত্র ঃ বাচ্চা ও বয়স্ক হাঁস পালন অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

মডিউল -৩
বাচ্চা পালন

৩.১। ব্রুডিং ও ব্রুডিং কর্মসূচী ঃ

অল্প বয়সে পালক না হওয়ায় বা ছোট থাকায় শরীর আবৃত্ত হয়না এ জন্য শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রনের জন্য কৃত্রিম তাপের প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় কৃত্রিম ভাবে তাপ দেয়াকে ব্রুডিং বলা হয় । ব্রুডিং দুই ভাবে করা যায় । যথাঃ -ক) প্রাকৃতিক ব্রুডিং ও খ) কৃত্রিম ব্রুডিং

ক) প্রাকৃতিক ব্রুডিং ঃ মুরগির সাহায্যে প্রাকৃতিক ব্রুডিং করা হয়।

খ) কৃত্রিম ব্রুডিং ঃ বৈদ্যুতিক, গ্যাস, কেরসিন ও অন্যান্য তাপের উৎসের মাধ্যমে ব্রুডিং করাকে কৃত্রিম ব্রুডিং বলে।

বাচ্চা ব্রুডিং ঘর ঃ

খামারের লেয়ার বাচ্চা পালন করার জন্য তিন প্রকার ঘরের ব্যবহার করা হয় । যেমনঃ
ক) ব্রুডার হাউজ খ) ব্রুডার-কাম -গ্রোয়ার হাউজ গ) ব্রুডার -কাম- লেয়ার হাউজ।

ব্রুডার **হাউজ ঃ**

* স্বতন্ত্র ব্রুডার ঘরের আকার ছোট হওয়াতে তাপ উৎপাদন খরচ কম।
* এই ঘরে বাচ্চা ব্রুডিং শেষে বাচ্চাগুলোকে বিক্রি বা গ্রোয়ার হাউজে স্থানান্তর করা হয়।
* এই সময়ে বাচ্চা স্থানান্তর করলে বাচ্চার ধকল হয় ও রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা বারে।

ব্রুডার ঘর কাম- গ্রোয়ার হাউজঃ

- বর্তমানে এই ঘরের প্রচলন বেশী । ঘরের মধ্যে কিছু পরিমান স্থান পৃথক ভাবে ব্রুডিংয়ের ব্যবস্থা করা যায় এমন ভাবে তৈরী করা হয়। পরে গ্রোয়িং অবস্থায়ও সেখানেই রাখা হয়।
- বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে স্থানের প্রয়োজন বেশি হতে থাকলে পর্দা শরিয়ে বাচ্চা থাকার স্থান প্রশস্ত করা হয়।
- লেয়ার ঘরে স্থানান্তরের পুর্ব পর্যন্ত এ ঘরে পুলেট পালন করা হয়।

চিত্র-**১৬ ব্রুডার ঘর কাম- গ্রোয়ার হাউজ**

ব্রুডার -কাম- লেয়ার হাউজ ঃ

- এই ঘরে বাচ্চা পালন ও বাড়ন্ত বাচ্চা পালন শেষে ডিম পাড়া পর্যন্ত মুরগি পালন করা হয়।

প্রতি ব্যাচ বাচ্চা পালন করার জন্য বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারনঃ

- খামারের প্রয়োজন ও ঘরের ধারন ক্ষমতানুসারে প্রতি ব্যাচে বাচ্চা পালন করার জন্য বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারন করতে হয়।
- বাণিজ্যিক খামারে ব্রুডার - কাম- গ্রোয়ার হাউজে পুলেট প্রতি গড়ে এক বর্গফুট স্থান হিসাবে বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারন করা হয়।

- ৪ফুট ব্যাসের হোভারের নীচে সাদা বাচ্চা ৫০০টি রঙ্গিন বাচচা ৪৭৫ টি এবং বয়লার বাচ্চা ৪৫০টি ব্রুডিং করা হয়। এই হিসেবে ঘরে ব্রুডারের সংখ্যা নির্ধারন করা হয়।
- ঘরের আয়তন ও বাচ্চার সংখ্যানুসারে ঘরে ব্রুডার স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়।
- সকল সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত শতকরা ৫টি বাচ্চা বেশী পালন করা হয়।

৩.২ ব্রুডিং পুর্ব প্রস্তুতি, বাচ্চা ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

ব্রুডার ঘর প্রস্তুত

- ব্রুডার ঘর /ব্রুডার - কাম গ্রোয়ার ঘর খালি হওয়ার সাথে সাথে ঘরের সম্স্ত সরঞ্জাম , লিটার /ব্রুটিং খাচা ইত্যাদি বের করতে হয়।
- ঘরের কোন সংস্কার প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা নিতে হয়।
- ঘরের মেঝেতে লেগে থাকা ময়লা পানি দিয়ে ভিজিয়ে তুলে ফেলতে হয়।
- পরিষ্কাতর পানি দ্বারা সমস্ত ঘর ধুয়ে ফেলতে হয়।
- ভেন্টিলেশন ,ফ্যান, লাইট ,দরজা জানালা ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করতে হয়।

ঘর জীবানুমুক্ত করনঃ

- জীবানুণাশক ব্যবহৃত পানিতে ব্রাশ ভিজিয়ে ভেন্টিলেশন ,ফ্যান, লাইট ,দরজা জানালা ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করতে হয়।
- ঘরের মেঝেতে আইয়োসান / ফিনাইল/স্যাবলন/ডেটল ইত্যাদি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়।
- অথবা অল্প খরচের জন্য ভিজা ঘরে মেঝের উপর প্রতি ১০০বর্গ ফুট স্থানে এক কেজি কাপড় কাচা সোডা ভালভাবে ছড়িয়ে ১৫ মিনিট পরে ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হয়।
- ঘর পরিস্কার করার সময় ও জীবানুনাশক ব্যবহারে সময় পায়ে গাম্বুট,দেহে এপ্রোন ও মুখে মুখোশ ব্যবহার করা বাঞ্চ্নীয় ।

ঘরে লিটার / খাঁচা ও সরঞ্জামাদি স্থাপন

- ঘর জীবানুমুক্ত হওয়ার পর ভালভাবে শুকাতে হবে (১০-১৫ দিন) ।
- শকনা মেঝের উপর ২” পুরোকরে লিটার সামগ্রী বিছানোর পর ব্রুডার গার্ড, হোভার, হিটার ইত্যাদি পর্যাক্রমে স্থাপন করতে হয়।
- ব্রুডার গার্ডের একফুট ভিতরে ড্রিংকার ও খাদ্য পাত্র স্থাপনের জন্য স্থান রাখতে হয়।
- খাঁচায় ব্রুডিং করলে লিটারের পরিবর্তে ব্রুডার খাঁচা স্থাপন করা হয়।
- ব্রুডার -কাম-গ্রোয়ার হাউজের উন্মুক্ত স্থান পর্দা দ্বারা ঢেকে দিতে হয়। গরমকালে চটের পর্দা এবং শীত ও বর্ষার সময় পস্নাষ্টিক পর্দা ব্যবহার করা হয়।
- ব্রুডার -কাম গ্রোয়ার হাউজে বাচ্চা ব্রুডিংয়ের জন্য নিদিষ্ট স্থান পস্নাষ্টিক পর্দা দ্বারা ঘিরে পৃথক করতে হয় এবং ঘেরা স্থানে ব্রুডার স্থাপন করতে হয়।

ব্রুডার ও ঘরের তাপ মাত্রাঃ

ঘরের তাপ মাত্রা ঃ

ঘরে বাচ্চা প্রদানের সময় ঘরের তাপ মাত্রা ৭৫ ডিগ্রী ফাঃ থাকে এবং ব্রুডিং শেষে ৬৫-৭৫ ডিগ্রী ফাঃ তাপমাত্রা রাখা হয়।

ব্রুডারের তাপ মাত্রা ঃ

বাচ্চার বয়স	লেয়ার বাচ্চা				ব্রয়লার বাচ্চা				
সপ্তাহ	শীতকাল		গ্রীষ্মকাল		শীতকাল		গ্রীষ্মকাল		
	ফাঃ	সেঃ	ফাঃ	সেঃ	ফাঃ	সেঃ	ফাঃ	সেঃ	
১-২	৯৫.০	৩৫.০	৯১.০	৩২.৭	৯০.০	৩২.২	৮৬	৩০	
২-৩	৯০.০	৩২.২	৮৬.০	৩০.০	৮৫.০	২৯.২	৮১.০	২৭.২	
৩-৪	৮৫.০	২৯.৪	৮১.০	২৭.২	৮০.০	২৬.৬	৭৫.০	২৩.৮	
৪-৫	৮০.০	২৬.৬	৭৫.০	২৩.৮	৭৫.০	২৩.৮	-	-	
৫-৬	৭৫.০	২৩.৮	-	-	-	-	-	-	

বাচ্চা ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

ব্রুডার চালূ ও পাত্রে পানি প্রদান

- বাচ্চা গ্রহণের দিন ব্রুডারে পানির পাত্রে পানি দেয়ার পর এবং বাচ্চা গ্রহণের ৩ ষন্টা পূর্বে ব্রডার চালু (তাপ উৎপাদন) করতে হয়। বেশী আগে চালু করলে লিটার বেশী শুকিয়ে যায় এবং পরে চালু করলে পানির তাপমাত্রা যথেষ্ট পরিমান হয় না । পানির তাপমাত্রা ৬৫ ফাঃ (১৮সেঃ) হওয়া বাঞ্ছনীয় । (পানি প্রদান পদ্ধতি দ্রষ্টব্য)
- এই সময় প্রশস্থ খাদ্য পাত্র হিসাবে কাগজ /চিক বাক্সের ঢাকনি/পস্নাষ্টিক ট্রে হোভারের নীচে স্থাপন করা হয়।

ব্রুডারে বাচ্চা প্রদান ঃ

- খামারে বাচ্চা পৌছানোর সাথে সাথে পূর্ব থেকে প্রস্তুত পরিচার্যকারী বাচ্চার সরবরাহ গ্রহণ করবে এবং দ্রুত ব্রুডারে প্রদান করবে।
- সাধারনত: সকালের দিকে ব্রুডারে বাচ্চা প্রদান করলে পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় এবং সকালে আবহাওয়া ঠান্ডা থাকার দরুন কম ধকল সৃষ্টি হয়।
- বাচ্চা গ্রহণের সময় চিক বাক্সের ভিতর মৃত বাচ্চা থাকলে তার সংখ্যা হিসাব করতে হয়।
- সম্ভব হলে বাচ্চার প্রাথমিক নমুনা ওজন রাখা যায়।
- বাচ্চা সরবরাহ তালিকার সাথে কোন অমিল থাকলে হিসাবে আনতে হয় এবং বাচ্চা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে হয়।

বাচ্চার আচরণ পরীক্ষাঃ

- ব্রুডারে বাচ্চা প্রদানের পর বাচ্চার আচরণ পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
- বাচ্চার জন্য অনুকুল তাপমাত্রা বাচ্চার আচণ দেখে অনুমান করতে হয়, যেমন-

- ব্রুডারে তাপ বেশি হলে বাচ্চা তাপের উৎস হতে দূরে যায় এবং ব্রুডার গার্ডের গা ঘেষে জমা হয় ।

-রুডারে তাপ কম হলে তাপের উৎসের নীচে বেশী তাপের আশায় বাচ্চা ভীড় করে এবং পরস্পর জড়াজড়ি করে গরম হতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় চাপাচপিতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বাচ্চা মারা যায়।

-তাপ বাচ্চার অনুকূলে থাকলে বাচ্চা স্বতঃস্ফুর্ত থাকে এবং সুষ্ঠুভাবে খাদ্য খায় ও পানি পান করে।

-বাচ্চা স্বতঃস্ফুর্তভাবে চলাচল ও পানি পান না করলে বুঝতে হয় পরিবহন জনিত ধকলে পীড়িত অতবা অসুস্থ।

* হোভার অথবা তাপের উৎস উঁচু-নীচু করে তাপ কম -বেশী করা হয়।

* ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার পর রুটিন মত পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট নয়। বার বার ব্রুডার ঘরে প্রবেশ করে আচরণ পরীক্ষার পর ব্যবস্থা নিতে হয়। ২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চার অত্যন্ত সংকটময় সময় ।

* হঠাৎ করে আলো নিভে যাওয়া, ঘরের তাপমাত্রা পরিবর্তন, ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা, খাদ্য ও পানির পরিবর্তন, বিভিন্ন প্রকার শব্দ ও হট্টগোল বাচ্চার ধকল সৃষ্টি করে। বাচ্চার আচরণ দেখে এ সমস্ত ধকল প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

* ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার পর তারা পানি পান করে।

ব্রুডারে বাচ্চার পানি পান করার প্রবণতা পরীক্ষা করা হয়। প্রত্যেক বাচ্চা যাতে সহজে পানি পান করতে পারে সে ব্যবস্থা নিতে হয়। প্রয়োজন হলে হাতে ধরে পানি পান করাতে হয়।

খাদ্য প্রদান

- ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার ২-৩ ঘন্টা পর প্রত্যেক বাচ্চার সঠিক পানি পান নিশ্চিত হয়ে প্রাথমিক পাত্রে ষ্টার্টার রেশন প্রদানের পূর্বে গম , ভুট্টা চূর্ন অথবা চাউলের খুঁদ দেওয়া যায়।

লিটার ব্যবস্থাপনা

- লিটার বেশী ভিজা হলে যেমন বিভিন্ন প্রকার গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তেমনি ককসিডিয়া ,কৃমি ও রোগ জবিাণুর বংশ বিস্তার বৃদ্ধি পায় । তাছাড়া বাচ্চার দেহে পালক গজানোর হার কমে যায়।
- বাচ্চা তাপের উৎসের নীচে বেশী জমা হওয়ার কারণে সেখানে বেশী মলত্যাগ করে, ফলে লিটার দ্রুত আর্দ্র হয়।
- লিটার বেশী শুকনা হলে বাচ্চার দেহ হতে জলীয় অংশ শোষন করার ফলে ডি-হাইড্রেশন হয়।
- লিটার সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে এ অবস্থা হয় না।

ব্রুডার স্থানান্তার

- প্রতিসপ্তাহে ব্রুডারের তাপমাত্রা ৫ ফাঃ কমাতে হয় যতক্ষণ না ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রার(৭৫ফাঃ) সমান হয়।
- বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে বাচ্চা প্রতি বেশী স্থান প্রদানের জন্য ব্রুডারের চারদিকের ঘেরাও দেয়া পর্দা এবং ব্রুডার গার্ড সরিয়ে স্থান প্রশস্ত করতে হয়।
- গ্রীষ্মকালে ২ সপ্তাহ এবং শীতকালে ৩ সপ্তাহ বয়সের পর এই পর্দা ও ব্রুডার গার্ডের প্রয়োজন হয় না ।
- গ্রীষ্মকালে ৩ সপ্তাহের পর এবং শীতকালে ৪ সপ্তাহের পর ব্রুডার তাপের প্রয়োজন হয় না, এ সময়ে হোভার উঁচূতে তুলে রাখা হয়।

ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা

- ঘরের উন্মুক্ত স্থানে ব্যবহৃত পর্দা ২ সপ্তাহ বয়সেরর পর দিনের বেলা খুলে দেয়া হয় এবং রাত্রে বন্ধ করতে হয়।
- সাধারণত : উন্মুক্ত ঘরে পর্দা খুলে দেয়া এবং রাত্রে বন্ধ করাই যথেষ্ট নয় বরং উন্নতমানের পুলেট তৈরীর জন্য আবহাওয়ার অবস্থা বুঝে দিন রাত্রের মধ্যে কয়েকবার পর্দা খোলা ও বন্ধ করার প্রয়োজন হয়।

মডিউল -৪

পুলেট বা বাড়ন্ত বাচ্চা পালন

৬ সপ্তাহ বয়সের পর ডিম পাড়তে শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রী বাড়ন্ত বাচ্চাকে পুলেট এবং পুরুষ বাচ্চাকে ককরেল বলে।

৪.১ ।পুলেট পালন পরিকল্পনা ঃ

পুলেট পালন করার জন্য ৪ প্রকার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। এই পরিকল্পনা বাচ্চা ব্রুডিং হতে শুরু হয়। যেমন-

ক) অল -ইন-অল আউট পরিকল্পনা,খ) মালটিপল রিয়ারিং পরিকল্পনা, গ) আইসোলেশন রিয়ারিং পরিকল্পনা, ঘ) সিজনাল রিয়ারিং পরিকল্পনা ।

ক) অল -ইন-অল আউট পরিকল্পনা ঃ

এই পরিকল্পনার মধ্যে খামারে শুধু একই বয়সের বাচ্চা ব্রুডিং থেকে শুরুকরে ডিম পাড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন বয়সের বাচ্চা ,পুলেট অথবা লেয়ার রাখা হয় না।

খামারে বাচ্চা ব্রুডিং ও পুলেট উৎপাদন করে বিক্রি করার জন্য অথবা ব্রয়লার পালন করারর জন্য এই পরিকল্পনা বেশী উপযোগী ।

এই পরিকল্পনার সুফলঃ

খামারে একই সাথে বিভিন্ন বয়সের মুরগি না থাকার কারনে রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে না ।

প্রতি ব্যাচ বাচচার পালন শেষে পরবর্তী ব্যাচ বাচ্চা পালন করার পূর্বে ২ সপ্তাহ ঘর খালি রাখা হয় ফলে-

ক) রোগ জীবানুর জীবন চক্রের ছেদ ঘটে।

খ) ঘর পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত করা যায়

গ) ঘরের সংস্কার ও সম্প্রসারন করা যায়।

ঘ) পরিচর্যাকারীকে অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যায়।

ঙ) নতুন উদ্যোক্তার জন্য এই পদ্ধতি অনেক ভালো।

খ) মালটিপল রিয়ারিং পরিকল্পনা

* খামারের একই সাথে বিভিন্ন শেডে বিভিন্ন বয়সের মুরগি থাকে্

* লেয়ার খামারে বিভিন্ন লেয়ার শেডে বিভিন্ন বয়সের লেয়ার মুরগী ও ব্রুডার –কাম- গ্রোয়ারহাউজে রিপেস্নসম্যান্ট ষ্টক পালন করা হয়।

* এই পরিকল্পনার ফলে খামারে ডিম উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়।

লেয়ার খামারে মাল্টিপল রিয়ারিং পরিকল্পনা গ্রহন পদ্ধতিঃ

বাজারে ডিম সরবারাহের ধারাবাহিকতা রাখার জন্য এই পরিকল্পনা গ্রহন করতে হয়।

- সেক্ষেত্রে বিভিন্ন শেডের জন্য স্বতন্ত্র উপকরন ও পরিচর্যাকারী থাকে।
- এক শেড হতে অন্য শেডে নিদিষ্ট দুরত্ব বাজায় রাখতে হয়।
- সেনিটেশন ব্যবস্থা বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়।
- পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘর তৈরী করা যায়।

আইসোলেশন রিয়ারিং পরিকল্পনা

- স্বতন্ত্র ব্রোডার ঘরে বাচ্চা ব্রডিংএর পর অথবা ব্রডিং কাম গ্রোয়ার হাউজে পুলেট উৎপাদনের পর স্বতন্ত্রভাবে স্থাপিত লেয়ার খাখারে স্থানান্তর করতে হয়।
- এই পরিকল্পনা অত্যধিক ব্যয়বহুল । শুধু পুলেট উৎপাদনের জন্য এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় ।

সিজনাল রিয়ারিং পরিকল্পনা ঃ

- পুলেট উৎপাদনের জন্য আলোর ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। সাধারণত : ৮ সপ্তাহ হতে ১৮ সপ্তাহের পূর্ব পর্যন্ত দৈনিক ৮ ঘন্টা আলোক সময়ের প্রয়োজন হয়।
- পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ছাড়া পুলেটের জন্য ৮ ঘন্টা আলোক সময় প্রদান সম্ভব হয় না।
- সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসে দিনের দৈর্ঘ্য ৯ হতে ১০ ঘন্টা হয় বাচ্চার বাড়ন্ত বয়স কাল ডিসেম্বর মাস হলে তাকে সিজনাল রিয়ারিং বলে।
- সাধারনতঃ আগষ্ট হতে অক্টোবর মাসে উৎপাদিতত বাচ্চার বাড়ন্ত বয়স কম -বেশী ডিসেম্বর মাস হয় ।

সিজনাল রিয়ারিং পরিকল্পনার সুফল ঃ

- এই পুলেট অত্যন্ত উন্নতমানের হয়।
- বেশী ডিম পাড়ে এবং ডিম পাড়ার সময়কাল বেশী হয়।
- পালন খরচ কম।
- কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন হয়না।

৪.২ পুলেট নিবার্চণ

- দেহ সুগঠিত হবে।
- দেহ পালকে পরিপূর্ন থাকবে।
- চঞ্চল ও ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে।
- মাইকো পস্নাজমা ও সালমোনিলা মুক্ত হবে।
- পরস্পর সমতা ৬০ ভাগের বেশী হবে।
- জাত ও বয়স অনুসারে নিধারিত ওজনের হবে।

পুলেট নিবার্চণের বয়স

- খাচায় পালন করতে হলে ১৫ সপ্তাহ বয়সে লেয়ার খাঁচায় স্থানান্তর করতে হয় । এই বয়স পুলেটের খাদ্য পরিবর্তন সময় ।
- লিটারে পালন করার জন্য ১৫-১৮ সপ্তাহ বয়সে লেয়ার ঘরে স্থানান্তর করা হয়।
- লেটারে পালিত বাচ্চা লিটার ,খাঁচা অথবা মাঁচার উপর এবং খাঁচায় পালিত বাচ্চা শুধু মাত্র খাঁচায় পালন করার জন্য উপযুক্ত।
- ১০ সপ্তাহ থেকে ২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পুলেট পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন সময়।

পুলেট পালন কর্মসূচী ঃ

- খামারে এক ব্যাচ মুরগির ডিম উৎপাদন শেষ হলে ২ সপ্তাহ পরে ঘরে নতুন ব্যাচ পুলেট দিতে হয়
- লেয়ার মুরগি পরিবর্তন ও নতুন পুলেটে ডিম উৎপাদন শুরু হওয়া পর্যন্ত ডিম উৎপাদনে ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়।
- লেয়ার মুরগি বাতিল ও নতুন পুলেট প্রদানের পূর্বে ঘর পরিষ্কার পরিছন্ন ,জীবানুমুক্ত করার জন্য ২ সপ্তাহ সময় দেয়া দরকার হয় ।
- খামারে ডিম উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য একাধিক লেয়ার শেড থাকে এবং প্রতি শেডে বিভিন্ন বয়সের লেয়ার পালন করার পুলেট উৎপাদন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় ।
- পুলেটের খাদ্য প্রদান ঃ খাদ্য প্রদান কর্মসূচী
- পুলেটের পানি প্রদান ঃ অলোক সময়সূচী
- পুলেটের পানি প্রদান ঃ পানি প্রদান পদ্ধতি
- স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ প্রতিরোধ ঃ ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচী
-

প্রতিদিন পরিদর্শন

* প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় মুরগির আচরন পরীক্ষা করতে হয়।
* এসময় ঘরে মৃত ও দূর্বল মুরগি থাকলে অপসারন , রোগ নির্নয় ও প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
* মুরগির ঘরে কখনও পরিশুদ্ধ না হয়ে প্রবেশ করতে নেই।

মডিউল - ৫

৫.১ লেয়ার মুরগির সংজ্ঞা ও লেয়ার মুরগির ডিম উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যঃ

* ১৮ সপ্তাহ থেকে ডিম পাড়ার শেষ পর্যন্ত মুরগিকে লেয়ার মুরগি হিসাবে গন্য করা হয়।
বাস্তাবে ডিম পাড়া মুরগিকেই ডিম পাড়া মুরগি হিসেবে আমারা মনে করি।তাই তো ১৮ সপ্তাহ বয়সে থেকে মুরগিকে লেয়ার খাদ্য দেওয়া হয় ।

ডিম উৎপাদনেরবৈশিষ্ট্যঃ

* ২০ সপ্তাহ বয়সে শতকরা ৫ ভাগ ডিম পাড়তে শুরুকরে।
* ২১ সপ্তাহ বয়সে শতকরা ১০ ভাগ ডিম উৎপাদন শূরু হয়।
* ২৬ হতে ৩২ সপ্তাহ বয়সে সর্বোচ্চ ডিম উৎপাদন হয়।
* সর্বোচ্চা ডিম উৎপাদন শুরুও পর কিছুদিন স্থিতিশীল থাকে । এ সময় ডিমের আকার তেমন বড় হয় না। পরবর্তীতে উৎপাদন হার কমতে থাকে এবং ডিমের আকার বড় হতে থাকে।
* ৫০ সপ্তাহ বয়সের পর ডিমের আকার স্থিতিশীল হয় এবং ৪০ সপ্তাহ বয়সের পর ওজন বৃদ্ধি স্থিতিশীল হয়।
* কম বেশী সকল প্রকার বাণিজ্যিক ডিম পাড়া মুরগির বৈশিষ্ট্য অনুরুপ।

৫.২ খাদ্য প্রদান

ডিম উৎপাদন শুরু হওয়ার ২ সপ্তাহ পূর্ব থেকে খাদ্যেও শতকরা ২ভাগ ঝিনুক চূর্ণ ব্যবহার এবং ২০ সপ্তাহ বয়স হতে লেয়া খাবার ব্যবহার শুরুকরতে হয়।
ডিমউৎপাদনের শুরুও ৪/৫ দিন পূর্ব থেকে পুলেটের খাদ্য খাওয়ার পরিমান করতে থাকে এবং শতকরা ২০ভাগ পর্যন্ত কমতে থাকে ।

ডিম উৎপাদনের শুরুর পর ৪/৫ দিন পর্যন্ত দ্রুত খাওয়ার পরিমান বাড়তে থেকে এবং পরবর্তীতে এই বৃদ্ধি কমে আসে।
ডিমপাড়তে শুরু করার পর লেয়ার মুরগির তিন ধাপে খাদ্য প্রদান করতে হয়।

পানি প্রদান

পানি প্রদান কর্মসূচী দ্রষ্টব্য

আলোক প্রদান

আলোক প্রদান কর্মসূচী দ্রষ্টব্য ।

৫.৩ লেয়ার মুরগির স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঃ

* প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় মুরগির আচরন পরীক্ষা করতে হয়।
* আবহাওয়ার তাপমাত্রা অনুসারে পানি পান করার পরিমান যাচাই করতে হয়।
* খাদ্য খাওয়া ও পানি পান করার পরিমানের উপর মুরগির স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ভর করে।
* ঘরে মুরগির মৃত্যূ হলে মৃত্যুর কারন অনুসন্ধান করতে হয়এবং দ্রুত মৃত মুরগির শতকারের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়।
* নিয়মিত টীকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়।
* স্থানীয় প্রাণিচিকৎসকের পরামর্শক্রমে খাদ্য বা পানির সাথে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা নিতে হয়।
* মুরগির পালন পদ্ধতি অনুসারে মেঝেতে স্থান নির্ধারন হতে হবে।
* খামারের জৈব নিরাপত্তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

৫.৪ লেয়ার মুরগির ডিমপাড়া বাক্স প্রদান ও ব্যবস্থাপনা, ডিমসংগ্রহ ,ডিম বাছাই ও গ্রেডিং ঃ

* ডিমপাড়া বাক্সের ধরন ঃ ডিম পাড়ার জন্য প্রতিটি খোপের স্থান ১২ ইঞ্চি ১৪ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ১৪ ইঞ্চি
* এই বাক্স একক বা কলোনি টাইপ হতে পারে।
* ৪-৫ টি মুরগির জন্য একটি খোপ ব্যবহার করা যাবে এইঅনুপাতে ঘরে বাক্স দিতে হয়।
* বাক্সে যথেষ্ট ভেন্টিলেশন যুক্ত কিন্তু অন্ধকার হওয়া বাঞ্ছনীয় ।
* বাক্সের সম্মুখে মুরগি উঠার জন্য পাটফরম থাকে। পাটফরম তুলে দিলে বাক্সে ঢোকার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।
* বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন মাফিক ডিম পাড়ার বাক্সব্যবহার করা হয়।
* ডিম উৎপাদন শুরু করার ১ সপ্তাহ আগে গড়ে ডিমের বাক্স স্থাপন করতে হয় এবং ডিমের বাক্সের দরজা দিনের বেলায় খোলা রাখতে হয় ।
* বাক্সের নিচে ৬ ইঞ্চি হতে ১ ফুট উচুঁ থাকা প্রয়োজন, অন্যথায় লিটর পরিচর্যায় অসুবিধা হয় ।
* ডিমের বাক্সের ভিতর ডিম পাড়ার জন্য আরামদায়ক বিছানা অর্থাৎ লিটার সামগ্রী ব্যবহার করতে হয়।
* ডিমের বাক্সের ভিতর ডিম পাড়ার জন্য অভ্যস্ত করতে পূর্ব থেকে ১টি ডিম স্থাপন করলে ভাল হবে।
* ডিমের বাক্স ঘরের ভিতর কিছুটা অন্ধাকার স্থানে স্থাপন করা উচিত।

ডিম সংগ্রহ

* শীতের সময় সকাল ১০ থেকে ১১টা এবং বিকাল ৪টা থেকে ৪.৩০টার সময় ডিম সংগ্রহ করতে হয়।
* গরমের সময় সকাল – বিকাল ছাড়াও দুপুরে আর একবার ডিম সংগ্রহ করতে হয়।
* সন্ধ্যার সময় বাক্সের ভিতর কোন ডিম না রেখে সকালে দরজা খোলার সময় ১টি করে ডিম রাখা হয়।

ডিম বাছাই ব্যবস্থাপনা

- ফাটা ডিম সাথে সাথে পৃথক না করলে সমস্ত ডিম নষ্ট হয়ে যায়।
- ডিমের শেল পাতলা হলে খাদ্যের পুষ্টি মান পরীক্ষা করতে হয়।
- ডিমপাড়া বাক্সের বিছানা প্রতিদিন পরিষ্কার ও প্রয়োজনে নতুন লিটারসামগ্রী যোগ করতে হবে।
- ডিম সংগ্রহের সময় ডিমের ট্রেতে ডিম সংগ্রহ করা উচিত
- অসুস্থ ও অনুৎপাদনশীল মুরগি পৃথক করতে হয়।
- ডিম সংগ্রহের সময় স্বয়ক্রিয় যন্ত্রের ক্রটি পরিক্ষা করা উচত।
- ডিম সংগ্রহের সময় ডিমের মোটা মাথা উপরের দিকে এবং সরু মাথা নিচের দিকে থাকবে।

ডিমের গ্রেডিং

- ডিম বাজার জাত করার পূর্বে ডিম বাছাই ও গ্রেডিং করতে হয়।
- ডিমের আকার ও জন অনুসারে ডিম গ্রেডিং করতে হয়।
- দুই কুসুম বিশিষ্ট ডিম গুলোকে আলাদা করতে হয়।

৫.৫ লেয়ার মুরগির ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় ও বাজার জাত করন

* উন্নত মানের পুলেট তৈরী করার লক্ষ্যে বাচ্চা পালন থেকে শুরু করে ডিম পাড়ার শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা কোন ক্রুটি করা যাবে না ।
* ঠিকমত ব্রডিং ,টীক ,খাদ্য,পানি ,ঔষধ, ঘরের পরিচর্যা ,মুরগি ছাটাইপ্রক্রিয়া পালন করতে হবে।
* কোনঅবস্থাই মুরগিকে টীকা, ছাটাই প্রক্রিয়া ইত্যাদি সময়ে ধকলের সম্মূখীন হতে দেয়া যাবেনা।

বাজারজাতকরন

সঠিক সময়ে বাজার জাত করতে না পারলে খামারে অনেক ক্ষতি হয় । খামারের নির্ধারিত কর্মসূচী অনুসারে মুরগি ও ডিম বাজার জাত করতে হয়। অনেক সময় ডিম অনেক দিনের হয়ে গেলে পঁচে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে, তাতে খামারে যথেষ্ট ক্ষতি হয়। অনেক সময় ফুটানো ডিমের চাহিদা থাকে । ফুটানো ডিম বিক্রয় করতে হলে মুরগির সাথে মোরগ থাকতে হবে। ফুটানো ডিমের দাম অবশ্যই খাবার ডিমের চেয়ে অনেক বেশী হবে। এলাকার বাজার ব্যবস্থানুসারে বাজার জাত করাই শ্রেয়।

মডিউল-৬

ব্রয়লার পালন

৬.১ ব্রয়লার পালন কর্মসূচীঃ

* ব্রয়লার পালন করার জন্য অল-ইন-অল আউট কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত।
* পরবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরে মালটিপল রিয়ারিং কর্মসূচী গ্রহন করা হয় । এই কর্মসূচীর অধীনে চক্রকারে বিভিন্ন শেডের বিভিন্ন বয়সের ব্রয়লার পালন করলে সারা বৎসর উৎপাদন ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়।

ব্যাচ প্রতি বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারণ ঃ

- ব্রয়লার কাম গ্রোয়ার হাউজে ব্রয়লার পালন করা হয় ।
- ঘরের আয়তন অনুসারে বাচ্চা প্রতি ১ বর্গফুট হিসাবে বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারন করতে হয় ।
- বাণিজ্যিক খামারে ব্রয়লার ঘরের আয়তন এমন হওয়া উচিত যেখানে একজন পরিচর্যাকারীর সার্বক্ষণিক কর্মসময়ের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হয় । অন্যথায় শ্রমের অপচয় হয়।
- একজন পরিচর্য্যাকারী দৈনিক ৫০০০ বাচ্চার পরিচর্যা করতে পারে। যেখানে আধুনিক ব্যবস্থার অভাব ও দক্ষতা কম সেখানে সার্বাধিক ২,৫০০ বাচ্চা পালন করার জন্য ১ জন পরিচর্যাকারী প্রয়োজন।

বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণঃ

- অল-ইন-অল আউট কর্মসূচীর অধীনে প্রতি ব্যাচ ৫ সপ্তাহ হিসাবে সর্বোচ্চ ৭ ব্যাচ ব্রয়লার পালন করা যায়।
- প্রতি ব্যাচ ব্রয়লার উৎপাদন শেষে ২/৩ সপ্তাহ ঘর খালি রাখলে মোট ১৭ সপ্তাহ ঘর খালি থাকে।
- ঘর খালি সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জীবানুমুক্তকরণ, সংস্কার ইত্যাদি কাজ করা হয়।
- পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরে মালটিপল কর্মসূচী অনুসারে বিভিন্ন শেডের ধারণ ক্ষমতা হিসেব করে প্রতি ব্যাচে বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘর ছাড়া উন্মুক্ত ঘরে মালটিপল ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয়।

আর্দশ ব্রয়লার পালন শেড (ব্রুডার -কাম-গ্রোয়ার) হাউজ ঃ

ব্রয়লার পালন শেডের নক্সা

(১)ফুড প্যাড (২) বেসিন (৩) শেডের ব্যবহারের জুতা (৪) গ্লাস উইন্ডো (পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরে) (৫) দরজা (৬) স্বতন্ত্র কাপড় রাখার জন্য অয়ারড্রপ (৭) শেডের রেকর্ডপত্র (৮) শেডে প্রবেশপথ (৯) ব্রুডার স্থাপন (১০) শেডের ৮ ফুট দরজা (বড় আকারের শেডে ট্রাক্টর ঢুকে লিটার পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়)।

ব্রুডিং ও গ্রোয়িং ব্যবস্থা ঃ

- ঘরের মধ্যে আংশিক স্থান ঘিরে বাচ্চা ব্রুডিং করা হয়।
- বাচ্চার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্রুডার গার্ড প্রশস্ত করে থাকার স্থান বৃদ্ধি করা হয়।
- গ্রীষ্মকালে ১০-১৫ দিন পর এবং শীতকালে ১৫-২১ দিন পর ব্রুডার গার্ডের প্রয়োজন হয় না। এই সময় ঘরের তাপমাত্রা ৭০-৭৫ ডিঃ ফা: থাকে।
- ব্রুডিং শেষে হোভার উঁচুতে তুলে রাখা হয়

দেহের পালক গজানোর জন্য লিটারের অবস্থা ঃ

- লিটারের আর্দ্রতা শতকরা ২৫ ভাগ থাকা উচিত।
- লিটারের আর্দ্রতা শতকরা ৩০ ভাগ অতিক্রম করলে ককসিডিয়ার আক্রমন বৃদ্ধি পায় । তাছাড়া এমোনিয়া ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস বৃদ্ধির ফলে শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং দেহে পালক গজানোর হার কমে যায়।

৬.২ খাদ্য ও পানি ঃ

লেয়ার বাচ্চার অনুরুপ

পানি ঃ

লেয়ার বাচ্চার অনরূপ

ব্রয়লার মুরগির তাপমাত্রা

বাচ্চার বয়স	লেয়ার বাচ্চা				ব্রয়লার বাচ্চা				
সপ্তাহ	শীতকাল		গ্রীষ্মকাল		শীতকাল		গ্রীষ্মকাল		
	ফাঃ	সেঃ	ফাঃ	সেঃ	ফাঃ	সেঃ	ফাঃ	সেঃ	
১-২	৯৫.০	৩৫.০	৯১.০	৩২.৭	৯০.০	৩২.২	৮৬	৩০	
২-৩	৯০.০	৩২.২	৮৬.০	৩০.০	৮৫.০	২৯.২	৮১.০	২৭.২	
৩-৪	৮৫.০	২৯.৪	৮১.০	২৭.২	৮০.০	২৬.৬	৭৫.০	২৩.৮	
৪-৫	৮০.০	২৬.৬	৭৫.০	২৩.৮	৭৫.০	২৩.৮	-	-	
৫-৬	৭৫.০	২৩.৮	-	-	-	-	-	-	

৬.৩ ব্রয়লার মুরগির উদরে চর্বি গঠন ঃ

- ব্রয়লার খাদ্যে চর্বি /তৈল উপকরণ হার বৃদ্ধি করা হলে উদর বা তলপেটে চর্বি জমতে শুরু করে।
- খাদ্যে বিপাকীয় শক্তি কমানো হলে আমিষ ও অন্যান্য পুষ্ট উপাদান গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধিপায় । কিন্তু খাদ্য রূপান্তর হার কমে যাওয়ার ফলে তলপেটের চর্বির স্তর বড় হয়।
- এই স্তর বৃদ্ধির পরিমান খাদ্য রূপান্তর হারের সাথে সংম্পৃক্ত কারণ মাংস বৃদ্ধির তুলনায় চর্বির স্ত র বৃদ্ধি জন্য বেশী খাদ্যের প্রয়োজন হয়।
- খাদ্য রূপান্তর হার কম হলে দেহে চর্বির পরিমান বৃদ্ধি পায়।
- খাদ্য রূপান্তর হার বৃদ্ধির জন্য সমাপ্তি খাদ্যে বিপাকীয় শক্তির হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- খাদ্যে চর্বি বা তৈল জাতীয় উপকরন ব্যবহার দ্রষ্টব্য।

ব্রয়লারের চর্বি কমানোঃ

* বৎসরে সমস্ত সময় বাণিজ্যিক ব্রয়লার উৎপাদন, শারীরিক বৃদ্ধি ও খাদ্য রূপান্তর হার বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টার অন্ত থাকে না। এই প্রচেষ্টার ফলে দেহে চর্বির পরিমান অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় এবং সমস্ত দেহে বন্টন হয় তলপেটে চর্বি বৃদ্ধির পরিমাণ এত ব্যাপক যে প্রক্রিয়াজাত করার সময় চর্বি বাদ দিতে হয়।

সাপ্তহিক ওজন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

খাদ্য ও ওজন বৃদ্ধির পরিমান হাঁস-মুরগির খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা মডিউল -৯ অনুসারে করা বাঞ্চনীয় ।

আলোক ব্যবস্থাপনা ঃ

মডিউল -৭ এ বর্নিত আলোক ব্যবস্থাপনা দ্রষ্টব্য।

ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত করণ

ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত করনের ফলে যাতে করে মাংস উন্নত মানের হয় অর্থাৎ কোন রকমের ত্রুটি না থাকে । যেমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন , রোগজীবানুমুক্ত, থেতলানো ইত্যাদি বিষয়াদি নিশ্চিতকরনের উদ্দেশ্যেই প্রক্রিয়া জাতকরন করা হয়।

প্রক্রিয়াজাত পূর্ব প্রস্তুতিঃ

- ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত করার জন্য ধরার ২/৩ ঘন্টা পুর্ব থেকে খাদ্য বন্ধ রাখতে হয়ফলে পরিপাকতন্ত্রের সালমোনিলা জীবানুর পরিবৃদ্ধি কমে যায়।
- খাদ্য বন্ধ রাখার ফলে ব্রয়লার মুরগি কিছুটা ওজন হারায় ।
- ব্রয়লার মুরগি দুই পর্যায়ে অনাহারে থাকে। যেমন খামারে অবস্থানকালে ধরার পূর্ব এবং খামার থেকে প্রক্রিয়াজাত কারখানায় পৌঁছানো পর্যন্ত। ২ পর্যায়ে মোট ৮ থেকে ৯ ঘন্টার অতিরিক্ত অভুক্ত রাখা উচিত নয়।
- অভুক্ত সময়ে ২ থেকে ৩ ভাগ ওজন হারানো উচিত । বেশী সময় অভুক্ত থাকলে বেশী পরিমান ওজন হারাবে ইহা ব্রয়লারের গুনগত মান নষ্ট করে।
- মুরগি ধরে খাঁচায় ঢোকানোর পূর্ব পয়ন্ত পানি প্রদান করা হয়। এ সময় পানি প্রদান করা হয় না।
- প্রক্রিয়াজাত করার পর মাংস পরিচর্যা ও চিলিং করার সময় ২/৩ অংশ ওজন উন্নত হয়।
- খাঁচায় বা ক্রেটের ভিতরে ঢোকানোর পর প্রক্রিয়াজাত করা পর্যন্ত আর পানি প্রদান করা হয় না।

ব্রয়লার মাংস থেতলানো বা বিবর্নতা ঃ

* ব্রয়লার মাংস উৎপাদন এক জিনিস এবং মাংসের গুনগত মান অক্ষুন্ন রেখে বাজারজাতকরণ আলাদা জিনিস।

* ব্রয়লার ধরা বা হাতানোর সতয় অত্যন্ত সতকর্তা অবলম্নন না করলে মাংস থেতলানো হয়, বিবর্নতা সৃষ্টি হয় এবং মাংসের গুনগত মান ক্ষুন্ন হয়।

* ব্রয়লার ধরা জন্য পরিচর্যাকারীদের সঠিক প্রশিক্ষন ও কলাকৌশল বিষয়ে অবহিত করতে হয়।

(ক) প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিক্রয়ের ৫ দিন পূর্ব কাঁকর প্রদান বন্ধ রাখতে হয়।

(খ) ফিনিশার খাদ্যের সাথে সমস্ত প্রকার ঔষধ ব্যবহার প্রক্রিয়াজাত করার ৫ দিন পূর্বে সম্পূর্ন বন্ধ রাখতে হয়।

(গ) রাত্রে যখন মুরগি শান্ত থাকে তখন ধরতে হয় এবং ক্রেস বা খাঁচার মধ্যে ভরতে হয়।

(ঘ) মুরগি ধরার ২ ঘন্টা পুর্বে খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখতে হয়।

মাংস থেতলানো ও বিবর্ণতা পরিহার ব্যবস্থাপনাঃ

- লিটার ভিজতে অথবা দলা বাধতে দেওয়া যাবে না ।
- লিটারের অর্দ্রতা শতকরা ২৫-৩০ ভাগের বেশী বা কম রাখা যাবে না।
- ঘরে এমোনিয়া সৃষ্টি হতে দেওয়া যাবে না।
- পর্যাপ্ত পরিমাণ ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ব্রয়লার মুরগি প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ মেঝেতে স্থান থাকতে হবে।
- মুরগি ধরা, ক্রেটে ভরা পরিবহণ করা, ক্রেটে থেকে বের করা , জবেহ করা ইত্যাদি সময়ে অতিযত্ন ও সতর্ক ব্যবস্থা নিতে হবে।

- মুরগি ধরার পুর্বে উত্তেজিত করা যাবে না । উত্তেজিত হলে খাবার পাত্র, পানির পাত্র, দেওয়াল ইত্যাদির সাথে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং দেহের চামড়া ছুড়ে যায়, দেহ থেত্লে যায়, ফলে মাংস বিবর্ন হয়।
- ব্রয়লার পরিবহণের জন্য ট্রাক অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত ঘরের কাছে নেওয়া উচিত নয়। দিনের আলোয় ট্রাকের শব্দে মুরগি উত্তেজিত হয়।
- ব্রয়লার মুরগি ধরার কৌশল সম্বন্ধে পরিচর্যাকারীদের সঠিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হয়।
- মুরগি ধরার সময় অন্ধকারের পূবেই ঘরের সমস্ত সরঞ্জাম সরিয়ে ফেলতে হয়।
- মুরগি ধরার সময় ঘরে ডিমলাইট অথবা লাল অল্প পাওয়ারের লাইট ব্যবহার করতে হয় । দিনের বেলা মুরগি ধরার প্রয়োজন হলে ঘর অন্ধকার করে নিতে হয়।
- মুরগি ধরার পর এক সাথে বেশী বহন করা উচিত নয়। একসাথে বেশী মুরগি ধরে বহনের সময় দেহ থেতলে যায় ও মাংস বিবর্ণ হয়।
- অত্যন্ত সর্তকর্তার সাথে ক্রেট বা কুপের ভিতর মুরগি ঢোকাতে হয়।
- ট্রাকের উপর সতকর্তার সাথে মুরগির ক্রেট বা কুপ সাজাতে হবে। কখনও জোরে ক্রেটে রাখা অথবা ক্রেট ফেলে দেওয়া যাবে না।
- মুরগির চামড়া ছুড়ে যাওয়া, দেহ থেতলানো এবং মাংস বিবর্ন হওয়ার কারণগুলো অত্যন্ত যত্নের সাথে অবলোকন করতে হয় এবং সেই মত ব্যবস্থা নিতে হয়।

মডিউল –৭
আলোক ব্যবস্থাপনা

৭.১। আলোর গুরুত্ব ঃ

* বাচ্চা আলোর সাহয্যে পানি পান ও খাদ্য চিনে খেতে পারে।
* পুলেটের যৌন পরিপূর্নতা নিয়ন্ত্রণ করে।
* ডিম উৎপাদনে হরমোন নিস্বরণ ঘটায়।
* খাদ্য রুপান্তরে ভুমিকা রাখে।

পুলেটের যৌন পরিপূর্ণতায় আলোক সময় নিয়ন্ত্রণঃ

* পুলেটের জন্য অলোক সময় বেশী হলে যৌন পরিপক্কতা তাড়াতাড়ি হয়। অর্থাৎ নিদিষ্ট বয়সের পূর্বে ডিম দিতে শুরু করে।
(ক) পুলেটের ওজন বেশী হয়।
(খ) ডিমের আকার ছোট হয়।
(গ) ডিম উৎপাদন হার হ্রাস পায়।
(ঘ) ডিম উৎপাদন সময়কাল কমে যায়।
(ঙ) সর্বোচ্চ ডিম উৎপদন সকয়কালের পরিবর্তন হয়।
(চ) ডিমের থলি প্রলাপসের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
(ছ) পরস্পরের মধ্যে ক্যানাবলিজম সৃষ্টি হয়।
* ব্রুডিং হতে শুরু করে ক্রমান্বয়ে পুলেটের জন্য আলোক সময় কমাতে হয়।
* উন্নতজাতের পুলেট উৎপাদনের জন্য বাড়ন্ত বয়সে ৮ ঘন্টা আলোক সময় প্রয়োজন । এই সময় শুধু
  মাত্র পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরে প্রদান সম্ভব ।
* উন্মুক্ত ঘরে রাত্রে অন্ধকার এবং দিনের আলো ব্যবহার করা হয়।
* উন্মুক্ত ঘরে পুলেটের জন্য সর্বনিম্ন আলোক সময় প্রদান করতে হলে মৌসুমী বাচ্চা পালন করা যায়।

৭.২ ডিম উৎপদনে আলোক সময় নিয়ন্ত্রণঃ

* আলোর তীব্রতা ,আলোক দৈর্ঘ্য, এবং প্রত্যহ আলোক সময়ের পরিবর্তন মুরগীর ডিম উৎপাদন প্রভাবিত করে।
* আলোকরশ্মি মুরগীর চোখের মণিতে প্রতিফলিত হলে মস্তিকের পিটুইটারী গ্রন্থিতে জৈবিক অনুভুতি সৃষ্টি হয়। ফলে ফলিকুলার ষ্টিমুলেটিং হরমোন নিঃসৃত হয়।
* ফলিকুলার ষ্টিমুলেটিং হরমোন ডিম্বাশয়ের ডিম্ব কোষ পরিপক্ক হতে সাহায্য করে।
 ডিম্ব কোষ পরিপক্ক হলে পিটুইটারী গ্রন্থি হতে লুটিনাইজিং হরমোন নিঃসৃত হয়ে ডিম্বাণুর স্থলন ঘটায়।
* মস্তিকের পিটুইটারী গ্রস্থিতে এই সংবেদনশীল প্রক্রিয়া সংঘটনের জন্য কমপক্ষে ১২ ঘন্টা আলোক
  সময় প্রয়োজন।
* আলোক সময় ১২ ঘন্টার উর্দ্ধে বাড়ানো হলে পুনরায় কমানোর পর ডিম উৎপাদনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ কারণে আলোক সময় বৃদ্ধি করা হলে কোনক্রমেই কমানো যাবে না ।
* মৌসুমের বিভিন্ন সময়ে আলোক সময়ের পরিবর্তন হয়। যেমন ২৩ শে জুন দিনের দৈর্ঘ্য ১৪ ঘন্টার উর্দ্ধে এবং ২৩ ডিসেম্বর ১০ ঘন্টার নিচে।
মৌসুমের দীর্ঘ আলোক সময় ধরে লেয়ার মুরগির জন্য আলোক সময় নির্ধারণ করা হয়।

* লেয়ার মুরগির জন্য ১৫-১৬ ঘন্টা আলোক প্রদানের জন্য দিনের আলোক দৈর্ঘ্যের সাথে কৃত্রিম আলো সংয়োজন করতে হয়।
* দিনের অলো যদি ১২ ঘন্টা হয় তার সাথে সন্ধ্যার পর অথবা ভোরের পূর্বে ৪ ঘন্টা কৃত্রিম আলোক সময় যোগ করেত হয়। ৪ ঘন্টা আলোক সময় সন্ধ্যা ও ভোরের পুর্বে ভাগ করেও দেওয়া যায়।

আলোর তীব্রতা

বাচ্চা, পুলেট ও লেয়ার মুরগি এবং ব্রয়লারের জন্য আলোর তীব্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
মুরগির বয়স ও উপযোগিতা অনুসারে আলোক রশ্মির তীব্রতা ভিন্নতর হয়। আলোর তীব্রতা বেশী হলে -
(ক) ক্যানবলিজম বৃদ্ধি পায়।(খ) খাদ্য রুপান্তর হার হ্রাস পায় ।
(গ) মুরগির চোখে যন্ত্রণা হয়।
(ঘ) বিদ্যুৎ খরচ বেশী হয়।
* আলোর তীব্রতা এমন পর্যায়ে থাকা উচিত যেন মুরগির পানি পান ও খাদ্য চিনে খেতে অসুবিধা না হয় এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবস্থান করতে পারে।

আলোর তীব্রতার পরিমান ঃ

থাম্ব রুল অনুসারে ১ ওয়াট ইনকানডিসেন্ট বাল্ব থেকে ১২.৫৬ লমেন আলো বিচ্ছুরিত হয় এবং ১ ওয়াট ফ্লোরেসেন্ট বাল্ব থেকে ইনকানডিসেন্ট বাল্বের তুলনায় ৩ গুন বেশী আলো বিচ্ছুরিত হয়। ১ ওয়াট ফ্লোরেসেন্ট বাল্ব (১২.৫৬ী ৩) =৩৭.৬৮ =৩৭.৬৮ লুমেন।

ঘরে বাল্ব ব্যবহারের উচ্চতা ও দূরত্ব ঃ

ইনকানডিসেন্ট বল্ব ঃ লিটার ঘরে ৭-৮ ফুট (২.১০ মিটার ২.৪ মিটার) উঁচুতে বাল্ব স্থাপন করা হয়।
ফ্লোরোসেন্ট বাল্ব ঃ ঘরের আয়তন হিসাব করে ইনকানডিসেন্ট বাল্বের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ ওয়াটের বাল্ব ব্যবহার করলে সমপরিমাণ আলোর লুমেন পাওয়া যায়।

খাঁচার ভিতর মুরগির দেহে ০.৫ -১.৫ ফুট ক্যান্ডেল (৫.৩৮ -১৬.৫৭লাক্স) আলোর লুমেন প্রতিফলনের জন্য ঘরের মেঝে থেকে বাল্বের উচ্চতাঃ

ব্যবহৃত বাল্বের শক্তি	ঘরের মেঝে থেকে বাল্বের উচ্চতা (খাঁচাযুক্ত ঘরে)							
	০.৫-১.০ ফুট ক্যান্ডেল লুমেন				১.০- ১.৫ ফুট ক্যান্ডেল লুমেন			
	রিফ্লেক্টর সহ		রিফ্লেক্টর বাদে		রিফ্লেক্টর সহ		রিফ্লেক্টর বাদে	
ওয়াট	ফুট	মিটার	ফুট	মিটার	ফুট	মিটার	ফুট	মিটার
২৫	৬.৫	২.০	৪.৫	১.৪	৪.৫	১.৪	৩.০	০.৯
৪০	৯.০	২.৭	৬.৫	২.০	৬.৫	২.০	৪.৫	১.৪
৬০	১৪.০	৪.৩	১০.০	৩.১	১০.০	৩.১	৭.০	২.১
৭৫	১৫.৫	৪.৭	১০.৫	৩.২	১০.৫	৩.২	৭.৫	২.৩
১০০	১৯.০	৫.৮	১৩.৫	৪.১	১৩.৫	৪.১	৯.৫	২.৯

৭.৩ লেয়ার মুরগির ঘরে আলোক কর্মসূচী ঃ

(ক) ০ – ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত ঃ

বয়স দিন /সপ্তাহ	দৈনিক আলোক সময়		প্রতি বঃ ফুট স্থানে ওয়াটের পরিমান ও লুমেন	
	পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘর	উন্মুক্ত ঘর	ওয়াট	ফুট ক্যান্ডেল
১-৩ দিন	২৪ ঘন্টা	২৪ ঘন্টা	০.৫৬	৩.৪৫
৪-৬ দিন	২৩ ঘন্টা	২৩ ঘন্টা	০৫০	৩.০৭
৭-৮ দিন	২৩ ঘন্টা	২৩ ঘন্টা	০.৩৭	২.৩০
২ সপ্তাহ	২৩ ঘন্টা	২৩ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪
২-৩ সপ্তাহ	২২ ঘন্টা	২২ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪
৩-৪ সপ্তাহ	১৮ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	০.১৯	১.১৫
৪-৫সপ্তাহ	১৬ ঘন্টা	১৬ ঘন্টা	০.১৯	১.১৫
৫-৬ সপ্তাহ	১৪ ঘন্টা	১৪ ঘন্টা	০.১৯	১.১৫

(খ) পুলেট ও লেয়ার মুরগির ঘরের আলোক সময়সূচী ঃ

বয়স দিন /সপ্তাহ	দৈনিক আলোক সময়		প্রতি বঃ ফুট স্থানে ওয়াটের পরিমান ও লুমেন	
	পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘর	উন্মুক্ত ঘর	ওয়াট	ফুট ক্যান্ডেল
৬-৭ সপ্তাহ	১২.০০ ঘন্টা	রাত্রে অন্ধকার	০.১৯	১.১৬
৭-৮ সপ্তাহ	১০.০০ ঘন্টা	ঐ	০.১৯	১.১৬
৮-১০ সপ্তাহ	৯.০০ ঘন্টা	ঐ	০.০৯৫	০.৫৮
১০-১১সপ্তাহ	৮.০০ঘন্টা	ঐ	০.০৯৫	০.৫৮
১১-১২ সপ্তাহ	৮.০০ঘন্টা	ঐ	০.০৯৫	০.৫৮
১২-১৩ সপ্তাহ	৮.০০ঘন্টা	ঐ	০.০৯৫	০.৫৮
১৩-১৪ সপ্তাহ	৮.০০ঘন্টা		০.০৯৫	০.৫৮
১৪-১৫সপ্তাহ	৮.০০ঘন্টা	ঐ	০.০৯৫	০.৫৮
১৫-১৬ সপ্তাহ	৮.০০ ঘন্টা	ঐ	০.০৯৫	০.৫৮
১৬-১৭ সপ্তাহ	৮.০০ ঘন্টা	ঐ	০.০৯৫	০.৫৮
১৭-১৮ সপ্তাহ	৯.০০ ঘন্টা	ঐ	০.১৯	১.১৫
১৮-২০ সপ্তাহ	১১.০০ ঘন্টা	১১.০০ ঘন্টা	০.১৯	১.১৫
২০-২১ সপ্তাহ	১২.০০ ঘন্টা	১২.০০ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪
২১-২২ সপ্তাহ	১২.৩০ ঘন্টা	১২.৩০ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪
২২-২৩ সপ্তাহ	১৩.০০ ঘন্টা	১৩.০০ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪
২৩-২৪ সপ্তাহ	১৩.৩০ ঘন্টা	১৩.৩০ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪
২৪-২৫ সপ্তাহ	১৪.০০ ঘন্টা	১৪.০০ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪
২৫-২৬ সপ্তাহ	১৪.৩০ ঘন্টা	১৪.৩০ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪
২৬-২৭ও উর্দ্ধে	১৫.০০ ঘন্টা	১৬.০০ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪

ব্রয়লারমুরগির ঘরের আলোক সময়সূচী ঃ

বয়স দিন /সপ্তাহ	দৈনিক আলোক সময়		প্রতি বঃ ফুট স্থানে ওয়াটের পরিমান ও লুমেন	
	পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘর	উন্মুক্ত ঘর	ওয়াট	ফুট ক্যান্ডেল
১-৩ দিন	২৪ ঘন্টা	২৪ ঘন্টা	২.৫৬	৩.৪৫
৪-৭ দিন	২৩ ঘন্টা	২৩ ঘন্টা	২.৫০	৩.০৭
৮-১৪ দিন	২০ ঘন্টা	২০ ঘন্টা	০.০৫৭	০.৩৫
১৫-২১দিন	১৮ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	০.০৫৭	০.০৩৫
২২-২৮ দিন	১৮ ঘন্টা	রাতে ৮ ঘন্টা অন্ধকার	০.০৫৭	০.০৩৫
২৯ -৩৫ দিন	১৮ ঘন্টা	রাতে ৮ ঘন্টা অন্ধকার	০.০৫৭	০.০৩৫
৩৬-৪২ দিন	১৮ ঘন্টা	রাতে ৮ ঘন্টা অন্ধকার	০.০৫৭	০.০৩৫

মডিউল -৮

হাঁস-মুরগির রোগসমূহ ও তার প্রতিকার

বাংলাদেশে প্রতি বৎসর বিভিন্ন রোগে বহু মোরগ– মুরগি মারা যায়। এ সকল রোগের মধ্যে প্রধান হচ্ছে রানীক্ষেত, মুরগির বসন্ত , মুরগির কলেরা, গামবোরো ,ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস, রক্ত আমাশয় বা ককসিডিওসিস ইত্যাদি প্রধান।

রানীক্ষেত ঃ রানীক্ষেত রোগের জীবানু একপ্রকার ভাইরাস। সাধারনতঃ সকল বয়সের ও সকল জাতের মোরগ-মুরগিই রানীক্ষেত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। মোরগ-মুরগী ছাড়াও কবুতর, দোয়েল, কোয়েল, কাক, পেঁচা, ঘুঘু, চড়ুই, শালিক, ময়ূর, কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার পাখি এই রোগ জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। হাঁস (পাতি হাঁস) বা রাজ হাঁসের সচরাচর এই রোগ দেখা যায় না।

রানীক্ষেত রোগের লক্ষনগুলোর মাঝে চুনা বা সবুজ রং এর রক্তাক্ত কিংবা তরল পায়খানাই প্রধান । রোগাক্রান্ত পাখীর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়, বাচ্চা মোরগ-মুরগি হা করে শ্বাস নেয় মাঝে মাঝে আক্রান্ত মোরগ-মুরগি ঘাড় বাঁকা হয়ে যায় তাছাড়া আক্র্রান্ত পাখীর পাখা ছেড়ে দিয়ে ঝিমাতে থাকে , খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে খাওয়াদাওয়া ও ডিম পাড়া বন্ধ করে দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগাক্রান্ত হবার এক সপ্তাহের মাঝেই মৃত্যু ঘটে থাকে। আবার কোন কোন সময় রোগের লক্ষন প্রকাশ পাওয়ার আগেই হঠাৎ মৃত্যু ঘটে।

মুরগির বসন্ত ঃ মুরগরি বসন্ত রোগের জীবানু একপ্রকার ভাইরাস। অনেক সময় রোগের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মুরগির বসন্ত রোগকে কন্টাজিয়াস ইপিথেলিওমা ও এভিয়ান ডিপথেরিয়া বলা হয়।

সাধারনত ঃ মোরগ-মুরগি , কবুতর এই রোগজীবানু দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ ছাড়াও চড়ুই, ময়ূর , টিয়া ও অন্যান্য পোষা পাখী মাঝে মাঝে এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। যে কোন বয়সের মোরগ-মুরগিই বসন্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

বসন্ত রোগে মোরগ-মুরগির একমাত্র পালক বিহীনস্থানে লক্ষন প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ এই রোগের মাথায় বিভিন্ন জায়গায় যেমন ঝুটি, লতি, মুখের কোনায়, চোখের পাতায় এবং মাঝে মাঝে পায়ে ছোট ছোট আঁচিলের মত গুটি দেখা যায় । গুটি হওয়ার আগে প্রথমে লাল হয় এবং রস জমা হয়। পরে কালকাল গুটি তৈরী হয়। মাথার বিভিন্ন জায়গায় এই ধরণের গুটিই মুরগীর বসন্ত রোগ নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট। এই রোগে মোরগ-মুরগি খাওয়া থেকে বিরত হয়ে যায়। ডিম পাড়া কমে যায়। এই রোগে বয়স্ক মোরগ-মুরগির মৃত্যুর হার কম। বাচ্চা মোরগ-মুরগির মৃত্যুর হার সাধারণত কিছুটা বেশী দেখা যায। ৩-৪ সপ্তাহ অসুখে ভোগার পর আপনা থেকেই বড় মোরগ-মুরগি ভাল হয়ে উঠে।

মুরগির কলেরা ঃ এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা মুরগির কলেরা হয়ে থাকে এই ব্যাকটেরিয়া মুরগির দেহে প্রবেশ করে রক্তের সাথে মিশে এক প্রকার বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং রক্ত চলাচলের সাথে মিশে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সকল বয়সের মোরগ-মুরগির এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

আক্রান্ত মুরগির মল দ্বারা মুরগির খাদ্য ও পানি দূষিত হয় এবং রোগ ছড়িয়ে পড়ে। বন্য পাখী, কুকুর , বিড়াল, ইত্যাদি প্র্রাণীর দ্বারাও এ রোগ এক জায়গা থেকে অন্য যায়গায় বিস্তার লাভ করে। বাজার থেকে রোগাক্রান্ত মোরগ-মুরগি কিনে আনলেও এ রোগ হয়ে থাকে।

এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর মোরগ-মুরগি খেতে চায়না, পালকগুলো খসখসে হয়ে যায়, চেহারায় অবসন্ন নেমে আসে ও রক্তশূন্য মনে হয়ে । মোরগ-মুরগির পিপাসাও বেড়ে যায়। পায়খানার রং সবুজ এবং সাদা ও ফেনাযুক্ত মনে হয়। চলাফেরা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এক জায়গায় দাড়িয়ে ঝিমাতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে মারা যায়।

রক্ত আমাসয় বা ককসিডিওসিস ঃ এ রোগ ইমেরিয়া নামক এক প্রকার পরজীবি দ্বারা হয়ে থাকে। মোরগ-মুরগির অন্ত্রের মধ্যে এই রোগ বিস্তার লাভ করে এবং হজম করার শক্তি ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয় । এই রোগ মোরগ-মুরগির মলের সাহায্যে বিস্তার লাভ করে। এই রোগের পরজীবি মুরগির অন্ত্রে প্রচুর ডিম দিয়ে থাকে। এক চা চামচ মলে প্রায় ৭০ লক্ষ ডিম থাকতে পারে। রোগাক্রান্ত মুরগির মল ভিজা মাটিতে পড়লে এ রোগের ডিম দীর্ঘ সময় জীবন্ত থাকে ও কোন রকমে অন্য কোন সুস্থ্য মুরগির পেটে খাবারের সাথে প্রবেশ করতে পারলে পুনঃ রোগ বিস্তার শুরু করতে পারে।

এ রোগে আক্রান্ত হলে মোরগ-মুরগি ঝিমাতে থাকে। চোখ বন্ধ করে রাখে ও গায়ের পালক ঝুলে পড়ে। পায়খানার সাথে রক্ত মিশানো আম পড়তে থাকে । খাবার খেতে চায়না কারণ খাদ্য হজম না হওয়ায় খাদ্যথলি পূর্ন থাকে।

ইনফেকসাস ব্রংকাইটিসঃ এই রোগের জীবানু একপ্রকার ভাইরাস। এই রোগ সংক্রামক ও মারাত্মক ছোঁয়াছে প্রকৃতির । সাধারণত ঃ শ্বাস যন্ত্রই এই রোগে আক্রান্ত হয় ।
একটু বয়স্ক মোরগ-মুরগির এই রো্গ দেখা দেয়। তবে সকল জাতের মোরগ মুরগিরই এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বছরের সব সময়ই এই রোগ হয়ে থাকে। এই রোগের জীবানু দ্বারা শ্বাসযন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার ফলে নানা ধরণের লক্ষন দেখা যায়- যেমন ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস , কফ হাঁচি , নাক দিয়ে রক্ত মিশ্রিত শেষ্মা পড়ে, হা করে নিশ্বাস নেয় এবং ঠোট দিয়ে পানি পড়ে। রক্ত মিশ্রিত কফ ট্রাকিয়া ও ল্যরিংসের পথ বন্ধ করায় শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। সেই কারনে মাঝে মাঝে আক্রান্ত পাখীকে প্রচন্ড জোরে মাথা ঝাকানোর সাথে সাথে গড় গড় বা ফিস ফিস শব্দ করতে দেখা যায়।
গামবোরো রোগের টীকা ঃ গামবোরো রোগকে ইনফেকস্স বার্সাল ডিজিজ ও বলা হয়। সাধারণত ৩-৮ সপ্তাহ বয়সের মোরগ -মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। আক্রান্ত মোরগ -মুরগির কুচকানো পালক, অবসন্নতা, ময়লা যুক্ত পায়ুস্থান, উচ্চ তাপমাত্রা, কাঁপুনি ও পানির মত ডায়রিয়া এ রোগের প্রধান লক্ষন । এ রোগের ভ্যাকক্সিন এন্টিনিউয়েটেড ও লাইভ আকারে পাওয়া যায়। প্যারেন্ট মুরগির টীকা প্রদান করতে হয়। বয়স্ক প্যারেন্ট মুরগির কিল্ড ভ্যাকক্সিন প্রদান করতে হয়।

৮.১ মোরগ-মুরগির রোগসমূহ রোগের কারনসমূহ রোগ বিস্তারের মাধ্যম সমুহ ঃ

রোগের কারণসমূহ ঃ

* সুষম খাদ্যের অভাব।
* সীমাবদ্ধ স্থানে নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত হাঁস-মুরগির অবস্থান।
* অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান বা পরিবেশ।
* রোগ সৃষ্টিকারী অনুজীবাণু, জীবাণু, পরজীবী ছত্রাক ইত্যাদির আবির্ভাব।
* রোগজীবাণূ বিষয়ে অসতর্কতা, অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা।
*দুষিত ও ভেজা খাদ্য ।

রোগ বিস্তার প্রক্রিয়া ঃ

অসুস্থ হাঁস-মুরগির মল,কফ, সর্দি, ক্ষত হতে বের হতে হওয়া রক্ত ও পূজঁ ইত্যাদির মাধ্যমে সূস্থদেহে রোগ বিস্তার লাভ করে।
(ক) পানি ঃ কৃমির ডিম অসুস্থ হাঁস-মুরগির শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়া পালক, ময়লা বিভিন্ন প্রকার জীবানু অনুজীবাণু ইত্যাদি দ্বারা দুষিত পানির মাধ্যমে রোগ বিস্তার লাভ করে।
(খ) বাতাসঃ দূষিত বাতাসের মাধ্যমে অণূজীবাণূ ও শ্বাসযন্ত্রে রোগ জীবাণূ বিস্তার লাভ করে ।
(গ) মাটি ঃ অনেক রোগ অনুজীবি ও কৃমির ডিম ভেজা মাটির মধ্যে অনেককাল পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। পরিচর্যাকারী দূষিত মাটি মাড়িয়ে ঘরে ঢুকলে পায়ে পায়ে ঐ জীবাণূ মুরগির ঘরে বিস্তার লাভ করতে পারে।
(ঘ) সংস্পর্শ ঃ রোগাক্রান্ত হাঁস-মুরগি বা মুরগি পালকের সংস্পর্শে থেকে সংক্রামক রোগের জীবাণু সংক্রমিত হয়। হ্যাচারিতে অসুস্থ মুরগির ডিম থেকেও এ সমস্ত রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে।
(ঙ) বাহক ঃ অনেক সময় সূস্থ হাঁস-মুরগি নিজে অসুস্থ না হয়ে রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে। মানুষ বা অন্য কোন প্রানী, খামারের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি রোগের বাহক হিসাবে কাজ করতে পারে। এজন্য খামারে হাঁস-মুরগির চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা উত্তম । মনে রাখা উচিত অসুস্থ হাঁস-মুরগি চিকিৎসার পর পূর্বের মত উৎপাদনশীল থাকে না।

৮.২ খামরের জীব-নিরাপত্তা ঃ

নিম্নে বর্নিত বিষয়গুলো বিবেচনা করলে খামারে সঠিকভাবে রোগ জীবানু প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা যাবে।

* প্রতিপালন পদ্ধতি ও উপযোগিতানুসারে মুরগির ঘর/শেড নির্মিত হতে হবে।
* বয়স ও উপযোগিতা অনুসারে নির্ধারিত নিয়মে খাদ্যের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
* বয়স ,উপযোগিতা এবং সংখ্যানুপাতে ঘরে থাকার স্থান দিতে হবে।
* বয়স উপযোগিতা ও হাঁস-মুরগির সংখ্যানুপাতে খাদ্যের পাত্র, পানির পাত্র , ডিমপাড়ার স্থান দিতে হবে।
* ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
* সপ্তাহে নির্ধারিত দিনে হাঁস-মুরগির বয়স লিঙ্গ ও উপযোগিতা অনুসারে নমুনা ওজন গ্রহণ করতে হবে।
* বয়স ,লিঙ্গ ও উপযোগিতা অনুসারে ওজন নিয়ন্ত্রন করা প্রয়োজন।
* পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
* ঘরে বা মুরগির দেহে উকুনের উপদ্রব বন্ধ করতে হবে।
* লিটার প্রথায় হাঁস-মুরগি পালন করলে লিটারের পরিচর্যা করতে হবে।
* খাদ্য ও পানি দেওয়ার সময় হাঁস-মুরগি আচরণ কিছুক্ষণ লক্ষ রাখতে হবে।
* পরিচর্যাকারী স্বাস্থ্যপ্রদ ও পরিস্কার পিরচ্ছন্ন অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করতে হবে।
* মুরগির ধকল বা পীড়ন সৃষ্টি হয় এমন ব্যবস্থা বা পরিবেশ কখনও তৈরি করা যাবে না।
* খামারে পরস্পর শেডের মধ্যে নিদির্ষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে শেড নির্মান করতে হবে।
* বৎসরে অন্ততঃ ১ বার এবং নতুন পালের হাঁস-মুরগি পরিবর্তনের সময় সমস্ত ঘর, ঘরের সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করা আবশ্যক।
* ঘরে ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত রাখা আবশ্যক।
* খামারের অঙ্গিনার মধ্যে পোষা বা বন্য প্রাণিপাখী এবং বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে।
* বিভিন্ন জাত, বয়স ও উপযোগিতা অনুসারে হাঁস-মুরগি সম্পূর্ন আলাদা ব্যবস্থায় প্রতিপালন করা উচিত।
*মৃত হাঁস-মুরগি যথাযথ ব্যবস্থায় সৎকার ব্যবস্থা করা দরকার।
* নিয়মিত ভাবে প্রতিষেধক টীকা ব্যবহার করা দরকার।
* টীকা প্রদানের নিয়মাবলী সঠিকভাবে অনুসরন করা প্রয়োজন।
* বাচ্চা এবং বাড়ন্ত বাচ্চা খামারে জন্য ক্রয়ের পরিচিত , বিশ্বস্ত এবং রোগমুক্ত হ্যাচারী বা খামার থেকে ক্রয় করা প্রয়োজন।
* কোন প্রকৃতি জীবানূণাশক ব্যবহার করা হয় এবং ব্যবহার পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।
* হ্যাচারী উপজাতসমূহ অপসারন করার প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে করতে হবে।
* হাঁস-মুরগির পায়খানা এবং লিটার অপসারণ করার প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে করতে হবে।
* খামারের কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা অবলোকন, পরিদর্শণ, অনুসরন, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করার পদ্ধতি গুলো যথাযথ ভাবে পালন করতে হবে।
* খাদ্যের পুষ্টিমান যথাযথ থাকতে হবে।
* খাদ্যের উৎস ও প্রস্তুত পদ্ধতি স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া প্রয়োজন।
* পানির উৎস স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া প্রয়োজন।

৮.৩ টীকা বীজ ব্যবহারের সতর্কতা , টীকা প্রদান কর্মসূচী, টীকা প্রদানের মধ্যমে আত্ম কর্মসংস্থান ঃ

* টীকা ব্যবহারের পর অতিরিক্ত টীকা পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা জীবানুনাশক দ্বারা নষ্ট করে ফেলতে হবে।
* কেবলমাত্র সুস্থ ও সবল বাচ্চা /মুরগিকে টীকা দিতে হবে।
* টীকা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন- সিরিঞ্জ, সুঁচ , বিকার ইত্যাদি পানিতে ফুটিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হয়। কোন ক্রমেই জীবানুমুক্ত করার জন্য জীবানুনাশক ব্যবহার করা যাবে না।
* লাইভ ভাইরাস ভ্যাকসিন চোখে ড্রপ দেওয়ার সময় নীচে কাগজ বিছিয়ে নেওয়া ভালো। অসাবধানতাবসত টীকা বীজের ফোঁটা কাগজে পড়তে পারে । পরবর্তীতে কাগজ পুড়িয়ে ফেলতে হয়।
* বাচ্চা সংগ্রহের সময় প্যারেন্ট মুরগির কি কি টীকা প্রদান করতে হয় তা জানতে হবে।

টীকা প্রদান কর্মসূচী ঃ

বয়স	রোগের নাম	ভ্যাকক্সিনের নাম	টীকা প্রদারেন পদ্ধতি
১ দিন	মারেক্স রোগ	মারেক্স ভ্যাকসিন	চামড়ার নীচে ইনজেকশণ
২ দিন	গামবোরো রোগ	গামবোরো ভ্যাকসিন(লাইভ)	চোখে ফোঁটা (প্যারেন্ট মুরগির টীকা প্রদান করা না থাকলে)
৩-৫ দিন	রানীক্ষেত রোগ	বি.সি.আর ডি.ভি.	দুই চোখে ফোঁটা (প্যারেন্ট মুরগির টীকা প্রদান করা থাকলে ৭-১০ দিন বয়সে)
৭ দিন	ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস	আই. বি.	চোখে ফোঁটা
১০-১৪ দিন	গামবোরো রোগ	গামবোরো ভ্যাকসিন	এক চোখে ফোঁটা
২১-২৪ দিন	রানীক্ষেত রোগ	বি.সি.আর ডি.ভি.	দুই চোখে ফোঁটা
২৪-২৮ দিন	গামবোরো রোগ	গামবোরো ভ্যাকসিন	এক চোখে ফোঁটা
৩৫ দিন	মুরগির বসন্ত	ফাউল পক্স ভ্যাকসিন	চামড়ার নীচে সুচ ফুঁটিয়ে
৬০ দিন	রানীক্ষেত রোগ	বি.সি.আর ডি.ভি.	চামড়ার নীচে /মাংসে ইনজেকশন
৮০-৮৫ দিনে	কলেরা	ফাউলকলেরা ভ্যাকসিন	চামড়ার নীচে /মাংসে ইনজেকশন
১১০-১১৫দিন	কলেরা	ফাউলকলেরা ভ্যাকসিন	চামড়ার নীচে /মাংসে ইনজেকশন
১৩০ -১৩৫ দিন	ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস	সমন্বিত টীকা	চামড়ার নীচে /মাংসে ইনজেকশন
১৩০-১৩৫দিন	কৃমি	কৃমিঔষধ	খাদ্য /পানির সাথে।

*খাদ্যের সাথে ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত Cocidiostat ব্যবহার করতে হয়।

ব্রয়লার মুরগীর জন্য মারেক্স , গামবোরো ও রানীক্ষেত রোগের ভ্যাকসিন ব্যবহার করতে হয়। এলাকায় অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব না থাকলে ভ্যাকসিন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না । এ বিষয়ে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয় ।

৮.৪ টীকা প্রদান কর্মসূচী ফলপ্রসু না হওয়ার কারন সমূহঃ

* টীকাবীজ সঠিকভাবে সংরক্ষিত না থাকলে
*ব্যবহারের সময় মেয়াদ উর্ত্তীন হলে।
* প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের নির্দেশাবলী সঠিকভাবে পালন না করা হলে।
* সাত দিন বা তার কম সময়ের মধ্যে অন্য কোন রোগের টীকা প্রদান করলে ।
* দুপুর বেলা প্রচন্ড গরমের মধ্যে টীকা প্রদন করা হলে।
* টীকা বীজ সরাসরি সূর্যকিরনে থাকলে।
* টীকা বীজ তরলকৃত করার পর নির্ধারিত সময়ের পরে ব্যবহার করলে।
* ব্যবহৃত পানি পরিশুদ্ধ না হলে।
* ভ্যাকসিন গুলানোর জন্য নির্দিষ্ট ডাইলুয়েন্ট ব্যবহার না করলে।
* টীকা বীজ শরীরের মধ্যে পরিমাণমত প্রবেশ না করলে ।
* নির্দিষ্ট ষ্ট্রেইন এর টীকাবীজ ব্যবহার না করলে।
* টীকা প্রদানকারী পরিচ্ছন্ন ও জীবানুমুক্ত না থাকলে।
* টীকা প্রদানের সময় টীকা প্রদানের সরঞ্জাম জীবানুমুক্ত ও পরিশুদ্ধ না থাকলে।
* গামবোরো রোগে অথবা মাইকো প্লাজামা রোগে আক্রান্ত হলে ।

৮.৫ লিটার ও মৃত মুরগি অপসারন প্রক্রিয়া, কম্পোজিট ও কম্পোষ্টপদ্ধতি, বায়োগ্যাস পান্ট পদ্ধতিঃ

* খামারের ভিতর পৃথক স্থান থাকলে বড় পুকুরের মত গর্ত করতে হয়।
* সদ্য মল খাঁচা ও মাঁচার নীচে পানি স্প্রে করে ধুয়ে পুকুরে মত গর্তে ফেলে দিতে হয়।
* এই প্রথায় ময়লা পানি ও মুরগির মল প্রকত্রে পুকুরের মধ্যে জমা হয়।
* কম্পোজড করে জৈব সার জমিতে ব্যবহার করা যায়।
* মাটির ৫/৬ ফুট গভীরে এন এরাবিক অবস্থায় ফারমেনটেশন করে গবাদি প্রাণির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
* মুরগির বিষ্ঠা দ্বারা বায়োগ্যাস তৈরী করে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
* লিটার সরাসরি জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
* শুকিয়ে সার ও খাদ্য হিসাবে সংরক্ষন করা যায়।
* লিটার মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
* লিটার মৃত মুরগির সাথে কম্পোজড করে সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

কম্পোষ্টিং পদ্ধতিতে মুরগির বিষ্ঠা অপসারন প্রক্রিয়া

কম্পোষ্টিং একটি নিয়ন্ত্রিত জৈবপচন প্রক্রিয়া ,যা জৈব পদার্থকে স্থিতিশীল দ্রব্যে রুপান্তর করে। যে সকল অনুজীব পচনশীল পদার্থকে তাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার কবে, সে সকল অনুজীবের উপর এ প্রক্রিয়া নির্ভশীল। কম্পোষ্টিং প্রক্রিয়া গন্ধ ও অন্যান্য বিরক্তিকর সমস্যা সম্বলিত পদার্থকে স্থিতিশীল গন্ধ ও রোগ জীবানু, মাছি ও অন্যান্য কীট পতঙ্গের প্রজননের অনুপযোগী পদার্থে রূপান্তরীত করে।

যে সকল মৌলিক পরিবর্তনশীল উপাদান পচন ক্রিয়া কার্যকারীতা প্রভাবান্বিত করে সে গুলো হচ্ছে ঃ

- বাতাস প্রবেশ করানোর মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহ ।
- জৈব পদার্থে যে নাইট্রোজেনের অংশ থাকে সাধারণত ঃ একে সিঃএন (কার্বন/নাইট্রোজেন) অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হয়।
- সর্বাপেক্ষা অনুকূল আর্দ্রতা ৪০%-৬০%।
- তাপমাত্রা ঃ কম্পোস্টিং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পরিবর্তনশীল তাপমাত্রা বিভিন্ন ধাপ অক্রিম করেঃ থার্মোফিলিক ধাপ (৪৫ ডিগ্রী -৬০ ডিগ্রী সেঃ) একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কেননা এই তাপমাত্রায় রোগ জীবানু এবং ঘাসের বীজ ধ্বংস হয়।
- এসিডিটি বা অম্লত্ব ঃ সর্বাপেক্ষা অনূকূল মান ৫.৫-৮.০ ।
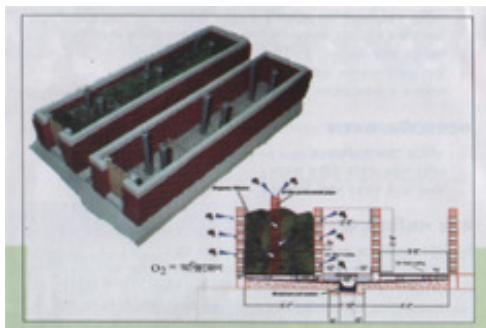
কম্পোস্ট ঃ

কম্পোস্ট হলো পচাঁ জৈব উপকরণের এমন একটি মিশ্রণ যা উষ্ণ আর্দ্র পরিবেশে অনুজীব কর্তৃক বিশিষ্ট হয়ে উদ্ভিদের সরাসরি গ্রহন উপযোগী পুষ্টি উপকরণ সরবরাহ করে।

বাক্স পদ্ধতিতে কম্পোস্টিং

নিম্ন লিখিত পদ্ধতিতে কম্পোস্ট বাক্স নির্মান করা যায় ঃ

- চৌকোনাকৃতি ছিদ্রযুক্ত ইটের দেয়াল দিয়ে বাক্স তৈরী করা হয়।
- দেয়ালের গাযে ৪বর্গ ইঞ্চি মাপের অসংখ্য ছিদ্র থাকে।
- বাক্সের তলায় বিশেষভাবে নির্মিত ১/২ ইঞ্চি পুরু ছিদ্র বিশিষ্ট পি.ভি.সি. সীট বা লোহার রড বা অন্য কিছু দিয়ে তৈরী জালি মেঝে থেকে ৬ ইঞ্চি উপরে বসানো হয় । ফলে কম্পোস্ট মিশ্রণে বাতাস প্রবেশ ছাড়াও অতিরিক্ত পানি ঝরে পড়ে।
- চার ইঞ্চি ব্যাসের সাড়ে চারফুট লম্বা অনেকগুলো প্লাস্টিক পাইপের প্রয়োজন হয়।
- এ সকল পাইপের গায়ে ১ ইঞ্চি ব্যাসের অনেকগুলো ছিদ্র থাকে।
- এই পাইপগুলো প্রতি দেড় ফুট পর পর বাক্সের তলা থেকে খাড়াভাবে বসানো হয়।
- কম্পোস্ট মিশ্রণ দিয়ে বাক্সটি ভরার পর বাক্সের চারদিক দিয়ে কম্পোস্ট মিশ্রণের মধ্যে বাতাস প্রবেশ ছাড়াও পাইপের ভেতর দিয়ে বাতাস আদান প্রদানের মাধ্যমে কম্পোস্টিং কার্য্যক্রম সম্পাদিত হয়।
- এই পদ্ধতিতে বাক্সের মধ্যে কম্পেটাস্টিং প্রক্রিয়া ৪০ দিনে সম্পন্ন হয়।
- পরিপক্কতা বা ম্যাচিউরিং এর জন্য আরও ১৪ দিন সময়ের প্রয়োজন হয়।
- কম্পোস্ট বাক্স অবশ্যই ছাউনীর নীচে স্থাপন করতে হবে।
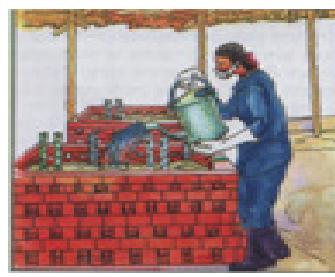
চিত্র-১৭ কম্পোস্টিং বাক্স তৈরি করণ

চিত্র ১৮ কম্পোস্টিং উপকরণ মিশ্রিত করণ

চিত্র ১৯ কম্পোস্টিং বাক্সে উপকরণ দেয়া

চিত্র ২০ কম্পোস্টি বাক্সে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা রক্ষার্থে পানি দেয়া।

চিত্র ২১ কম্পোস্টিং পরিপক্ক হওয়ার পর উপকরণসমূহ বের করে নেওয়া।

চিত্র ২২ পরিপক্কতার পর চালুনে চালা এবং বস্তা জাত করা করা।

চিত্র ২৩ কম্পোস্টিং সার শাকসব্জি খেতে ব্যবহার

মডিউল -৯
হাঁস-মুরগির খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনাঃ

৯.১ খাদ্যের উপদান সমূহ ও প্রকার ভেদঃ

হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়া ও মূল্যবান আমিষ খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা । এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য খামার ব্যবস্থাপনার প্রধানতম অংশ খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ করা ।

* খামার পরিচালনার জন্য মোট খরচের সিংহভাগ শুধু খাদ্যের জন্য খরচ হয়।
* এই খরচের শতকরা ৭০ ভাগের অতিরিক্ত হলে খামারে লোকসারনের হার বৃদ্ধি পায়।
* খামার ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা কালে খাদ্য খরচ শতকরা ৬০ হমে ৭০ ভাগের মধ্যে সীমিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

এ কারনে খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে প্রছন্ন ধারণা অর্জন খামার ব্যবস্থাপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।

* খাদ্য এমন এক বস্তু যার অভাবে হাঁস-মুরগি সহ কোন প্রানী বাঁচতে পারে না।
* খাদ্য বস্তু প্রানীর দেহের চালিকা শক্তি
* খাদ্যের বিভিন্ন পুষ্টি উপদানের সাহায্যে প্রাণীদেহে ও দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়।
* প্রতিদিনের খাদ্য দেহকে সবল রাখে তেমনি দেহকোষ গঠন ও নবায়ন করে।
* খাদ্য হাঁস-মুরগির পালক গঠন করে ও নবায়ন করে।
* খাদ্য মাংস ও ডিম গঠিত হয়।
* খাদ্য মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করে।
* খাদ্যের পুষ্টি উপপাদান বিভিন্ন প্রকার রোগের আক্রমণ থেকে হাঁস-মুরগিকে রক্ষাকরে।
* খাদ্য দেহের ভিতর বিভিন্ন গ্রন্থি হতে নিঃসৃত রস উৎপাদন করে।

খাদ্যের উপদান সমূহ

যে সমস্ত খাদ্য উপকরণের মধ্যে যে পুষ্টি উপাদান অধিক পরিমানে থাকে তাকে সে জাতীয় খাদ্য বলে। যেমন. (ক) শর্করা জাতীয় খাদ্য (ভুট্টা, গম, কাওন, চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি ইত্যাদি)।

(খ) আমিষ জাতীয় খাদ্য (সয়াবিন মিল, তিলখৈল, শুটকিমাছ, মিটমিল ইত্যাদি।

(গ) চর্বি জাতীয় খাদ্য (এনিমেল ফ্যাট , হাঁস-মুরগরি তৈল, ভেজিটেবল অয়েল সার্কলিভার ওয়েল ইত্যাদি।

(ঘ) ভিটমিন জাতীয় খাদ্য (শাকসজি ও কৃত্রিম ভিটামিন)

(ঙ) খনিজ জাতীয় খাদ্য (ঝিনুক , ক্যালশিয়াম ফসফেট ,রকসল্ট , লবন ইত্যাদি)।

(চ) পানি।

৯.২ শর্করা জাতীয় খদ্যা, আমিষ জাতীয় খাদ্য , চর্বিজাতীয় খাদ্য

দেহের ভিতর খাদ্য পরিপাক কালে শর্করা উপাদান শ্বেতসার ও গুকোজে বিশেষিত হয় এবং দেহের তাপ উৎপাদনের জন্য বিপাকীয় কার্যক্রমের সময় শক্তি সরবরাহ করে।

* অতিরিক্ত শ্বেতসার হাঁস-মুরগির তলপেট, কলিজা ও মাংসপেশীর টিসুর ভিতর চর্বি আকারে জমা হয় এবং প্রয়েআজনে বিপাকীয় কার্যক্রমের জন্য শক্তি সরবরাহ করে।

* শর্করা জাতীয় খাদ্য কার্বন হাউড্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক উপাদান দ্বারা গঠিত জৈব যৌগিক পদার্থ।

* শর্করা জাতয়ি খাদ্য ২ প্রকার

দানাদার ঃসকল প্রকার দানাদার খাদ্যশস্য যেমন, ভুট্টা গম , যব,কাওন, সরগম, চাউল ইত্যাদি।

আঁশ ঃ সকল প্রকার দানাদার খাদ্যের উপজাত যেমন চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি, তোপিওকা, ভুট্টার গুটেন, কাসাভা ইত্যার্িদি।

* হাঁস-মুরগির খাদ্যের বেশীর ভাগ শর্করা পুষ্টি উপাদান যেমন দানাদার শতকরা ৪০ হতে ৬০ ভাগ এবং উপজাত অংশ শতকরা ১০ হতে ৩০ ভাগ ব্যবহার করা হয়।

খ) আমিষ জাতীয় খাদ্য ঃ

* হাস-মুরগির দেহ কোষ আমিষ পুষ্টি উপাদান দ্বারা গঠিত।

* দেহের ক্ষয় প্রাপ্ত কোষ গঠন ও নবায়নের জন্য আমিষ প্রয়োজন হয়।

* দেহের পালক আমিষ উপাদান দ্বারা গঠিত।

* দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি হতে উৎসারিত রসের মধ্যে এই উপাদান থাকে।

*রক্ত আমিষ উপাদান দ্বারা গঠিত।

* ডিম আমিষ উপাদান দ্বারা গঠিত।

* দৈনন্দিন খাদ্যের সাথে গ্রহনকৃত আমিষ হাঁস-মুরগির দেহের ক্ষয়পুরন,পুষ্টি সাধন ও শারীরিক বৃদ্ধি ঘটায।

উপাদান ও এমাইনো এসিডঃ

আমিষ খাদ্য খাওয়ার পর হাঁস-মুরগির পাকস্থলিতে বিশেষিত হয় ও ২২ প্রকার এমাইনো এসিড গঠন করে।

*যে আমিষ খাদ্যে ২২ প্রকার এমাইনো এসিড থাকে না তাকে হাঁস-মুরগির জন্য অসম্পূর্ন আমিষ খাদ্য বলে।

* খাদ্যে এমাইনো এসিডের ঘাটতি অর্থাৎ আমিষের ঘাটতি।

* কিছু কিছু এমাইনো এসিড আছে যা পাকস্থলিতে কম বিশেষিত হয়, এই জাতীয় এমাইনোএসিডকে প্রয়োজীয় এমাইনো এসিড বলে।

পাঁচটি এমাইনো এসিডের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ার জন্য খাদ্যের সাথে কৃত্রিম এমাইনো এসিড সংযোজন করতে হয়। এই সমস্ত এমাইনো এসিডকে সংকটজনক প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিড বলে।

সমস্ত প্রকার সংকট জনক এমাইনো এসিড প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিড কিন্তু সব প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিড সংকট জনক নয়।

প্রানীজ ও উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য।
* যে সমস্ত আমিষের উৎস প্রানী তাকে প্রানীজ আমিষ বলে
* যে সমস্ত আমিষের উৎস উদ্ভিদ তাকে উদ্ভিদ জাতীয় আমিষ বলে।
* সাধারণত প্রাণীজ আমিষ ও উদ্ভিদ জাতীয় আমিষ একত্রে এমাইনো এসিডের সম্পূর্নতা পূরন করে।
* প্রানীজ আমিষ যেমন শুটকি মাছ , শুটকি মাংস মিট ও বোনমিল, ফিদার মিল, ব্লাডমিল, লিভার মিল, প্রোটিন কনসেনট্রেড ইত্যাদি।
* প্রাণীজ আমিষের অভাবে হাঁস-মুরগির খাদ্যে উদ্ভিদ জাতীয় আমিষের সাথে বিভিন্ন প্রকার এমাইনো এসিড মিশ্রিত করে সম্পূর্ন আমিষ তৈরী করা যায় । উদ্ভিদ জাতীয় আমিষ যেমন সায়াবিন মিল, তিলখৈল , তৈল বীজের খৈল, তুলা বীজের খৈল, সবুজ শাকসজি , ডাকউইড, এ্যাজোলা ইত্যাদি।

খাদ্যে আমিষের হার নির্ধারণ পদ্ধতিঃ

ব্রুডিং থেকে শুরু করে ডিম পাড়ার পুর্ব পর্যন্ত কম বেশী দৈনিক গড় আমিষ গ্রহনের পরিমান স্থিতিশীল রাখার জন্য যখন কম খাদ্য খায় তখন খাদ্যে আমিষের হার বেশী থাকে এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য খাওয়ার পরিমান বৃদ্ধির কারণে খাদ্যে আমিষ ব্যবহারের হার কমানো হয়।
* ডিম পাড়তে শুরু করার পূর্বে বয়স ও জাত অনুসারে পুলেটের নির্ধারিত ওজন থাকা প্রয়োজন । বাড়তি বয়সে প্রতিসপ্তাহে এক ভাগ আমিষ কমানো হলে বৎসরে শতকরা একটি ডিম বেশী হয়। এক দিন করে যৌন পরিপক্কতার উন্নতি হয়।
* প্রতি সপ্তাহে শতকরা ১ ভাগ হারে আমিষ ব্যবহারের পরিমাণ কমাতে হয় , যতক্ষন না সার্বনিম্ন পরিমান শতকরা ১৫ ভাগ হয়।

৯.৩ ভিটমিন ও খনিজ লবন এবং পানি।

ভিটামিনের উৎস ঃ

- বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ।
- সবুজ শাকসজি ও রঙিন ফলমূল।
- পাকস্থলিতে ক্ষুদ্র জীবাণুর কার্যক্রমে কিছু ভিটামিন উৎপন্ন হয়।
- খাদ্যের কিছু প্রো ভিটামিন হাঁস-মুরগির দেহে খাঁটি ভিটামিনে রূপান্তর হয়।
- ভিটামিন সুনিদির্ষ্ট রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ বিধায় কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা যায়।

ভিটামিনের শ্রেনী বিভাগ ঃ

- দ্রাব্যতার ভিত্তিতে ভিটামিন - ২ শ্রেনীতে ভাগ করা হয়।

ক) পানিতে দ্রবনীয় ভিটামিন যেমন ঃ- বি গোষ্ঠি ও সি
খ) চর্বিতে দ্রবনীয় ভিটামিন যেমন ঃ- এ,ডি, ই,ও কে (মুরগির ভিটামিন ডি-৩ প্রয়োজন হয়)।

খনিজ জাতীয় খাদ্য

ঘাঁস-মুরগির জন্য খনিজ পর্দার্থের ভুমিকা অপরিসীম । বিভিন্ন খনিজ পদার্থ বিভিন্ন মাত্রায় খাদ্যের সাথে ব্যবহার করা হয়। অনেক প্রকার খনিজ পদার্থ খাদ্যের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে উপস্থিত থাকে যা স্বতন্ত্র ভাবে খাদ্যের সাথে ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।
প্রয়োজনের ভিত্তিতে খনিজ পর্দার্থকে ২ দলে ভাগ করা হয় ।
(১) অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ। যেমন ঃ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সালফার, পটাসিয়াম,সোডিয়াম, ক্লোরাইড,ও ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি।
(২) স্বল্প পরিমাণে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ। যেমন ঃ আয়রন, কপার, আয়োডিন,কোবাল্ট, জিংক, ম্যাংগানিজ ও সেলেনিয়াম ইত্যাদি।

পানিঃ

* যে উপাদান দেহের কোষ গঠন করে তাকে খাদ্য বলে । দেহের কোষ গঠনে পানি‌ে ভূমিকা বেশী । দেহকোষে শতকরা ৬০- ৭০ ভাগ পানি থাকে।

* কোন প্রাণী জৈব বস্তু অথবা অজৈব খনিজ জাতীয় খাদ্য না খেয়ে কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু পানি ছাড়া সামান্য কিছুদিনের বেশী বাঁচে না।

* দেহ থেকে পানির ক্ষয় হয় মলমূত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ।

* অপরদিকে পানি আহরিত হয় পানি পান, রসালো খাদ্য গ্রহণ এবং দেহের ভিতর বিভিন্ন পুষ্টি উপদানের অক্সিডিশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

হাঁস-মুরগির দেহে পানির কাজ

- খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে খাদ্য বস্তু নরম ও পরিপাকে সহায্য করে।
- খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে পুষ্টি উপাদান তরল করে দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিবহণ করে।
- দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
- দেহ সতেজ রাখে।
- দেহের ভিত্তিতে দুষিত পদার্থ অপসারন করে।
- দেহের গ্রন্থি হতে নিঃসৃত রস, হরমোন,এনজাইম এবং রক্ত গঠনে ভূমিকা রাখে।
- দেহের বেশির ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত।
- ডিমের বেশির ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত।

দেহের ভিতর বিপাকীয় কার্যক্রমে পানির প্রয়োজনীতা

- খাদ্যবস্তু দেহের ভিতর দাহ্য হয়ে তাপ উৎপাদন করে । এই তাপ দেহের চালিকা শক্তি । দেহের ভিতরে খাদ্যবস্তু দাহ্য হওয়ার প্রক্রিয়াকে বিপাকীয় কাযক্রম বা মেটাবলিক একটিভিটি বলে।
- কোন খাদ্যবস্তুকে যন্ত্রের মধ্যে পোড়ানো হলে তাপ উৎপাদনের জন্য যে শক্তি ব্যবহৃত হয় তাকে ঐ খাদ্যবস্তুর মোট শক্তি বা গ্রস অ্যানার্জি বলে।
- সব খাদ্যবস্তু পোড়ানো হলে সমপরিমান তাপ উৎপাদন হয় না এবং সকল খাদ্য বস্তুতে সমপরিমান শক্তি থাকে না।
- খাদ্যের সব শক্তি দেহের ভিতর বিপাকীয় কাজে ব্যবহৃত হয় না । ব্যবহৃত শক্তির অতিরিক্ত হাঁস-মুরগির পায়খানা প্রসাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।
- পায়খানা প্রসাবে প্রাপ্ত শক্তি খাদ্যের মোট শক্তি হতে বাদ দিলে দেহের ভিতর বিপকীয় কার্যক্রমে ব্যবহৃত শক্তির পরিমান জানা যায়।
- খাদ্যের বিপাকীয় শক্তি হাঁস-মুরগির জীবন ধারন নির্বাহী কার্য পরিচালনা ও ডিম উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

৯.৪ বিভিন্ন বয়স ও জাত অনুসারে আমিষ ও ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স।

পুষ্টি উপাদানের নাম	ইউনিট	বাচ্চা	পুলেট			লেয়ার			ব্রয়লার	
	শতকরা হার	০-৬ সপ্তাহ	৭-১২ সপ্তাহ	১৩-১৬ সপ্তাহ	১৭-২০ সপ্তাহ	২১- ৪০ সপ্তাহ	৪১-৬০ সপ্তাহ	৬১সপ্তাহের উর্দ্ধে	০-২১ দিন	২২দিনের উর্দ্ধে
১। আমিষ	১০০ কেজি	১৯-২০	১৭-১৮	১৬-১৭	১৫-১৬	১৮-১৯	১৬-১৭	১৫-১৬	২৩-২৪	১৮-১৯
২। ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	১০০ কেজি	৩.০০	৩.০০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	৩.৫০	৩.০

৯.৫ বিভিন্ন বয়সের মুরগির খাদ্য প্রস্তুত পদ্ধতি

সুষম খাদ্য ঃ

মুরগির জাত, বয়স ও উপযোগিতানুসারে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের সমন্বয়ে তৈরী খাদ্যকে সুষম খাদ্য বলে।

সম্পূর্ন খাদ্য

- সুষম খাদ্যকে সম্পূর্ণ করার জন্য খাদ্যের সাথে বিভিন্ন প্রকার ঔষধ, এনজাইম, এমাইনো এসিড খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে খাদ্যের গুণগত মান সংরক্ষন ক্ষমতা বৃদ্ধি ,সুস্বাদু ও খাদ্য রূপান্তর হার বৃদ্দির ব্যবস্থা করা হয়।

(ক) লেয়ার মুরগীর খাদ্য

* বাচ্চার রেশন ঃ ১ দিন হতে ৬ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার খাদ্য
* গ্রোয়ার রেশন ঃ ৭ সপ্তাহ হতে ২০ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার খাদ্য
* লেয়ার রেশন ঃ ২১ সপ্তাহের উর্দ্ধে ।

উপকরনের নাম (শতকরা হিসাবে)	বাচ্চার রেশন	গ্রোয়ার রেশন	লেয়ার রেশন
ভুট্টা ভাংগা	৫২.৭৫	৫৪.৭৫	৪৭.৭৫
চাউলের কুঁড়া	১৬.০০	২০.০০	১৬.০০
তিলের খৈল	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০
সয়ামিন মিল	১৬.০০	১০.০০	১৩.০০
প্রোটিন /শুটকীমাছের গুড়া	৭.০০	৫.০০	৭.০০
লবন	০.৫০	০.৫০	০.৫০
ঝিনুক চূর্ন		০.২০	০.৮০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.২৫	০.২৫	০.২৫
সুষম খাদ্য (মোট)	১০০ কেজি	১০০ কেজি	১০০ কেজি

ব্রয়লার মুরগির খাদ্য (ষ্টার্টার)

ক্রমিক নং	উপকরন	পরিমান(কেজি)	শক্তি(ক্যালোরি) কেজি	আমিষ %
১	ভুট্টা	৫১.৯০	১,৭৩৩.৪৬	৪.৭৭
২	চাউলেরকুঁড়া	১১.০০	৩২৩.০০	১.৪০
৩	সয়াবিন মিল	২৬.০০	৭১৫.০০	১১.৪৪
৪	প্রোটিন কনসেনট্রেট	৮.০০	২২১.০০	৪.৮০
৫	সয়াবিন তৈল	২.০০	১৭৯.০০	-
৬	ডি.সি.পি.	০.৫০	-	-
৭	লবণ	০.২০	-	-
৮	মিথিওনিন	০.১৫	-	-
৯	ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫	-	-
	মোট	১০০.০০	৩,১৭১.৪৬	২২.৪১

ব্রয়লার মুরগির খাদ্য (ফিনিসার)

ক্রমিক নং	উপকরন	পরিমান(কেজি)	শক্তি(ক্যালোরি) কেজি	আমিষ %
১	ভুট্টা		১,৮০১.২৬	৪.৯৬
২	চাউলেরকুঁড়া	১৫.০০	৪৪০.৫৫	১.৯০
৩	সয়াবিন মিল	২০.০০	৫৫০.০০	৮.৮০
৪	প্রোটিন কনসেনট্রেট	৮.০০	২২১.০০	৪.৮০
৫	সয়াবিন তৈল	২.০০	১৭৯.০০	-
৬	ডি.সি.পি.	০.৫০	-	-
৭	লবণ	০.২০	-	-
৮	মিথিওনিন	০.১২	-	-
৯	ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫	-	-
	মোট	১০০.০০	৩,১৯১.৮১	২০.৪৬

৯.৬ মুরগির খাদ্য বিপনন একটি লাভজনক পেশা ঃ

মুরগি পালনের ৭০ ভাগ খরচই খাদ্য খায়াতে ব্যয় হয়। কম খরচে ভাল খাদ্য প্রস্তুত একটি গুরুত্বপূর্ন কাজ । যে কেহ এই খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। কিন্তু গুনগতমান সম্পন্ন খাদ্য তৈরী সবাই করতে পারবে না। কারণ এ জন্য সৎ , কর্মঠ ও উত্তম মনের অধিকারী মানুষ হতে হবে। মনে প্রাণে খাদ্য ব্যবসায় উৎসাহী মানুষ হতে হবে। খাদ্যের গুনগত মান সঠিক থাকলে খাদ্যের চাহিদা কখনও কমবে না। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক প্রকল্প এলাকায় সমিতি গঠন করে মুরগি পালন করা হচ্ছে । মুরগি পালন কারীদের মদ্যে থেকেই একজনকে খাদ্য উপকরন ক্রয় , প্রস্তুত ও সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দেখা গেছে বাজারের বিভিন্ন কোমপানীয় খাদ্য খাওয়ানোর চেয়ে সমিতির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত খাদ্য খাওয়ালে অনেক ভাল উৎপাদন পাওয়া যায়। এভাবে কোন এলাকায় সমিতি গঠন ছাড়াা ও যদি কেহ নিষ্ঠার সহিত কাজটি করে তবে খাদ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে জীবিকার্জন করাসহ বিত্তবান হওয়া সম্ভব।

মডিউল -১০

তুষ পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন

১০.১ ভূমিকা , বাচ্চা ফুটানোর ডিমের উৎস্য, ডিম বাছাই, ডিম নির্বাচন ঃ

প্রথম চীন দেশে এই পদ্ধতির প্রচলন হয়। বর্তমানে ভারত,ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া,মালয়েশিয়া সহ অনেক দেশে এই পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগির ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করা হচ্ছে। দুঃস্থ ও বেকার মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য এই পদ্ধতির প্রচলন করা যায়, একজন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা যায়। এভাবে একজন মহিলা মাসে ১৫ হাজার থেকে২০ হাজার টাক পর্যন্ত লাভ করতে পারে।ফুটানো ডিম নিজে উৎপাদন করে কিংবা কন্ট্রাক্ট উৎপাদনকারীর কাছ থেকে ডিম সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সংগ্রহকৃত ডিম গুলি বাছাইকরে ভাল গুনগতমানের ডিমগুলো ফুটানোর জন্য নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচনের জন্য মাঝারি আকারের, মাঝারি খোসাযুক্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন , ভাংগা বা ফাটা নয় অল্প বয়সের ডিম নির্বাচন করতে হবে।
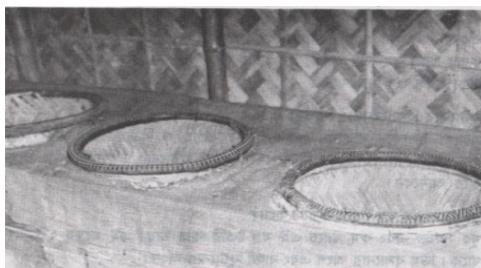
১০.২ ডিম ফুটানো প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী (হ্যাচিং ডোল তৈরীকরন, হ্যাচিং বেড তৈরীকরন পুটলি বাঁধন ,ডোলে ডিম বসানো ইত্যাদি)ঃ

খুব সহজে এবং কম খরচে এই যন্ত্র তৈরি করা যায় । এই যন্ত্রের ২ টি অংশ থাকে । ডিম বসানোর অংশ এবং বাচ্চা ফুটানোর অংশ। ডিম বসানোর অংশ এই অংশকে ইংরাজিতে সেটার বলে। কাঠের বাতার সাথে হার্ডবোর্ড অথবা বাঁশের চাটাই দ্বারা ২ ফুট ী ২ ফুট এবং ৩ ফুট খাড়া চার কোনা বাক্স তৈরি করতে হবে। বাক্সের উপর দিক খোলা থাকবে বাঁশের চাটাই দিয়ে ১৪ ইঞ্চি চওড়া (ব্যাস) ও ৩০ ইঞ্চি খাড়া গোল ডোল তৈরি করতে হবে্। ডোলের উপড় ও নিচে খোলা থাকবে। বাক্সের ভেতর তলাতে ৬ ইঞ্চি পরিমান তুষ বিছতে হবে। বাক্সের ভিতরে তুষের উপর ডোল বসাতে হবে। ডোল ও বাক্সের মাঝে খালি জায়গা তুষ দিয়ে ভরতে হবে। ডোলের চারদিকে ও তলাতে ৬ ইঞ্চি তুষ থাকবে।বাক্সের মধ্যে দুই বা তার চেয়ে বেশি ডোল বসানোর জন্য বাক্সের আকার বড় করতে হবে।

-২ ফুট প্রশস্ত , ৪ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট খাড়া বাক্স ২ টি ডোলা বসানো যাবে ।

-৪ ফুট প্রশস্ত , ৪ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট খাড়া বাক্সে ৪টি ডোল বসানো যাবে।

-৪ ফুট প্রশস্ত ,৬ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট খাড়া বাক্স ৬ টি ডোল বসানো যাবে। প্রতিটি ডোলের মধ্যে ৪০০-৫০০টি ডিম বসানো যাবে। ডোলে আকার বড় করলে সেই অনুপাতে বাক্সের আকার বড় করতে হবে।

চিত্র ২৪ বাক্সের ভিতর ঢোল প্রস্তুত করণ

বাচ্চা ফুটানোর অংশ এই অংশকে বাচচা ফুটানোর বিছানা এবং ইংরেজিতে হ্যাচার বেড বলে। ১৮ দিন ডোল থেকে ডিম বের করে বিছানার উপর বসাতে হয়। এখানে ডিম থেকে বাচআ ফুটে বে হয়। একহাজার ডিম বসানোর জন্য ৪২ ইঞ্চি লম্বা ও ২৪ ইঞ্চি চওড়া বিছানা প্রয়োজন হয়। হার্ড বোর্ডের চারদিকে কাঠের বাতা দিয়ে এই বিছানা তৈরি করা যায়।

- বাচ্চা পড়ে যাওয়া ঠেকানোর জন্যে বিছানার বারদিকে কাঠের তক্তা দিয়ে ৬ ইঞ্চি বেড়া তৈরি করতে হয়।
- বিছানার উপরে ২/৩ ইঞ্চি পুরু করে তুষ বিছাতে হয় ।
- কাঠের বা বাঁশের খুটির সাহায্যে এই বিছানা বহুতলা করা যায়।
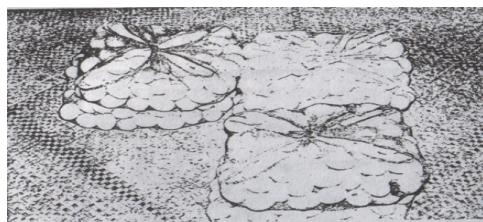
চিত্র ২৫ বাচ্ছা ফুটানোর বিছানা

ডিম ফুটানো ঘর ঃ

-কম খরচে বাঁশের চাটাই দিয়ে বেড়া ও টিনের চালা দিয়ে ঘর তৈরি করতে হয়। আলো বাতাস চলাচলের জন্য ঘরে ছোট জানালা থাকবে।

- ঘরের চাল খড়, টিন অথবা বাঁশের তরজা ও পলিথিন দিয়ে করা যায়।

– ঘরের মেঝেতে তুষ বিছিয়ে দিলে ঘর গরম থাকবে ও মেঝের উপরে অতিরিক্ত ভেজা ভাব দূর হবে।

- ৮ ফুট চরড়া ও ১২ ফুট লম্বা ঘরে ৪ ফুটী ৬ ফুট বাক্স ও ৪ ২ ইঞ্চি লম্বী ২৪ ইঞ্চি চওড়া বিছানা রাখা যাবে।

ডিম বসানো নিয়ম ও গরম করার পদ্ধতিঃ

-লাইলনের তৈরি রংগিন মশারীর কাপড় দিয়ে ১০০-১২৫ টি ডিমের এক একটি পোটলা তৈরি করতে হবে । মুরগির ডিম বেশি ভংগুর এজন্যে ৪০-৫০ টি ডিম দিয়ে ছোট পোটলা করা ভাল।

- পোটলার মধ্যে ডিম গুলো ঢিলা করে বাঁধতে হবে।

-ডিমের পোটলাগুলোর রোদে ৩/4 ঘন্টা গরম করতে হবে।

ডিমের পুটলি বাঁধার নিয়ম

–ডোলের আকারে গোল ২/৩ ইঞ্চি মোটা তুষ দিয়ে চটের পোঠলা তৈরি করতে হবে।

–প্রতিডোলে ৪০০-৫০০ ডিম বসানো যায় ।

-পোটলাগুলো রোদে ১০৭৮ ডিগ্রী -১৮০ ডিগ্রী ফা: গরম করতে হবে।

- শীতের দিনে সকালে ওও বিকালে ২ বার এবং গরমের দিনে ১ বার তুষের পোটলা গরম করতে হয়।

- রোদ না থাকলে চলির উপরে লোহার কড়াই বসিয়ে তার মধ্যে তুষের পোটলা গরম করতে হয়।

-হিটার বা কেরসিনের চুলার উপরে বাঁশের ডোল দিয়েও উপরিভাগে বাঁশের চালনির উপর ডিম ও পোটলা গরম করা যায়।

- একই ডোলে বিভিন্ন সপ্তাহে বসানো ডিমের পোটলা থাকলে ডিমের ভেতরের তাপে পরে বসানো ডিম গরম হয়।)

ডোলে ডিম বসানো পদ্ধতিঃ

ডোলে ডিম বসানো পদ্ধতি

–ডোলের ভেতর প্রথমে গরম তুষের পোটলা তার উপড় ডিমের পোটলা তারপর পুনরায় তুতষের পোটলা এমনিভাবে ডিমের পোটলা ও তুষের পোটলা বসাতে হবে।

-প্রতিদিন পোটলা বেরকওে ২ বা ৩ বার ডিমের পার্শ্ব পরিবর্তন করতে হবে।

-ডিমের তাপ পরীক্ষার জন্য চোখের উপরে ধরলে তাপ অনুভব করা যাবে।

৭ দিন ১৪ দিন এবং ১৮ দিনে ডিমের মধ্যে ভ্রুণের অবস্থা আলোর সাহায্যে পরীক্ষা করতে হবে। অনূর্বর ডিম ও মৃত ভ্রূণযুক্ত ডিম বাছাই করে ফেলতে হবে।

বাচ্চা ফুটানোর বিছানায় ডিম বসানোর সময় ঃ

– ১৮ দিনে ডোলের মধ্য থেকে ডিম বের করে ডিম ফুটানোর বিছানায় ডিম বসাতে হবে।

– ঘরের তাপমাত্রা থাকবে ৮৫ডিগ্রী ফাঃ এবং হ্যাচারে বা বিছানায় ৯০-৯৫ ডিগ্রী ফাঃ । ঘরে ১০০ ওয়ার্টের ৩-৪ টা বাতি জ্বালানো হলে এই তাপ তৈরি হবে।

– তাপ ৯৫ ডিগ্রী ফাঃ এর বেশি হলে জানালা দরজা খুলে পাখার বাতাস দিতে হবে।

-আর্দ্রতা কমে গেলে সামান্য গরম পানি ডিমের উপর স্প্রে করতে হবে।

-২১ দিনে মুরগির ডিম এবং ২৮ দিনে হাঁসের ডিম ফুটে বিছানার মধ্যে বাচ্চা বের হবে।

-বাচ্চা ফুটার ৩ দিন পূর্বে বিছানার উপরে রাখা ডিম আর ঘুরানো যাবে না।

১০.৩ প্রথমদিন থেকে হ্যাচিংয়ের শেষ দিন পর্যন্ত দৈনন্দিন কার্যাদি ঃ

দৈনন্দিন কার্যক্রম মধ্যে ডিম গুলি প্রতিদিন ৪-৫ ঘন্টা পর পর নাড়াচাড়া করা।ডিমের তাপমাত্রা যেন ১০০ডিগ্রী ফাঃ বজায় থাকে। সে লক্ষ্যে চুলায় গরম করা তুষ, বা ছাই দ্বারা ডিম গুলিকে গরম করতে হবে। উপরের পুটলি নীচে এবং নিচের পুটলি উপরে পালটে দিতে। আর্দ্রতা কম থাকলে অর্থাৎ ৭০% এর নিচে হলে দিনে যতবার ডিম ওলটপালট করা হবে ততবার কুসুম গরম পানিতে নরম কাপড় ভিজিয়ে ডিম মুছে দিতে হবে। এভাবে হ্যাচিং বিছানায় নেওয়া পর্যন্ত করতে হবে। হ্যাচিং বিছানায় নেওয়ার পর ডিম নাড়া চাড়া সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ। হ্যাচিং বিছানায় তাপমাত্রা ৯৯ ডিগ্রী ফাঃ এবং আর্দ্রতা
৯০ % রাখতে হবে। আর্দ্রতা ঠিক রাখার জন্য ডিমের উপর কুসুম গরম পানি প্রয়োজন বোধে স্প্রে করে দিতে হবে।

মডিউল -১১
হাঁসের বাচ্চা পালন

১১.১ ব্রডিং ও ব্রডিং কর্মসূচী ঃ

অল্প বয়সে পালক না হওয়ায় বা ছোট থাকায় শরীর অবৃত্ত হয়না এ জন্য শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রনের জন্য কৃত্রিম তাপের প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় কৃত্রিম ভাবে তাপ দেওয়াকে ব্রুডিং বলা হয় । ব্রুডিং দুই ভাবে করা যায় । যথাঃ ক) প্রাকৃতিক ব্রুডিং ও খ) কৃত্রিম ব্রুডিং

ক) প্রাকৃতিক ব্রুডিং ঃ মুরগির সাহায্যে প্রাকৃতিক ব্রুডিং করা হয়।

খ) কৃত্রিম ব্রুডিং ঃ বৈদ্যুতিক, গ্যাস, কেরসিন ও অন্যান্য তাপের উৎসের মাধ্যমে ব্রুডিং করাকে কৃত্রিম ব্রুডিং বলে।

বাচ্চা ব্রুডিং ঘর ঃ

খামারের বাচ্চা পালন করার জন্য তিন প্রকার ঘরের ব্যবহার করা হয় ।যেমনঃ
ক) ব্রুডার হাউজ খ) ব্রুডার-কাম -গ্রোয়ার হাউজ গ) ব্রুডার -কাম- লেয়ার হাউজ।

ব্রুডারে হাউজ ঃ

* স্বতন্ত্র ব্রুডার ঘরের আকার ছোট হওয়াতে তাপ উৎপাদন খরচ কম।
* এই ঘরে বাচ্চা ব্রুডিং শেষে বাচ্চাগুলোকে বিক্রি বা গ্রোয়ার হাউজে স্থানান্তর করা হয়।
* এই সময়ে বাচ্চা স্থানান্তর করলে বাচ্চার ধকল হয় ও রোগ বিস্তারের সম্ভবনা বারে।

ব্রুডরা ঘর কাম- গ্রোয়ার হাউজিঃ

- বর্তমানে এই ঘরের প্রচলন বেশী । ঘরের মধ্যে কিছু পরিমান স্থান পৃথক ভাবে ব্রুডিংয়ের ব্যবস্থা করা যায় এমন ভাবে তৈরীকরা হয়। পরে গ্রোয়িং অবস্থায়ও সেখানেই রাখা হয়।
- বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে স্থানের প্রয়োজন বেশি হতে থাকলে পর্দা সরিয়ে বাচ্চা থাকার স্থান প্রসস্ত করা হয়।
- লেয়ার ঘরে স্থানান্তরের পুর্ব পর্যন্ত এ ঘরে বাড়ন্ত বাচ্চা পালন করা হয়।

ব্রুডার -কাম- লেয়ার হাউজ ঃ

- এই ঘরে বাচ্চা পালন ও বাড়ন্ত বাচ্চা পালন শেষে ডিম পাড়া পর্যন্ত হাঁস পালন করা হয়।

প্রতি ব্যাচ বাচ্চা পালন করার জন্য বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারনঃ

- খামারের প্রয়োজন ও ঘরের ধারন ক্ষমতানুসারে প্রতি ব্যাচে বাচ্চা পালন করার জন্য বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারন করতে হয়।
-
- ৪ফুট ব্যাসের হোভারের নীচে বাচচা ৪০০ টি ব্রুডিং করা হয়। এই হিসেবে ঘরে ব্রুডারের সংখ্যা নির্ধারন করা হয়।
- ঘরের আয়তন ও বাচ্চার সংখ্যানুসারে ঘরে ব্রুডার স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়।
- সকল সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত শতকরা ৫টি বাচ্চা বেশী পালন করা হয়।

১১.২ ব্রুডিং পুর্ব প্রস্তুতি, বাচ্চা ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

ব্রুডার ঘর প্রস্তুত

- ব্রুডার ঘর /ব্রুডার -কাম গ্রোয়ার ঘর খালি হওয়ার সাথে সাথে ঘরের সমস্ত সরঞ্জাম , লিটার /ব্রুডিং খাঁচা ইত্যাদি বের করতে হয়।
- ঘরের কোন সংস্কার প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা নিতে হয়।
- ঘরের মেঝেতে লেগে থাকা ময়লা পানি দিয়ে ভিজিয়ে তুলে ফেলতে হয়।
- পরিস্কার পানি দ্বারা সমস্ত ঘর ধুয়ে ফেলতে হয়।
- ভেন্টিলেশন ,ফ্যান,লাইট ,দরজা জানালা ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করতে হয়।

ঘর জীবানু মুক্ত করনঃ

- জীবানুণাশক ব্যবহৃত পানিতে ব্রাশ ভিজিয়ে ভেন্টিলেশন ,ফ্যান,লাইট ,দরজা জানালা ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করতে হয়।
- ঘরের মেঝেতে আইয়োসান / ফিনাইল/স্যাভলন/ডেটল ইত্যাদি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়।
- অথবা অল্প খরচের জন্য ভিজা ঘরে মেঝের উপর প্রতি ১০০বর্গ ফুট স্থানে এক কেজি কাপড় কাচা সোডা ভালভাবে ছড়িয়ে ১৫ মিনিট পরে ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হয়।
- ঘর পরিস্কার করার সময় ও জীবানুনাশক ব্যবহারের সময় পায়ে গাম্বুট,দেহে এফরোন ও মুখে মুখোশ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় ।

ঘরে লিটার / খাঁচা ও সরঞ্জামাদি স্থাপন

- ঘর জীবানুমুক্ত হওয়ার পর ভালভাবে শুকাতে হবে (১০-১৫ দিন) ।
- শুকনা মেঝের উপর ২” পুরোকরে লিটার সামগ্রী বিছানোর পর ব্রুডার গার্ড, হোভার, হিটার ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে স্থাপন করতে হয়।
- ব্রুডার গার্ডের একফুট ভিতরে ড্রিংকার ও খাদ্যের পাত্র স্থাপনের জন্য স্থান রাখতে হয়।
- খাঁচায় ব্রুডিং করলে লিটারের পরিবর্তে ব্রুডার খাঁচা স্থাপন করা হয়।
- ব্রুডার -কাম-গ্রোয়ার হাউজের উন্মুক্ত স্থান পর্দা দ্বারা ঢেকে দিতে হয়। গরমকালে চটের পর্দা এবং শীত ও বর্ষার সময় প্লাষ্টিক পর্দা ব্যবহার করা হয়।
- ব্রুডারক -কাম গ্রোয়ার হাউজে বাচ্চা ব্রুডিংয়ের জন্য নিদিষ্ট স্থান পাষ্টিক পর্দা দ্বারা ঘিরে পৃথক করতে হয় এবং ঘেরা স্থানে ব্রুডার স্থাপন করতে হয়।

ব্রুডার ও ঘরের তাপ মাত্রাঃ

ঘরের তাপ মাত্রা ঃ

ঘরে বাচ্চা প্রদানের সময় ঘরের তাপ মাত্রা ৭৫ ডিগ্রী ফাঃ থাকে এবং ব্রুডিং শেষে ৬৫-৭৫ ডিগ্রী ফাঃ তাপমাত্রা রাখা হয়।

ব্রুডারের তাপ মাত্রা ঃ

বাচ্চার বয়স	বাচ্চা			
সপ্তাহ	শীতকাল		গ্রীষ্মকাল	
	ফাঃ	সেঃ	ফাঃ	সেঃ
১-২	৯৫.০	৩৫.০	৯১.০	৩২.৭
২-৩	৯০.০	৩২.২	৮৬.০	৩০.০
৩-৪	৮৫.০	২৯.৪	৮১.০	২৭.২
৪-৫	৮০.০	২৬.৬	৭৫.০	২৩.৮

বাচ্চা ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

ব্রুডার চালূ ও পাত্রের পানি প্রদান

- বাচ্চা গ্রহণের দিন ব্রুডারে পানির পাত্রে পানি দেওয়ার পর এবং বাচ্চা গ্রহণের ৩ ষন্টা পূর্বে ব্রডার চালু (তাপ উৎপাদন) করতে হয়। বেশী আগে চালু করলে লিটার বেশী শুকিয়ে যায় এবং পরে চালূ করলে পানির তাপমাত্রা যথেষ্ট পরিমান হয় না্ পানির তাপমাত্রা ৬৫ ফাঃ (১৮সেঃ) হওয়া বাঞ্ছনীয় । (পানি প্রদান পদ্ধতি দ্রষ্টব্য)
- এই সময় প্রশস্ত খাদ্য পাত্র হিসাবে কাগজ /চিক বাক্সের ঢাকনি/পাষ্টিক ট্রে হোভারে নীচে স্থাপন করা হয়।

ব্রুডারে বাচ্চা প্রদান ঃ

- খামারে বাচ্চা পৌছানোর সাথে সাথে পূর্ব থেকে প্রস্তুত পরিচার্যকারী বাচ্চার সরবরাহ গ্রহণ করবে এবং দ্রুত ব্রুডারে প্রদান করবে।
- সাধারনত সকালের দিকে ব্রুডারে বাচ্চা প্রদান করলে পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় এবং সকালে আবহাওয়া ঠান্ডা থাকার দরুন কম ধকল সৃষ্টি হয়।
- বাচ্চা গ্রহণের সময় চিক বাক্সের ভিতর মৃত বাচ্চা থাকলে তার সংখ্যা হিসাব করতে হয়্
- সম্ভব হলে বাচ্চার প্রাথমিক নমুনা ওজন রাখা যায়।
- বাচ্চা সরবরাহ তালিকার সাথে কোন অমিল থাকলে হিসাবে আনতে হয় এবং বাচ্চা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে হয়।

বাচ্চার আচরণ পরীক্ষাঃ

- ব্রুডারে বাচ্চা প্রদানের পর বাচ্চার আচরণ পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ্
- বাচ্চার জন্য অনুকূল তাপমাত্রা বাচ্চার আচরণ দেখে অনুমান করতে হয়, যেমন-

- ব্রুডারে তাপ বেশি হলে বাচ্চা তাপের উৎস হতে দূরে যায় এবং ব্রুডার গার্ডের গা ঘেষে জমা হয় ।

-ব্রুডারে তাপ কম হলে তাপের উৎসের নীচে বেশী তাপের আশায় বাচ্চা ভীড় করে এবং পরস্পর জড়াজড়ি করে গরম হতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় চাপাচপিতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বাচ্চা মারা যায়।

-তাপ বাচ্চার অনুকূলে থাকলে বাচ্চা স্বতঃ স্ফুর্ত থাকে এবং সুষ্ঠুভাবে খাদ্য খায় ও পানি পান করে।

-বাচ্চা স্বতঃস্ফুর্তভাবে চলাচল ও পানি পান না করলে বুঝতে হয় পরিবহন জনিত ধকলে পীড়িত অথবা অসুস্থ।

* হোভার অথবা তাপের উৎস উঁচু-নীচু কওে তাপ কম -বেশী করা হয়।

* ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার পর রুটিন মত পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট নয়। বার বার ব্রুডার ঘরে প্রবেশ করে আচরণ পরীক্ষার পর ব্যবস্থা নিতে হয়। ২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চার অত্যন্ত সংকটময় সময় ।

* হঠাৎ করে আলো নিভে যাওয়া ,ঘরের তাপমাত্রা পরিবর্তন, ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা, খাদ্য ও পানির পরিবর্তন, বিভিন্ন প্রকার শব্দ ও হট্টগোল বাচ্চার ধকল সৃষ্টি করে। বাচ্চার আচরণ দেখে এ সমস্ত ধকল প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
* ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার পর তারা পানি পান করে।
ব্রুডারে বাচ্চার পানি পান করার প্রবণতা পরীক্ষা করা হয়। প্রত্যেক বাচ্চা যাতে সহজে পানি পান করতে পারে সে ব্যবস্থা নিতে হয়। প্রয়োজন হলে হাতে ধরে পানি পান করাতে হয়।

খাদ্য প্রদান

- ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার ২-৩ ঘন্টা পর প্রত্যেক বাচ্চার সঠিক পানি পান নিশ্চিত হয়ে প্রাথমিক পাত্রে ষ্টার্টার রেশন প্রদানের পূর্বে গম , ভুট্টা চূর্ন অথবা চাউলের খুঁদ দেওয়া যায়।

পানিতে বাচ্চা ছাড়বার সময়ঃ

সাধারণতঃ চার সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছাড়া উচিৎ নয়। ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ঘরে প্রতিপালন করে তারপর পানিতে ছাড়বার অভ্যাস করতে হবে। পানিতে ছাড়বার সময় হলে ১ ম দিনই সারা দিন পানিতে রাখা ঠিক নয় , ধীরে ধীরে পানিতে চরার অভ্যাস করতে হবে। গরমকালে দুসপ্তাহ পরেই পানিতে ছাড়া যেতে পারে।

১১.৩

১০০ থেকে ৫০০টি বাচ্চা পালনের আয়ব্যয়ের হিসাব ঃ

১০০ টি বাচ্চার ক্রয় মূল্য	=১০০০.০০ টাকা
১০০ টি বাচ্চার ৮ সপ্তাহ পয়ন্ত খাদ্য খরচ (২৫২ কেজি x ২০.০০)	= ৫০৪০.০০
প্রতি পালন ও অন্যান্য খরচ (খাদ্য খরচের ১/৪ অংশ)	= ১২৬০.০০
সর্বমোট	= ৭৩০০.০০
১০% মৃত্যু হার ধরে ৯০টি	
৮ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার বিক্রয় মূল্য গড়ে (১২০.০০ x ৯০)	= ১০,৮০০.০০
লাভ = (১০,৮০০- ৭৩০০)	= ৩৫০০.০০

এভাবে ৫০০টি বাচ্চার লাভ ৫ গুন হবে।

১১.৪ ১০০টি বাড়ন্ত বাচ্চা পালনের আয় ব্যয়ের হিসাঃ

১০০টি বরড়ন্ত বাচ্চার ৮ সপ্তাহের বাচ্চার খরচ	= ৭৫০০.০০
৯ থেকে ১৮ সপ্তাহ পর্যন্ত খাদ্য খরচ	
(৪ কেজি × ১০০ ×১৭.০০)	= ৬৮০০.০০
অন্যান্য খরচ	= ১০০০.০০
মোট খরচ	= ১৫৩০০.০০
বিক্রয় মূল্য (২% মৃত্যু হার ধরে)	= ১৭৬০০.০০
লাভ	= ২৩৪০.০০

১১.৫ ১০০টি ডিম পাড়া মুরগির আয় ব্যয়ের হিসাবঃ

১০০টি মুরগি কেনার খরচ	= ১৮,০০০.০০
১৮ সপ্তাহ থেকে ডিম পাড়া শেষ পর্যন্ত খাদ্য খরচ	
(৪৭ কেজি×১০০×১৮.০০)	= ৮৪,৬০০.০০
অন্যান্য খরচ	= ১০,০০০.০০
মোট খরচ	= ১,১২,৬০০.০০
বিক্রয় মূল্য (২% মৃত্যু হার ধরে)	
ডিম (৩০০ x ৯৮ x ৪.৫০)	= ১,৩২,৩০০.০০
মুরগি বিক্রয়	= ৯,৮০০.০০
মোট বিক্রয়	= ১,৪২,১০০.০০
লাভ (১,৪২,১০০-১,১২,৬০০)	= ২৯,৫০০.০০

মডিউল -১২
লাভজনক ভাবে দেশী মুরগি পালন কৌশল

১২.১ দেশী মুরগি পালন কৌশলের বর্ণনা ঃ

আয় বৃদ্ধি ও পারিবারিক পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধানে দেশী মুরগি প্রতিপালন বিশেষ অবদান রাখতে পারে । আমরা সবাই বলে থাকি দেশী মুরগির উৎপাদন কম । কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ লক্ষ্য এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশী মুরগীর উৎপাদন দ্বিগুনের ও বেশী পাওয়া সম্ভব। দেশী মুরগি থেকে লাভ জনক উৎপাদন পওয়ায় বিভিন্ন কৌশল এখানে বর্ননা করা হয়েছে।

গবেষনায় দেখা গেছে দেশী মুরগির ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করে বাজারে বিক্রিয় করার চেয়ে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তৈরী করে ৮-১২ সপ্তাহ বয়সে বিক্রি করলে লাভ বেশী হয়। এক সংগে ১০-১২ টি মুরগি নিয়ে পালন শূরু করতে হবে। তবে কখনও ১৫-১৬ টির বেশী নেওয়া ঠিক না । তাতে অনেক অসুবিধাই হয় । শুরুতে মুরগি গুলোকে ক্রিমি নাষক ঔষধ খাওয়ানোর পরে রানীক্ষেত রোগের টীকা দিতে হবে। মুরগির গায়ে উকুন থাকলে তাও মেরে নিতে হবে। প্রতিটি মুরগিকে দিনে ৫০-৬০ গ্রাম হারে সুষম খাদ্য দিতে হবে। আজকাল বাজারে লেয়ার মুরগির সুষম খাদ্য পাওয়া যায় । তা ছাড়া আধা আবদ্ধ এ পদ্ধতিতে পালন করলে লাভ বেশী হয়। মুরগির সাথে অবশ্যই একটি বড় আকারের মোরগ থাকতে হবে। তা না হলে ডিম ফুটানো যাবে না । ডিম পাড়া শেষ হলে মুরগি উমে আসবে । তখন ডিম দিয়ে বাচ্চা ফুটানোর ব্যবস্থা নিতে হয়। এক সঙ্গে একটি মুরগির নীচে ১২-১৪ টি ডিম বসানো যাবে ।

খামারের আদলে বাঁশ, কাঠ খড়, বিচলী তাল নারকেল সুপারি পাতা দিয়ে যত কম খরচে স্থানান্তর যোগ্য ঘর তৈরী করা সম্ভব তা করা যায়। ঘর তৈরীর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সঠিক মাপের হয় এবং পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচল করতে পারে । বানানোর পর ঘরটিকে বাড়ীর সবচেয়ে নিরিবিলি স্থানে রাখতে হবে । মাটির উপর ইট দিয়ে তার উপর বসাতে হবে। তাহলে ঘর বেশী দিন টিকবে । ফুটানোর ডিম সংগ্রহ ও সংরক্ষন আরেকটি প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ন কাজ। ডিম পাড়ার পর ডিম সংগ্রহের সময় পেন্সিল দিয়ে ডিমের গায়ে তারিখ লিখে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষন করতে হবে। ডিম পাড়া শেষ হলেই মুরগি কুঁচো হবে। গরম কালে ৫-৬ দিন বয়সের ডিম এবং শীত কালে ১০-১২ দিন বয়সের ডিম ফুটানোর জন্য নির্বচন করতে হবে।

১২.২ দেশী মুরগি পালন কৌশলের বিশেষ নজর দেয়ার ধাপ সমূহ ঃ

উমে বসানো মুরগির পরিচর্যা করতে হবে। মুরগির সামনে পাত্রে সবসময় খাবার ও পানি দিয়ে রাখতে হবে যাতে সে ইচ্ছে করলেই খেতে পারে । তাহলে মুরগির ওজন হ্রাস পাবেনা এতে বাচ্চা তোলার পর আবার তাড়াতাড়ি ডিম পাড়া আরম্ভ করবে।

* ডিম বসানোর ৭-৮ দিন পর আলোতে রাতের বেলা ডিম পরীক্ষা করলে বাচ্চা হয় নাই এমন ডিম গুলো চেনা যাবে এবং বের করে অনতে হবে। বাচ্চা হওয়া ডিমগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন মুরগি বিরক্ত না হয়।
* প্রতিটি ডিমের গায়ে সমভাভে তাপ লাগার জন্য দিনে কম পক্ষে ৫-৬ বার ওলট পালট করে দিতে হবে।
* বাতাসের আর্দ্রতা কম হলে বিশেষ করে খুব গরম ও শীতের সময় ডিম উমে বসানোর ১৮- ২০দিন পর্যন্ত কুসুম গরম পানিতে হাতের আঙ্গুল ভিজিয়ে পানি স্প্রে করে দিতে হবে।
* ফোটার পর ৫-৬ ঘন্টা পর্যন্ত মাকে দিয়ে বাচ্চাকে উম দিতে হবে। তাতে বাচ্চা শুকিয়ে ঝরঝরে হবে।

১২.৩ বাচ্চা ফুটার পর বাচ্চার পরিচর্যা ও ডিম পাড়া মুরগির পরিচর্যা ঃ

গরম কালে বাচ্চার বয়স ৩-৪ দিন এবং শীত কালে ১০-১২ দিন পর্যন্ত বাচ্চার সাথে মাকে থাকতে দিতে হবে। তখন মুরগি নিজেই বাচ্চাকে উম দিবে। এতে কৃত্রিম উমের (ব্রুডিং) প্রয়োজন হবে না। এ সময় মা মুরগিকে খাবার দিতে হবে। মা মুরগির খাবারের সাথে বাচ্চার খাবার ও কিছূ আলাদাকরে দিতে হবে। বাচ্চা গুলো মায়ের সাথে খাবার খাওয়া শিক্ষবে। উপরোক্ত বর্নিত সময়ের পর মুরগিকে বাচ্চা থেকে আলাদা করতে হবে। এ অবস্থায় বাচ্চাকে কৃত্রিম ভাবে ব্রুডিং ও খাবার দিতে হবে। তখন থেকেই বাচ্চা পালনের মত বাচ্চা পালন পদ্ধতির সব কিছুই পালন করতে হবে। মা মুরগিকে আলাদা করে লেয়ার খাদ্য দিতে হবে। এ সময় মা মুরগিকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার জন্য পানিতে দ্রবনীয় ভিটামিন দিতে হবে। মা মুরগি ও বাচ্চা এমনভাবে আলাদা করতে হবে যেন তারা দৃষ্টির বাহিরে থাকে। এমন কি বাচ্চার চিচি শব্দ যেন মা মুরগি শুনতে না পায় । তা না হলে মা ও বাচ্চার ডাকা ডাকিতে কেউ কোন খাবার বা পানি কিছুই খাবে না । আলাদা করার পর অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে গেলে আর কোন সমস্যা থাকে না । প্রতিটি মুরগিকে এ সময় ৮০-৯০ গ্রাম লেয়ার খাবার দিতে হবে। সাথে সাথে ৫-৭ ঘন্টা চড়ে বেড়াতে দিতে হবে। প্রতি ৩-৪ মাস পর পর কৃমির ঔষধ এবং ৪-৫ মাস পর পর আর. ডি. ভি . টীকা দিতে হবে। দেশে একটি মুরগি ডিম পাড়ার জর্ন্য ২০ -২৪দিন সময় নেয় । ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর জন্য ২১ দিন সময় নেয় । বাচ্চা লালন পালন করে বড় করে তোলার জন্য ৯০-১১০ দিন সময় নেয় । ডিম থেকে এ ভাবে (৯০-১১০ দিন) বাচ্চা বড় করা পর্যন্ত একটি দেশী মুরগির উৎপাদন চক্র শেষ করতে স্বাভাবিক অবস্থায় ১২০- ১৩০ দিন সময় লাগে। কিন্তু মাকে বাচ্চা থেকে আলাদা করার ফলে এই উৎপাদন চক্র ৬০ -৬২ দিনের মধ্যে সমাপ্ত হয়। বাকি সময় মুরগিকে ডিম পাড়ার কাজে ব্যবহার করা যায় । এই পালন পদ্ধতিকে ক্রিপ ফিডিং বলে ।

* ক্রিপ ফিডিং পদ্ধতিতে বাচ্চা পালন করলে মুরগিকে বাচ্চা পালনে বেশী সময় ব্যয় করতে হয় না । ফলে ডিম পাড়ার জন্য মুরগি বেশী সময় দিতে পারে । এই পদ্ধতিতে বাচ্চা ফুটার সংখ্যা বেশী হয় । দেখা গেছে বাচচার মৃত্যুহারও অনেক কম থাকে। মোট কথা অনেক দিক দিয়েই লাভবান হওয়া যায় । এই পদ্ধতি বর্তমানে অনেকে ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছেন।

মডিউল -১৩
কোয়েল পালন

১৩.১ কোয়েল পালনের গুরুত্ব ও জাত পরিচিতি ঃ
আমাদের দেশে পোষা পাখির মধ্যে কোয়েল একটি নতুন সংযোজন। বাংলাদেশের আবহাওয়া কোয়েল পালনের জন্য খুবই উপযোগি। কোয়েলের মাংস এবং ডিম সুস্বাদু ও পুষ্টিকর । পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে কোয়েল পালন অনেক মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারে। হাঁস-মুরগির মত কোয়েল পালন করে অনেকেই লাভবান হয়েছেন। অনেকে আত্মকর্ম সংস্থানের জন্য কোয়েল পালন পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন । বর্তমানে ঢাকা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কোয়েল পালন খামার গড়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই কোয়েল পালন যথেষ্ট্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং পোল্ট্রি শিল্পের একটি মজবুত অংগ হিসেবে নিজের স্থান করে নিয়েছে।
বাণিজ্যিক জাপানী কোয়েলের অনেক গুলি জাত ও উপজাত রয়েছে। জাত ও উপজাত ভেদে কোয়েলের গায়ের রং ওজন, আকার, আকৃতি, ডিমপাড়ার হার, ডিমের ওজন ইত্যাদির অনেক পার্থক্য রয়েছে।
বর্তমানে পৃথিবীতে উদ্দেশ্য ও অবস্থান অনুযায়ী তিন ধরনের কোয়েল রয়েছে।

(১) বন্য কোয়েল (Wild Quail)
(২) বানিজ্যিক কোয়েল (Commercial Quail)
(৩) ল্যাবরেটরী কোয়েল (Laboratory Quail)

ল্যাবরেটরী কোয়েল বিভিন্ন গবেষনার কাজে ব্যবহার করা হয় কিন্তু খামারীদের কাছে বাণিজ্যিক কোয়েল গুরুত্বপূর্ন । উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাণিজ্যিক কোয়েল তিন প্রকার যথাঃ

(১) লেয়ার কোয়েল (Layer Quail)
(২)ব্রয়লার কোয়েল(Broiler Quail)
(৩) ব্রিডার কোয়েল (Breeder Quail)

১। লেয়ার কোয়েল ঃ

ডিম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কায়েলকে লেয়ার কোয়েল বলা হয় । লেয়ার কোয়েল শুধু খাবার ডিম উৎপাদনের জন্য পালন করা হয় । লেয়ার কোয়েলের সাথে তাই কোন মাদী কোয়েল রাখা হয়না । সাধারণত ৬-৭ সপ্তাহ বয়স থেকে মাদী কোয়েল ডিম পাড়া শুরু করে এবং প্রতিটি কোয়েল বছরে ২৯০ - ৩০০টি ডিম পেড়ে থাকে। লেয়ার খামারে সাধারনত ৫৪ সপ্তাহব্যাপী মাদী কোয়েল পালন করা হয় । এরপর এগুলোকে ডিম উৎপাদনের জন্য বাতিল করে দেয়া হয় এবং মাংসের জন্য বিক্রয় করা হয়।

বানিজ্যিক কোয়েল

২। ব্রয়লার কোয়েল ঃ
নরম ও সুস্বাদু মাংস উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জাপানি কোয়েলকে 'ব্রয়লার কোয়েল' বলা হয়। এ উদ্দেশ্যে মর্দা-মাদী নির্বেশেষে জন্মের দিন থেকে পাঁচ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত এদেরকে পালন করা হয়। এ সময়ের মধ্যে

একেকটির জীবিত ওজন ১৪০ -১৫০ গ্রাম হয়ে যায়। এগুলো থেকে প্রায় ৭২.৫% খাওয়ার উপযোগী মাংস পাওয়া যায়। মাংস উৎপাদনের জন্য পৃথিবীতে যতো ধরনের কোয়েল তৈরি করা হয়েছে তার মধ্যে ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশের কোইমবাটোরস্থ এ.ভি.এম. হ্যাচারিজ এন্ড ব্রিডিং রিসার্চ সেন্টার (প্রাঃ) লিমিটেড কর্তৃক উৎপন্ন সাদা কোয়েলই উৎকৃষ্টতম । অবশ্য এটি এখনও আমাদের দেশে আনা হয়নি। তাই আপাতত লেয়ার কোয়েলগুলোই ব্রয়লার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের মাংস উৎপদন হারও যথেষ্ট ভাল।

৩। ব্রিডার কোয়েলঃ

লেয়ার ও ব্রয়লার কোয়েলের বাচ্চা ফোটানোর লক্ষ্যে ডিম উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত বাছাই করা প্রজননে সক্ষম মর্দা-মাদী কোয়েলগুলোকে ব্রিডার কোয়েল বলা হয়। সাধারণত ৭-৮ সপ্তাহ বয়সের মাদী এবং ১০সপ্তাহ বয়সের মর্দা কোয়েরকে ব্রিডিং খামারে এনে পালন করা হয়। তবে এদের বয়স ১০ সপ্তাহ হওয়ার পর প্রজননের কাজে ব্যবহার করা উত্তম।এখানে এদেরকে ৩০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত রাখা হয়। ডিমের উর্বরতা ভাল রাখার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে ২টি মাদী কোয়েলের সংগে একটি মর্দা কোয়েল রাখতে হয়।

১৩.২ কোয়েল পালন পদ্ধতি (কোয়েলের বাচ্চা পালন ও বয়স্ক কোয়েল পালন)ঃ

মুরগির বাচ্চার মত কোয়েলের বাচ্চাকেও কৃত্রিম পদ্ধতিতে ব্রুডিং করা দরকার হয়। কোয়েল পালনের পুরু সময়কালকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। (১) বাচ্চা পালন পর্ব (২) বয়স্ক কোয়েল পর্ব

বাচ্চা পালন পর্ব ঃ শুন্য থেকে ৩৫ দিন পর্যন্ত বাচ্চা পালন পর্বের অর্ন্তরভুক্ত তবে ১৪ দিন পর্যন্ত ব্রুডিং করতে হয়। পরিবেশের তাপমাত্রার কারনে ব্রুডিং পর্ব ৩ সপ্তাহ বা তারও বেশী সময় হতে পারে। একদিন বয়সের বাচ্চার জন্মের পর থেকে কৃত্রিম ভাবে তাপের মাধ্যমে পালন করাকে ব্রুডিং বলা হয়।

কোয়েলের বাচ্চা পালন

কোয়েলের বাচ্চা ব্যাটারি বা লিটার যে কোন প্রাণিতিতেই পালন করা যায়। তবে যে পদ্ধতিতেই পালন করা হোক না কেন এদের খাঁচা যে ঘরে রাখা হবে বা লিটার পদ্ধতিতে যে ঘরে পালন করা হবে সেটি যথেষ্ট মজবুত হওয়া বাঞ্ছনীয় । ঘরটি এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যেন তাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে ; বৃষ্টি বাদলে যেন পানি প্রবেশ না করে ; ইদুঁর বা অন্যান্য প্রাণি-পাখি যেন উৎপাত না করে । তাছাড়া ঘরটি বয়স্ক কোয়েল বা হাঁস-মুরগির ঘর থেকে কিছুটা দূরে হওয়া বাঞ্ছনীয় । ঘরটিকে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। । কোয়েলের বাচ্চার ব্রুডিং ও রিয়ারিং এর জন্য আলাদা ঘর ব্যবহার করা উচিত তবে তা সম্ভব না হলে একই ঘরে বেড়া বা পার্টিশন দিয়ে পালন করা যেতে পারে। তবে কখনোই একই খাঁচায় বা একসঙ্গে লিটারের বিভিন্ন বয়সের কোয়েল পালন করা উচিত নয়।

সঠিক ভাবে কোয়েলের বাচ্চা পালনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে।

লিটারে কোয়েল পালন

১. সঠিক তাপমাত্রা
২. পর্যাপ্ত আলো
৩. বায়ু চলাচল ব্যবস্থা
৪. বাচ্চার ঘন্তব
৫. খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা

৬. স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ।

১. সঠিক তাপমাত্রা ঃ বাচ্চাদের জীবন ধারণ ও সঠিক বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে তাপমাত্রা গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রয়েছে। পরিবেশের তাপমাত্রার সঙ্গে মিল রেখে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জন্মের প্রথম দিকে এদের খুবই কম থাকে। তাছাড়া এদের দেহের কোমল পালকের আচ্ছাদনও পর্যাপ্ত তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে তাপের অভাবে শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। এতে অনেক বাচ্চাই মারা যায়। যেগুলো বেঁচে থাকেব তাদের বৃদ্দির সঠিক হয় না। তাই বাচ্চা পালন ঘরে সঠিকভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। বাচ্চা পালন ঘরের তাপমাত্রা ২১ডিগ্রী -২২ সেলসিয়াস এ রাখতে হয়। ব্রডারের বাচ্চাদের তাপ দেয়ওয়ার বিশেষ ধরনের যন্ত্র রাখতে হয়। এরপর প্রতি তিন -চারদিন পরপর ২.৫ -৩.০ সেঃ করে কমিয়ে তিন সপ্তাহ পর তা ঘরের তাপমাত্রায় নামিয়ে আনতে হবে। শীতকাল ছাড়া বাচ্চা পালনের পরবর্তী দুই সপ্তাহ শুধু মাত্র রাতের বেলায় তাপের ব্যবস্থা করলেই চলে।

২. পর্যাপ্ত আলোঃ বাচ্চাদের বৃদ্ধিতে আলো গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা রয়েছে। বাচ্চাদের জনন গ্রন্থির বৃদ্ধিতে আলোর বর্ণ বেশ প্রভাব ফেলে । যেমন মর্দা বাচ্চাদের শুক্রাশয়ের বৃদ্দিতে লাল বর্ণের আলোর ভূমিকা নীল বর্ণের তুলনায় বেশি তাছাড়া আলোর সাহায্যেই এরা নিজেদেরকে ব্রডার হাউজের / কেইজের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শেখে এবং খাদ্য ও পানি পান করার প্রতি মনোযোগি হয়। দু সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের ঘরে ২৪ ঘন্টা আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয় সপ্তাহের শেষে তা কমিয়ে দৈনিক ১২ ঘন্টায়ই সীমাব্ধ রাখতে হবে। তবে তাড়াতাড়ি যৌন পরিপক্ক আনতে হবে প্রথম দিন থেকে ৫ -৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত দৈনিক ২৪ ঘন্টা আলো জ্বেলে রাখতে হবে। ব্রয়লার ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি ওজন বাড়ানোর জন্য ২৫ -২৮ দনি থেকে ৩৫ দিন পর্যন্ত বাজারজাত করার ৭-১০ দিন পূর্ব থেকে দৈনিক ৮ঘন্টা আলোতে ও ১৬ ঘন্টা অন্ধকারে রাখতে হবে।

৩. বায়ু চলাচল ব্যবস্থা ঃ বাচ্চা পালন ঘে পযাপ্ত বায়ূ চলাচল ব্যবস্থা রাখতে হবে। এর মাধ্যমে গরমের দিনে ঘরের মধ্যে সৃষ্ট তাপ সহজেই বেরিয়ে যেতে পারবে। এছাড়া ঘরে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ূ ঢোকা ও ঘরে সৃষ্ট ক্ষতিকারক ঘ্যাস বের হয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক বায়ূ চলাচল ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ব্রুডিংয়ের প্রথম সপ্তাহে ঘরে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে হবে এবং ধীরে ধীরে তা বড়াতে হবে। ঘরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রথম তিন সপ্তহ ৬০-৬৫% পরবর্তী দু'সপ্তহ ৫৫-৬০% এ রাখতে হবে।

৪. বাচ্চার ঘনত্বঃ ঘরের ভিতরে বা ব্রুডারের নিদিষ্ট জায়গার ভিতরে মোট বাচ্চার ঘনত্বের ওপর এদের সঠিক বৃদ্ধি নির্ভর করে। তিন সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত প্রতিটি বাচচার জন্য ব্রুডারের হোভারের নিচে ৭৫ বর্গ সেঃ মিঃ জায়গা বরাদ্ধ করতে হবে। রান এর ব্রুডারের হোভারে চারদিক থেকে চিক গার্ড পর্যন্ত ফাঁকা জাযগাটুকু একই পরিমান জায়গা থাকবে। ৩-৫ সপ্তাহ পর্যান্ত ১৫০ -১৭৫ বর্গসেঃমিঃ জায়গার প্রয়োজন হবে। লিটার পদ্ধতিতে প্রতিটি বাচ্চার জন্য সর্বমোট ২০০-২৫০ বর্গসেঃমিঃ জায়গা দিতে হবে।
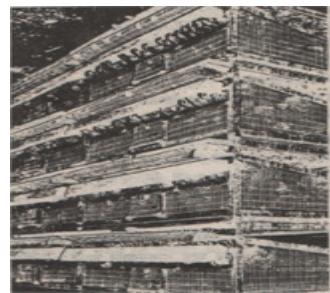
৫. খাদ্য ও পানির ব্যবস্থাপনাঃ বাচ্চাদের জীবনের প্রথম দিকে খাদ্য ও পানির সহজ প্রাপ্যতা আরামপ্রদ পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বর্পূন ভূমিকা পালন করে। যদি কোন বাচ্চা তার ধারে কাছে খাদ্য ও পানি খুঁজে না পায় , তবে তার শরীর পর্যাপ্ত শক্তির অভাবে ঠান্ডা হয়ে যাবে ও না খেতে পেয়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে মারা যাবে। জন্মের প্রথম সপ্তাহে বাচ্চা মৃত্যুর একটি অন্যতম প্রধান কারণ হলো পানির অভাব। যেহেতু ব্রডিংয়ের উচচ্ তাপমাত্রায় বাচ্চারা সহজেই পানিশূন্যতায় ভোগে তাই এদের জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ঃ বাচচদের সঠিক বৃদ্ধির জন্য ঘর ও ব্রুডারের পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয় । ঘরের ভিতর কোনো ময়লা আর্বজনা থাকা চলবে না। লিটার ভেজা থাকা চলবে না । বাচ্চা

পালন ঘরে পালনকারি ছাড়া অন্যদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করতে হবে। তাছাড়া অন্যান্য প্রাণিপাখিও যেন ঘরের আশেপাশে না আসতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কোনো বাচ্চা নখ,পা,পালক, ঠোঁট প্রভৃতিতে ময়লা জমলে তা আলতোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। ময়লার চোখ বন্ধ হয়ে গেলে একটুকরা তুলো পানিতে ভিজিয়ে ময়লা পরিষ্কার করা উচিত।

বয়স্ক কোয়েল পালন ঃ

লেয়ার খামারে পূর্নবয়স্ব মাদী কোয়েলগুলোকে ষষ্ঠ সপ্তাহ বয়স থেকে ডিম পাড়ার ঘওে লিটার বা খাঁচা পদ্ধতিতে পালন করা হয়। ব্রিডার কোয়েলগূলোকে ব্রিডার কেইজে দেওয়ার পূর্বে মর্দা ও মাদী আলাদাভাবে পালন করতে হবে। সাধারণত ৭-৮ সপ্তাহ বয়সের বাছাই করা মর্দা কোয়েলগুলো ব্রিডার কেইজে একসঙ্গে রাখা হয় এই লক্ষ্যে ৩/৪ সপ্তাহ বয়সে যখন পালকের রং দেখে পার্থক্য করা যাবে তখন থেকে ব্রিডার কেইজে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এদেরকে আলাদাভাবে পালন করতে হবে। তাছাড়া ব্রিডিং খাঁচায় মর্দা ও মাদী সব সময়ের জন্যই একসঙ্গে রাখা যাবে না। বরং দরকার মতো সময়ে প্রজন করানোর জন্য মর্দাকে ব্রিডিং খাঁচায় ঢুকানো হবে। এবং নিদির্ষ্টকাল পরে আবার পৃথক করে ফেলতে হবে।ব্যাটারি বা লিটর দু' পদ্ধতিতে পালন করা গেলেও কোয়েলের জন্য ব্যাটারি পদ্ধতিই সহজ, রিাপদ ,টেকসই ও স্বাস্থ্য সম্মদ । তাই এ পদ্ধতিতে খামার করাই লাভজনক ।

খাঁচায় বয়স্ক কোয়েল পালন

সাফল্যজনকভাবে বয়স্ক কোয়েল পালন করতে হলে খামারিদের নিম্নের বিষয়গুলো সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে।

১. তাপমাত্রা ঃ বয়স্ক কোলের ঘরে তাপমাত্রা ২১ডিগ্রী -২২ডিগ্রী সেঃ স্থির রাখতে হবে। অতিরিক্ত তাপমাত্রায় এর গরমের ধকলে ভোগবে। এতে ডিম উৎপাদন মারাত্নকভাবেহ্রাস পাবে।

২. আলো ঃ কোয়েলের ডিম উৎপাদন আলোর ওপর যথেষ্ট নির্ভরশীল । তাই কোয়েল থেকে পর্যাপ্ত ডিম পেতে হলে দৈনিক ১৬ ঘন্টা আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই লক্ষ্যে ষষ্ঠ সপ্তাহে ১৩ ঘন্টা আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। সপ্তম ,অষ্টম ও নবম সপ্তাহে সপ্তাহপ্রতি এক ঘন্টা হিসেবে বাড়তি তা যথাক্রমে ১৪.১৫, ও ১৬ ঘন্টার বৃদ্ধি করতে হবে। নবম সপ্তাহ থেকে বাকি সময় প্রতিদিন এই ১৬ ঘন্টা হিসেবেই আলো বরাদ্দ করতে হবে। উলেখ্য একটি ৪০ ওয়াটের বাল্ব দিয়ে (মিটার জায়গা আলোকিত করা যায়। ডিম উৎপদনে আলোর বর্নের ও প্রভাব রয়েছে। পর্যাপ্ত ডিম উৎপাদনে লাল বর্নের আলো থেকে বেশি ভূমিকা রাখে।

৩. বায়ু চলাচল ব্যবস্থা ঃ ঘরে পর্যাপ্ত বায়ূ চলাচল ব্যবস্থা থাকতে হবে। বড় খামারে ক্ষেত্রে বায়ূ চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য, ঘরের লিটার শুকানোর জন্য এক্সাস্ট পাখা লাগাতে হবে। ঘরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকতে হবে ৫৫-৬০% ।

৪. প্রয়োজনীয় জায়গা ঃ লিটার পদ্ধতিতে প্রতিটি পাখির জন্য ২০০-২৫০ বর্গ সে.মি. জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া ঘরের লিটার ১০ সে.মি. পুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যাটারি পদ্ধতিতে খাঁচা ছোট হোক বা বড় হোক একতলা হোক বা ছয়তলা হোক অবশ্যই প্রতিটি কোয়েলের জন্য ১৫০ -২০০ বর্গ সে.মি. জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। উভয় পদ্ধতিতেই ব্রিডার কোয়েলের জন্য কিছুটা বেশি জায়গার প্রয়োজন হবে।

৫. ডিম পাড়ার বাক্স ঃ লিটার পদ্ধতিতে কোয়েল পালনে একটি অসুবিধা হলো, এরা ডিম পাড়ার পর পরই অনেক সময়ই তা লিটারের ভেতরে লুকিয়ে ফেলে। তাছাড়া লিটারে পাড়া ডিমে অহরহই ময়লা লেগে যায়। এতে ডিম দেখতে খারাপ লাগে। তাই লিটারে পালিত কোয়েলের ক্ষেত্রে ডিম পাড়ার বাক্স ডিম পাড়ানোর অভ্যাস করা উচিত। এ লক্ষ্যে লেয়ার হাউজে কোয়েলের সংখ্যার অনুপাতে ডিম পাড়ার বাসা বা লেয়িং নেস্ট সরবরাহ করা উচিত। প্রতি ৪-৫ টি কোয়েলের জন্য একটি লেয়িং নেস্ট সরবরাহ করা উচিত। প্রতিটি লেয়িং নেস্ট ১৫x ২০ x ২০ ঘন সে.মি. মাপের হওয়া বাঞ্ছনীয় ।

৬. খাদ্য ও পানির জায়গা ঃ ব্যাটারি বা লিটার উভয় পদ্ধতিতেই প্রতিটি কোয়েলের জন্য খাদ্য ও পানির জন্য যথাক্রমে ৩ ও ২ সে.মি. জাগয়া বরাদ্দ করতে হবে। তাছাড়া বিশেষ নকশার খাদ্য ও পনির পাত্র ব্যবহার করতে হবে। এতে খাদ্য ও পানির অপচয় রোধ হবে।

৭. স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ ঃ খামার সব সময় স্বাস্থ্যসম্মত ও জীবানুমুক্ত রাখতে হবে । এতে কোয়েল থেকে পর্যাপ্ত উৎপাদন পাওয়া যাবে।

১৩.৩ বিভিন্ন বয়সের কোয়েলের খাদ্যঃ

কোয়েলের পালনকালের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাভাবিক বৃদ্ধি স্বাস্থ্যরক্ষা ,ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য এদের খাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টি মান উপাদানের চাহিদার বেশ তারতম্য ঘটে। পুষ্টি উপাদানের চাহিদার ওপর ভিত্তি কওে বয়স অনুযায়ী কোয়েলকে বিভিন্ন শ্রেনীতে ভাগ করা হয়। ১. প্রারম্ভিক পর্ব, ২. বৃদ্ধি পর্ব, ৩. ডিম পাড়া পর্ব,

৪. ব্রিডার পর্ব

১. প্রারম্ভিক পর্ব ঃ জন্মের দিন থেকে তিন সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত কোয়েলের খাদ্যের প্রতি বিশেষ সজর দিতে হয়। কারণ ,এ সময়টা এদের জীবনের সংকটময় কাল । এ বয়সে এদের দৈহিক র্বদ্দির সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে এবং মর্দা ও মাদীর বৃদ্ধির হারও সমান থাকে। প্রারম্ভিক পর্বের কোয়েলের খাদ্যে ২৭ % আমিষ ও প্রায় ২,৮০০ কিলো ক্যালোরি বিপাকীয় শক্তি /কেজি থাকা প্রয়োজন।

২. বৃদ্ধি পর্ব ঃ তিন সপ্তাহের পর থেকে মদ্দাগুলোর তুলনায় মাদীগুলোর বৃদ্দির হার বেশি হয়। কারণ এ সময় মাদীগুলোর ডিম্বাশয় ও ডিম্বনালীর আকার ও ওজন বাড়তে থাকে। কোয়েল ছাড়া পোল্ট্রিও অন্য প্রজাতিগুলোর মধ্যে এমনটি সচরাচর দেখা যায় না। তবে সামগ্রিকভাবে প্রারম্ভিক পর্বের তুলনায় এ পর্বে কোয়েলের বৃদ্ধির হার কম। এ বয়সের কোয়েলের খাদ্যে ২৪% আমিষ ও ২,৮০০ কিলো ক্যালরি বিপাকীয় শক্তি/কেজি থাকতে হয়। তবে ব্রয়লার কোয়েলের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পর্বের প্রারম্ভিক পর্বের ন্যায় খাদ্যে ২৭% আমিষ থাকা প্রয়োজন।

৩. লেয়ার   পর্বের খাদ্য ঃ কোয়েল ছয় সপ্তাহ বয়স থেকে ডিম পাড়া শুরু করে । এ সময় এদের বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী পর্বগুলির মত এতদূরত হয়না দৈহিকবৃদ্ধি ও ডিম পাড়া হারের উপর ভিত্তিকরে এ পর্বটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন ঃ (১) ৬-১৪ সপ্তাহ (২) ১৫ -২৬ সপ্তাহ
(৩) ২৭ থেকে বাকি সময় পর্যন্ত । ৬ -১৪ সপ্তাহ পর্যন্ত সময় ডিম উৎপাদন শূন্য থেকে সর্বোচ্চ হারে (৯০%) পৌছে। তাছাড়া ডিমের আকার ওজন বৃদ্ধি পায় । ফলে খাদ্যে সেই মোতাবেক নজরদিতে হয়। ১৫ - ২৬ সপ্তাহ বয়সে দৈহিক বৃদ্ধি এবং ডিমের াআকার ও ওজনের তেমন পরিবর্তন হয় না। কাজেই এই পর্যায়ে পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে আমিষ ও বিপাকীয় শক্তি কম লাগে। ২৭ থেকে বাকি সময় ডিম উৎপাদন কমে যায় । তবে ডিমের আকার ও ওজন কিছুটা বৃদ্ধি পায় এই সময় দৈহিক বৃদ্ধি স্থির থাকে বিধায় আমিষ ও বিপাকীয় শক্তি কম লাগে।

৪. ব্রিডার পর্ব ঃ ব্রিডার কোয়েলকে খাদ্য মোরগ-মুরগির মত ব্রিডার রেশন দিতে হয়। এখাদ্য তৈরি করার সময় ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্সও ব্রিডার রেশনের দিতে হয়।

বিভিন্ন বয়সের কোয়েলের খাদ্য তালিকাঃ

উপাদান কেজি/১০০কেজিতে)	প্রারম্ভিক রেশন (০-৩ সপ্তাহ)	বৃদ্ধির /বাড়ন্ত রেশন (৪-৫ সপ্তাহ)	লেয়ার/ ব্রিডার রেশন (৬ সপ্তাহ -বাকী সময়)
ভূট্টা	৫৩.২০	৫৩.২৫	৫০.২৫
মিহি চাউলের কুড়া	১৫.০০	১৬.০০	১৬.০০
প্রোটিন কনসেনট্রেড	৮.০০	৭.০০	৭.০০
সয়াবিন মিল	২১.০০	২০.০০	২০.০০
ঝিনুক চূর্ন	২.০০	৩.০০	৬.০০
লবন	০.৫০	০.৫০	০.৫০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৩০	০.২৫	০.২৫
সর্বমোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

১৩.৪ কোয়েলের রোগ ব্যাধি ও প্রতিকার এবং কোয়েলের বাজার জাত করন ঃ

কোয়েল পালনের অন্যতম সুবিধা হলো এদের রোগ ব্যাধি কম। এদের রোগ ব্যাধি কম হওয়ায় টীকা দিতে হয় না। অন্যদিকে কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হয়না। তবে নিয়মিত ও অধিক হারে মাংস ও ডিম উৎপাদন পেতে হলে খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের সংগে সংগে কোয়েলের রোগ ব্যাধিসম্পর্কে খামারীদের যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। এ পর্যন্ত কোয়েলের যে সমস্ত রোগ ব্যাধি সম্পর্কে জানা গেছে তার মধ্যে নিম্ন লিখিত রোগ গুলো অধিক গুরুত্ব পূর্ন।

১. ক্ষতসৃষ্টিকারী তন্ত্র প্রদাহ ,
২. কোয়েলের ক্লোমনালী প্রদাহ,
৩. ব্রুডার নিউমোনিয়া,
৪. কলিসেপ্ টিসিমিয়া
৫. রক্ত আমাশয় এবং
৬. স্পর্শ জনিত চর্মপ্রদাহ

ক্ষতসৃষ্টিকারী তন্ত্র প্রদাহ ঃ

কোয়েলের রোগ ব্যাধির মধ্যে এটি সবচেয়ে মারাত্মক । কারন এ রোগে আক্রান্ত হলে ১০০% ও মারা যেতে পারে। সাধারনত দুষিত খাদ্য দ্রব্য খাওয়ার মাধ্যমে বাচ্চা কোয়েল এ রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারনত এটি লিটারে পালিত কোয়েলের বেশি দেখা যায় । এটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত অন্ত্রের রোগ। এই রোগে আক্রান্ত হলে স্থানীয় যে কোন প্রাণিচিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

২. কোয়েলের ক্লোমনালী প্রদাহঃ

এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমনে কোয়েলের এ রোগ হয়। এতে ক্লোমনালী আক্রান্ত হয়ে তীব্র প্রকৃতির প্রদাহের সৃষ্টি করে। ৩ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত এ রোগটি স্থায়ী হতে পারে এবং বাচ্চা কোয়েলে ৮০% পর্যন্ত মৃত্যু হার হতে পারে। আক্রান্ত কোয়েলে হাঁচি, কাশি ও অস্বাভাবিক শ্বাসীয় শব্দ লক্ষ্য করা যায়। তবে নাক দিয়ে কোন তরল পদার্থ নিঃসৃত হতে দেখা যায় না। কোন কোন সময় চোখ দিয়ে পানি পড়তে দেখা যায়। যেহেতু এটি ভাইরাস জনিত রোগ তাই এর কোন চিকিৎসা নেই। ব্যাকটেরিয়া জনিত মাধ্যমিক সংক্রমন এরাতে স্থানীয় প্রাণিচিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

৩. ব্রুডার নিউমোনিয়া ঃ

বাচ্চা মুরগিতে ব্রুডার নিউমোনিয়া সৃষ্টিকারী ছত্রাক অ্যাসপারজিলাস ফিউমিগেটাস বাচ্চা কোয়েলকে আক্রান্ত করতে পারে। দুষিত খাদ্য বা লিটার সামগ্রীর সংস্পর্শে অথবা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে দুষিত বস্তু গ্রহনে কোয়েল এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তীব্র প্রকৃতির রোগে ক্ষুধামান্দ্য, পিপাসা বৃদ্ধি, জ্বর ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। বাচ্চা শুকিয়ে যায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে। শ্বাসকষ্টের কারণে বাচ্চা মুখ হা করে ঘাড় মাথা উপরের দিকে টান করে শ্বাস গ্রহন করে।

৪. কলিসেপটিসিমিয়া ঃ

ইসকেরিশিয়া কোলাই নামক ব্যাকটেরিয়া এ রোগ সৃষ্টি করে। বাচ্চা এবং বয়স্ক সব বয়সের কোয়েলই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এতে সচরাচর শ্বাসতন্ত্র আক্রান্ত হলেও অন্যান্য তন্ত্র ও আক্রান্ত হতে পারে। সাধারনত রোগ লক্ষণ প্রাকাশের পূর্বেই পাখির মৃত্যু ঘটে। হঠাৎ পাখির মৃত্যু হার বেড়ে যায় এবং শ্বাসতন্ত্রের উপসর্গ , মুখ হা করে থাকা, নাকে মুখে ফেনা ওঠা, চোখদিয়ে পানি পড়া
ইত্যাদি দেখা যায়।

৫. রক্ত আমশয় ঃ

মুরগিতে রক্ত আমাশয় সৃষ্টিকারী এককোষী পরজীবিগুলো কোয়েলকে আক্রান্ত করে না। তবে আইমেরিয়া উজুরা ও আইমেরিয়া সুনোডাই নামক এককোষী পরজীবি বাচ্চা কোয়েলকে আক্রান্ত করে। এতে রক্ত আমাশয় দেখা দেয়। বাচ্চা ঝিমাতে থাকে ,দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং রক্ত শূন্যতার কারনে মারা যায়।

৬. স্পর্শজনিত চর্মপ্রদাহ ঃ

লিটার ও খাঁচা পদ্ধতিতে পালিত কোয়েলে প্রায় সময়ই এ রোগটি দেখা যায়। সাধারনথ ৩/৪ মাস বা ততোধিক বয়সের কোয়েল আক্রান্ত হয়। এতে মর্দা কোয়েলের প্রজনন ক্ষমতা ও মাদী কোয়েলের ডিম উৎপাদন মারাত্মক ভাবে হ্রাস পায়। কাজেই কোয়েল খামারিদের এ রোগ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা অত্যন্ত জরুরি। কয়েকটি চর্মরোগ যেমন - হক বার্ন ,ব্রেস্ট বিষ্টার, স্কেবি হিপ সিড্রোম ইত্যাদি ।

গবাদি প্রাণি পালন

মড্যুল-১৪ ঃ গবাদি প্রাণির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

১৪.১ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবাদি প্রাণির ভূমিকা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবাদি প্রাণির ভূমিকা অপরিসীম। এখানে কৃষকেরা শস্য চাষের পাশাপাশি প্রাণিপাখি লালন-পালন করে থাকে। হালচাষ, ফসল মাড়াই, মানব ও পণ্য পরিবহন, জৈব সার উৎপাদন এবং জ্বালানি সরবরাহে প্রাণিসম্পদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণে গবাদি প্রাণির দুধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে। ভূমি ও পুজি স্বল্পতার কারণে প্রাণিসম্পদ দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন।

প্রাণিসম্পদ দেশের রপ্তানি বাণিজ্যেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশ প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১২০০ কোটি আয় করছে। চামড়ার গুণগত মান ও পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের রপ্তানি আয় বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এছাড়া দেশে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করে গুড়াঁ দুধের আমদানি কমানোর মাধ্যমে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব। দেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে প্রাণিসম্পদ খাতের রয়েছে অপরিসীম সম্ভাবনা। প্রাণিজাত বিভিন্ন পণ্য যেমন মাংস, হাড়, চর্বিসহ অন্যান্য পণ্য রপ্তানির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব।

গবাদি প্রাণির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

গবাদি প্রাণি পালন শুধু স্বতন্ত্রভাবে দুধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য লাভজনক ব্যবসাই নয় বরং আত্মকর্মসংস্থান দারিদ্র্য বিমোচন এবং জাতীয় শ্রম ক্ষমতা উন্নয়নের অন্যতম সহজতর মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। তাছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা আয়, জ্বালানি ও সার, পরিবেশ সুরক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ও বিভিন্ন ধরনের সহযোগী শিল্প উৎপাদনে গবাদি প্রাণির অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র ঃ ১৪.১ গবাদি প্রাণির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বিগত কয়েক বছরে ধারাবাহিকতাভাবে গবাদি প্রাণির সংখ্যা বৃদ্ধি পাশাপাশি দুধ ও মাংসের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে যা জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

কৃষি কাজে গবাদি প্রাণির গুরুত্ব ঃ বাংলাদেশের বেশির ভাগ কৃষকই গরীব এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডিত জমির মালিক। এ ধরনের জমিতে যন্ত্রচালিত ট্রাক্টরের পরিবর্তে প্রাণিচালিত লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করা হয়। জমিতে বীজ, সার, যন্ত্রপাতি আনা-নেয়ার জন্য এবং ফসলের মাঠ থেকে ফসল বাড়িতে ও বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রামেগঞ্জে এখনও প্রাণিচালিত গাড়ি ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ করে যে সমস্ত এলাকায় পাকা রাস্তা নেই সে সমস্ত

এলাকায় গ্রামীণ পরিবহন হিসেবে গরু গাড়ি ও মহিষের গাড়ির প্রচলন আছে। শস্য নিড়ানী বা আগাছা দূরীকরণের জন্যও গবাদি প্রাণিকে ব্যবহার করা হয়। ধান, গম, কলাই ইত্যাদি ফসল মাড়াই এর জন্য গবাদি প্রাণি ব্যবহৃত হয়। আখ মাড়াই কল থেকে আখের রস বের করার জন্য এবং তৈল বীজ ও নারিকেল থেকে তেল উৎপাদনের জন্য ঘানি টানার কাজে গবাদি প্রাণিকে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও ইটভাটায় ইট তৈরির উপযোগী কাদা তৈরির জন্য গবাদি প্রাণি ব্যবহৃত হয়।
বাংলাদেশের কৃষি জমিতে বৈজ্ঞানিক মাত্রা ও অনুপাতে রাসায়নিক সার ব্যবহার না করার ফলে কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। এ সমস্ত জমির উর্বরতা ফিরে পাওয়ার জন্য গোবর সার বা জৈব সারের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। এ সার যেমন মাটির সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায় তেমনি ফসলের উৎপাদনও বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও গবাদি প্রাণির খাদ্যের উচ্ছিষ্টের সাথে আগাছা, কচুরিপানা ও মল-মূত্র মিশ্রিত গোয়াল ঘরের আবর্জনা একত্রে মিশ্রিত করে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যায়। আবার গোবর দিয়ে বায়োগ্যাস তৈরির পর উচ্ছিষ্টাংশ সার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়, যা একদিকে পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখে অন্য দিকে জৈব সারের ঘাটতি পূরণেও সহায়তা করে।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গবাদি প্রাণির গুরুত্ব ঃ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে গবাদি প্রাণির ভূমিকা অপরিসীম। প্রতি বছর বাংলাদেশ কাঁচা চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে বছরে কয়েকশ কোটি টাকা আয় করে। কাঁচা চামড়ার তুলনায় চামড়া থেকে তৈরি বিভিন্ন ধরনের বাক্স, বাদ্যযন্ত্র, খেলনা, জুতা, সুটকেস, জ্যাকেট ইত্যাদি সৌখিন দ্রব্য রপ্তানিতে লাভ হয় অনেক বেশি। বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংসের বেশ কদর রয়েছে। তাছাড়া ইদানিং প্যাকেটজাত গরুর মাংসও বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এছাড়াও গবাদি প্রাণির উপজাত দ্রব্য থেকে বিভিন্ন ধরনের রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে তা বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার সুযোগ রয়েছে। যেমনঃ

- হাড়, শিং ও ক্ষুর থেকে জিলাটিন, আঠা, গহনা, চিরুনী, বোতাম, ছাতা, ও ছুরির বাট ইত্যাদি তৈরি করে। প্রাণির ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে সার্জিক্যাল সুতা, টেনিস র‍্যাকেট ও মিউজিক্যাল স্ট্রিং ইত্যাদি তৈরি করে।
- রক্ত থেকে কোলাজেন তৈরি হয়। এছাড়া রক্ত প্রক্রিয়াজাত করে হাঁস-মুরগি ও প্রাণি খাদ্য তৈরি করা সম্ভব।
- অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন এবং এড্রেনাল গ্রন্থি থেকে ঔষধ তৈরি করে।
- চর্বি থেকে মোমবাতি, গ্লিসারিন, সাবান, লুব্রিকেটিং তেল, সিনথেটিক রাবার ইত্যাদি তৈরি করে।
- প্রাণির চুল থেকে ব্রাশ, কৃত্রিম চুল ইত্যাদি তৈরি করে।

দারিদ্র হ্রাস ও আত্মকর্মসংস্থানে গবাদি প্রাণির গুরুত্ব ঃ বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৬০% দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। জনসংখ্যার এ বিশাল অংশের দরিদ্রতা ব্যাপক শিল্পায়নের মাধ্যমে দূরীকরণ সম্ভব নয়। কাজেই স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগে ছাগল ও ভেড়া পালন করে যেমন দরিদ্রতা হ্রাস করা যায় তেমনি আত্মকর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। গ্রামের গরিব দুস্থ মহিলা, বেকার যুবক, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সহজেই দু-চারটি ছাগল বা ভেড়া পালন করতে পারে। অনেকে একটি সংকর জাতের দুধাল গাভী পালন করে বা গরু মোটাতাজা করে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন সহযোগী শিল্পের বা কর্মের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন -

- গ্রামীণ পরিবহন, হাল চাষ ও ফসল মাড়াইয়ে গবাদি প্রাণিকে ব্যবহার করে।
- সরাসরি তরল দুধ সংগ্রহ করে তা বাজারে বিক্রি করে এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য যেমন দই, মিষ্টি, ঘি, ছানা ইত্যাদি তৈরি করে। প্রাণি জবাই করে মাংস বিক্রির মাধ্যমে।
- জবাইকৃত প্রাণির চামড়া ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে। প্রাণি চর্বি থেকে সাবান উৎপাদনের মাধ্যমে।
- কাঁচা চামড়া থেকে লেদার তৈরি করে বিভিন্ন ধরনের জুতা, সুটকেস, বেল্ট ইত্যাদি তৈরি করে।
- অনেক দুঃস্থ মহিলা পথে-ঘাটে বাজার থেকে গোবর সংগ্রহ করে শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে বিক্রি করে।

- অনেকে কৃষকের নিকট থেকে সরাসরি গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া কিনে হাটে-বাজারে বিক্রি করে।

১৪.২ মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদায় গবাদি প্রাণির ভূমিকা

শরীরের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন ও শরীর গঠনের জন্য আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। দুধ ও মাংস আমিষ জাতীয় খাদ্য যা আমরা গবাদি প্রাণি থেকে পেয়ে থাকি। মানুষ বা প্রাণির দেহের সঠিক বৃদ্ধির জন্য যেসব অতি প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড দরকার তার সবগুলোসহ দুধের আমিষে অন্যান্য অ্যামাইনো অ্যাসিডও পাওয়া যায়। উদ্ভিদ আমিষে লাইসিন, মিথিওনিন ও সিসটিনের অভাব রয়েছে বিধায় বাচ্চাদের সুষ্টুভাবে বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত দুধ পান করানো উচিত। একইভাবে দুধের চর্বিতে অতি প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিডসহ সব ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো পাওয়া যায়। আমাদের দেশে দুধের জন্য গরু ও মহিষ প্রসিদ্ধ। তবে ছাগল থেকেও দুধ দোহন করা হয়। বাংলাদেশে দুধ ও দুধজাত দ্রব্য খুবই জনপ্রিয়। সরাসরি তরল দুধ বিক্রি করে বহু লোক জীবিকা নির্বাহ করে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের দুগ্ধজাত পণ্য যেমন দই, মিষ্টি, ঘি, মাখন, পনির, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি সুস্বাদু খাবার তৈরি করেও অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে। চকোলেট ও শুষ্ক মিষ্টি তৈরি করে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। এছাড়া পারিবারিক পর্যায়ে ক্ষির, পায়েস, ফিরনি ও বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি করে পারিবারিক প্রয়োজন, আতিথেয়তা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে এসব দুগ্ধজাত দ্রব্য এখনও সমাদৃত।

আদিকাল থেকেই প্রাণির মাংস মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মাংসের স্বাদ ও পুষ্টিমানের জন্য এখনও এ খাদ্যটি জনপ্রিয়। মাংস একটি উৎকৃষ্ট মানের আমিষ জাতীয় খাদ্য যা দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও দেহ গঠনে সহায়তা করে। মাংস দিয়ে নানা ধরনের মজাদার খাদ্য যেমন বার্গার, চপ, কাবাব, কাটলেট, রোস্ট ইত্যাদি তৈরি করা হয়। আমাদের দেশে গরু ও খাসির মাংস খুবই জনপ্রিয়। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস অতি উন্নত মানের। সারা বিশ্বে যার বিশেষ কদর রয়েছে। মাংস ছাড়াও প্রাণির যকৃত, প্লীহা, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, মগজ নাড়িভুঁড়ি খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও মানুষের খাওয়ার অযোগ্য অংশ প্রাণি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মানুষের পুষ্টি চাহিদায় দুধের ভূমিকা

দুধের চর্বি ও চিনি ঃ দুগ্ধচর্বি ও চিনি কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এর বিভিন্ন অনুপাত দ্বারা গঠিত। এরা প্রধানত শরীরে তাপ ও শক্তি প্রদান করে। চর্বি ও চিনি দুধের মধ্যে পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত অনুপাতে বিদ্যমান এবং দুধের মধ্যে এমন অবস্থায় থাকে যা সহজে হজম ও শোষিত হয়।

দুধের প্রোটিন ঃ প্রোটিন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, সালফার ও ফসফরাস দ্বারা গঠিত যৌগ। এরা প্রধানত নতুন কলা গঠন করে ও পুরাতন কলাসমূহের মেরামত করে। এছাড়া টেনডন, চুল, ক্ষুর, রক্ত ইত্যাদি তৈরি করে। দুধে বিদ্যমান প্রোটিন হল কেজিন ও অ্যালবুমিন। যেহেতু প্রয়োজনীয় সকল অ্যামাইনো অ্যাসিড দুগ্ধ কেজিনে বিদ্যমান থাকে সেহেতু কেজিনই হল সম্পূর্ণ প্রোটিন বা অতি দক্ষ প্রোটিন নামে পরিচিত। দুগ্ধ প্রোটিনের ৯৮% শরীর কর্তৃক গৃহীত হয়। ট্রিপটোফেন ও লাইসিন এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল দুগ্ধ প্রোটিন । এ সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড উদ্ভিদ প্রোটিনে থাকে না। শারীরিক বৃদ্ধিতে অত্যন্ত দক্ষতার কারণে দুগ্ধ প্রোটিনকে দক্ষ প্রোটিনই বলা হয় না বরং মূল্যবান প্রোটিনও বলা হয়। শাকসবজি, রুটি ও অন্যান্য উদ্ভিদজাত খাদ্যে যে সমস্ত প্রোটিন থাকে না দুগ্ধ প্রোটিন সে সমস্ত প্রোটিন সরবরাহ করে থাকে। দুগ্ধ প্রোটিনে সকল প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড বিদ্যমান থাকে।

সারণী ১৪.১ ঃ বিভিন্ন প্রজাতির দুধের পুষ্টিমান

প্রজাতি	প্রোটিন (%)	সেস্নহ পদার্থ (%)	ল্যাকটোজ (%)	খনিজ পদার্থ (%)
মানুষ	২.০১	৩.৭৪	৬.৩৭	০.৩০
গাভী	৩.৫৮	৩.৯০	৫.১০	০.৭০
ভেড়ী	৩.১৫	৬.১৮	৪.১৭	০.৯৩
ছাগী	৩.৭৬	৪.০৭	৪.৬৪	০.৮৫
উট	৪.০০	৩.০৭	৫.৫৯	০.৭৭
মহিষ	৪.৩৭	৭.৬৫	৪.৮২	০.৯৪

উৎসঃ দুগ্ধবিজ্ঞান, ডাঃ মোঃ আব্দুল হামিদ মিঞা

দুধের শর্করা ঃ ল্যাকটোজ এমন একটি শর্করা যা কেবল দুধে পাওয়া যায়। ল্যাকটোজ ক্যালসিয়াম আত্তীকরণে এবং দেহে প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।

দুধের খনিজ দ্রব্য ঃ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ দুধে বিদ্যমান। এরা দাঁত ও হাড় গঠন করে এবং অন্যান্য খাদ্যোপাদান পরিপাকে সাহায্য করে।

দুধের ভিটামিন ঃ শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কার্যক্ষম রাখতে এবং শারীরিক বৃদ্ধি, পুষ্টি প্রদান ও প্রজনন ক্ষমতার জন্য এরা অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ। যে কোন সম্পূর্ণ খাদ্যে অন্যান্য খাদ্যোপাদানের সাথে এরা উপযুক্ত অনুপাতে বিদ্যমান থাকে। মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন দুধে বিদ্যমান থাকে।

দুধের পানি ঃ দুধে পর্যাপ্ত পরিমাণে (৮৭%) পানি বিদ্যমান যা শরীরের জন্য অত্যাবশ্যক। সর্বোপরি অন্যান্য পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্যের তুলনায় দুধ উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও দামে সস্তা। সুতরাং সার্বিক বিবেচনায় দুধকে আদর্শ খাদ্য হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়।

মানুষের পুষ্টি চাহিদায় মাংসের ভূমিকা

মাংস উচ্চমান সম্পন্ন সহজপাচ্য পুষ্টির উৎস। এতে বিভিন্ন পুষ্টি সাম্যাবস্থায় আছে। প্রতিদিন খাবারে ১০০ গ্রাম রান্না মাংস সরবরাহ করলে দিনের প্রয়োজনীয় আমিষ পাওয়া যায় এবং প্রায় ২০০ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।

(১) আমিষ ঃ মাংসে অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ দ্বারা আমিষের পুষ্টির মান ধার্য করা হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, খাদ্য তালিকায় যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ মাংস সরবরাহ করা হয় তখন এর আমিষ অন্য কোন প্রতিস্থাপনার আমিষ ছাড়াই বর্ধন ও শরীর বৃদ্ধিতে কাজ চালাতে পারে। অন্য এক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির খাবারে যদি শুধু মাংসই আমিষের উৎস হয় তবুও তাহার জীবনযাপন স্বাভাবিক হয়। পূর্ণবয়স্ক মানুষের যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকা উচিত তা পূরণ করার জন্য মাংসে পর্যাপ্ত পরিমাণ আবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে। রান্না করার ফলে খুব অল্প পরিমাণ অ্যামাইনো অ্যাসিড ক্ষতি হয়।

সারণী ১৪.২ ঃ বিভিন্ন প্রজাতির মাংসের পুষ্টিমান

পুষ্টি উপাদান	গরু	ছাগল	ভেড়া	মহিষ
পানি (%)	৭৪	৭৪	৭৫	৭৯
আমিষ (%)	২২	২২	২১	১৯
চর্বি (%)	৩	৩	৩	১
খনিজ (%)	১	১	১	১
ভিটামিন এ (মি.গ্রাম/১০০ গ্রাম)	২০	১০	১০	--
ভিটামিন সি (মাইক্রো গ্রাম/১০০ গ্রাম)	১৫০০	--	১০০০	--
ভিটামিন ই (মি. গ্রাম/১০০ গ্রাম)	৪০০	৫০০	৫০০	--

উৎসঃ ভেড়া পালন ম্যানুয়াল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

(২) মাংসের শর্করা ঃ মাংসের যে শর্করা থাকে মূলত গ্লাইকোজেন। ইহা প্রধানতঃ যকৃতে সঞ্চিত থাকে। দেহের সঞ্চিত গ্লাইকোজেন অর্ধেক থাকে যকৃতে এবং বাকি অর্ধেক থাকে মাংস ও রক্তে।

(৩) মাংসের চর্বি ঃ বিভিন্ন প্রজাতির চর্বিতে বিভিন্ন রকম পলি সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে যা মানবদেহের অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন যেমন এ, ডি, ই এবং কে এর বাহক এবং দ্রাবক হিসাবে কাজ করে। একই প্রাণির অথবা একই টুকরার বিভিন্ন রকম অংশে চর্বির পরিমাণ বিভিন্ন হয়। মাংসের চর্বি সহচপাচ্য এবং ৫০% শক্তি সরবরাহ করতে পারে। এছাড়া চর্বি মাংসের স্বাদ ও গন্ধ বৃদ্ধি করে।

(৪) মাংসের খনিজ পদার্থ ঃ মাংসের খনিজের উপর পরীক্ষা চালাতে গেলে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাংস ঠান্ডা করলে বা প্রক্রিয়াজাত করলে খনিজ এর গুণাগুণ বা পরিমাণের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। ভাল পুষ্টির সাথে যে সকল খনিজ পদার্থ থাকে বা থাকা প্রয়োজন তার সবই মাংসে বিদ্যমান। মাংস লৌহের একটি উত্তম উৎস যা লোহিত রক্ত তৈরি করতে সাহায্য করে।

১৪.৩ বাংলাদেশে গবাদি প্রাণির উন্নয়নে অন্তরায় সমূহ ও সম্ভাব্য প্রতিকার

অন্তরায় সমূহ

১. সারা দেশে উন্নত জাতের উচ্চ-উৎপাদনশীল গবাদি প্রাণির অপ্রতুলতা এবং প্রজনন কর্মসূচীর সীমাবদ্ধতা।
২. গবাদি প্রাণির পুষ্টি ও খাদ্যের নিম্নমান ও উচ্চ মূল্য পক্ষান্তরে গ্রামে দুধের নিম্ন মূল্য।
৩. প্রাণির পুষ্টি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নির্ভরযোগ্য শস্য রোপন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি।
৪. গবাদি প্রাণির রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও রোগ দমন কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা।
৫. ঔষধ ও টিকার অপর্যাপ্ততা, নিম্ন কার্যকারিতা এবং ক্ষেত্রভেদে উচ্চ মূল্য।
৬. প্রাণি হাসপাতাল ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের সেবা কর্মসূচীর/কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা।
৭. প্রাণিসম্পদ উৎপাদন এবং খামার শিল্প উন্নয়নমুখী সম্প্রসারণ এবং যুগোপযোগী সম্প্রসারণ নীতিমালার অভাব।
৮. নিম্নমান সম্পন্ন গুড়াদুধের অবাধ আমদানী এবং দেশে উৎপাদিত দুধ ও অন্যান্য প্রাণিসম্পদ জাত পণ্যের সুপরিকল্পিত এবং উপযুক্ত বিপনন পরিবেশের অনুপস্থিতি।
৯. গবেষণা, শিক্ষা ও সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে সমন্বয়ের অভাব ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে জটিলতা।
১০. পুঁজি সরবরাহের জটিলতা এবং বাজারজাতকরণের সীমাবদ্ধতা ও উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।
১১. প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের জন্য যথাযথ ডাটা-বেজ ও তথ্য প্রবাহের অভাব।
১২. পৌর এলাকায় গবাদি প্রাণির খামার স্থাপনে আইনগত প্রতিবন্ধকতা।
১৩. জৈব কৃষি বাস্তবায়নে মহল বিশেষের অনীহা এবং প্রয়োজনীয় জন সচেতনতার অভাব।
১৪. দুগ্ধ উৎপাদন এলাকা সমূহে দুগ্ধজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার অভাব।
১৫. প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষে উপযুক্ত ঋণ ব্যবস্থার অভাব।
১৬. প্রাণিদের জন্য বীমা ব্যবস্থা নেই।
১৭. প্রাণি বর্জ্যের উপযোগী রূপান্তর ব্যবস্থার অভাব।

সম্ভাব্য প্রতিকার

১. জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে ডেয়ারী শিল্প মালিক সমিতি গঠন।
২. ব্যক্তিখাত ও সমবায় ব্যবস্থায় দুগ্ধ উৎপাদন এলাকাসমূহে দুগ্ধ সংগ্রহ মজুদকরণ এবং বিতরণের কারখানা এবং হিমায়িতকরণ কারখানা স্থাপন।
৩. উচ্চ শুল্কমূল্য নির্ধারণ করে গুড়োদুধ আমদানী নিরুৎসাহিতকরণ।
৪. মাঠ পর্যায়ে উন্নত প্রাণি চিকিৎসা ও উন্নত রোগ নিরূপণ ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫. মাঠ পর্যায়ে সবধরনের ঔষধ ও টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করণ।
৬. স্বল্পকালীন এবং স্বল্পসুদে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ডেয়ারী শিল্পের উন্নতি সাধন।
৭. সর্বনিম্ন প্রিমিয়ামে গবাদি প্রাণির বীমা ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।
৮. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন তথ্য দপ্তর স্থাপন করে প্রাণিসম্পদ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে তথ্য নির্ভর জরীপ করতে হবে।
৯. স্বাস্থ্য সেবা এবং কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন।
১০. ডেয়ারী অঞ্চল স্থাপন করে শহর ও শহরতলী অঞ্চলসমূহে খড়/ঘাস এর আবাদ, এবং সমবায় ভিত্তিক বিপনন ব্যবস্থার মাধ্যমে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ।

১১. দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যাদি, তাজা খাদ্য, ভিটামিনস ও খাদ্য সম্পুরকের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে স্থাপিত হতে হবে। পন্যাদি বিপননপূর্ব মান সম্পর্কিত সনদপত্র গ্রহন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১২. দুইটি মূল কৃষিপণ্যেও মধ্যবর্তী সময়ে প্রাণিখাদ্যের উপযোগী অন্য কৃষিপণ্যেও চাষ করা।

১৩. স্থানীয় পৌরসভা ও শহরাঞ্চলীয় পৌরসভা সমূহকে জবাইখানা স্থাপন করে প্রাণিবর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা নিতে হবে। এভাবে সংগৃহীত বর্জ্য রূপান্তর কারখানায় পাঠিয়ে উপযোগী পণ্যে রূপান্তরিত করতে হবে যেমন প্রোটিন কনসেনট্রেট, মিট ও বোন মিল ইত্যদি।

মডিউল-১৫ ঃ
গবাদি প্রাণির নামকরণ ও জাত পরিচিতি

১৫.১.১ গবাদি প্রাণির নামকরণ

গবাদি প্রাণির বয়স ও লিঙ্গ ভেদে একই প্রাণির বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। এ ধরনের নামকরণ গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে নিম্নে দেওয়া হলো।

গরু ঃ গরু বলতে স্ত্রী পুরুষ উভয় লিঙ্গের গো - জাতিকে বুঝায়।

- **ষাঁড় ঃ** প্রজননক্ষম পুরুষ গরুকে বুঝায়।
- **গাভী ঃ** অন্ততঃ একবার বাচ্চা প্রসবকারী স্ত্রী গরুকে বুঝায়।
- **বলদ ঃ** প্রজনন শক্তি রহিত পুরুষ জাতীয় গরুকে বুঝায়।
- **বকনা ঃ** প্রায় ১ বছর বয়স থেকে প্রথম বাচ্চা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের স্ত্রী গরুকে বুঝায়।
- **বাছুর ঃ** গাভীর স্ত্রী/ পুরুষ উভয় বাচ্চাকে বুঝায়।
- **এঁড়ে বাছুর ঃ** এক বছরের কম বয়সী পুরুষ বাছুরকে বুঝায়।
- **বকনা বাছুর ঃ** এক বছরের কম বয়সী স্ত্রী বাছুরকে বুঝায়।
- **ইয়ারলিং ষাঁড় ঃ** ১-২ বছর বয়স্ক ষাঁড় বাছুরকে বুঝায়।
- **ষ্ট্যাড ষাঁড় ঃ** প্রজননের জন্য রক্ষিত প্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড়।
- **বিফ ঃ** গরুর মাংসকে বিফ বলে।

মহিষ ঃ স্ত্রী-পুরুষ উভয় মহিষকে বুঝায়।

- **বাফ্যালো কাফ ঃ** মহিষের নবজাতক।
- **বাফ্যালো বুল কাফ ঃ** মহিষের অপ্রাপ্ত বয়স্ক এঁড়ে বাছুর।
- **বাফ্যালো হেইফার কাফ ঃ** মহিষের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বকনা বাছুর।
- **সি বাফ্যালোঃ** গাভী মহিষকে বুঝায়।
- **বাফ্যালো বুলঃ** প্রজননক্ষম প্রাপ্ত বয়স্ক মহিষ ষাঁড়।
- **বাফ্যালো বুলকঃ** খোঁজা করা বা প্রজনন ক্ষমতা রহিত পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ মহিষকে বুঝায়।

১৫.১.২ বিভিন্ন জাত

জাত বলতে এমন একটি বিশেষ প্রাণি বা পাখীর দল বা গোত্রকে বুঝায় যাদের উৎপত্তিস্থল একই এবং যাদের কতগুলি সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যেগুলো বংশ পরস্পরায় চলতে থাকে এবং ঐ প্রজাতির অন্য প্রাণির মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।
উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশে কোন খাঁটি জাত নেই। একমাত্র রেড চিটাগাংকে জাত হিসাবে ধরা হয়।

দুধ উৎপাদন ও অন্যান্য কার্যকারীতার উপর ভিত্তি করে গরুর উলেখযোগ্য জাতসমূহ
ক. দুধাল জাত ঃ হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, জার্সি, ব্রাউন সুইস,গুয়েরেন্সি, শাহীওয়াল, সিন্ধি ইত্যাদি।
খ. মাংসল জাত ঃ বীফমাস্টার, সটহর্ন, ব্রাহমান, অ্যাংগাস, ডেবণ ইত্যাদি।
গ. শ্রমশীল জাত ঃ অমৃতমহল, মালভী, সিরি, কৃষ্ণ ভেলি, ধান্নী ইত্যাদি।
ঘ. দ্বিবিধ উদ্দেশ্য ঃ (দুধ ও মাংস উৎপাদনকারী) জাত যেমন- হারিয়ানা, থারপারকার, রেড পোল ইত্যাদি।

মহিষের উলেখযোগ্য জাতসমূহ
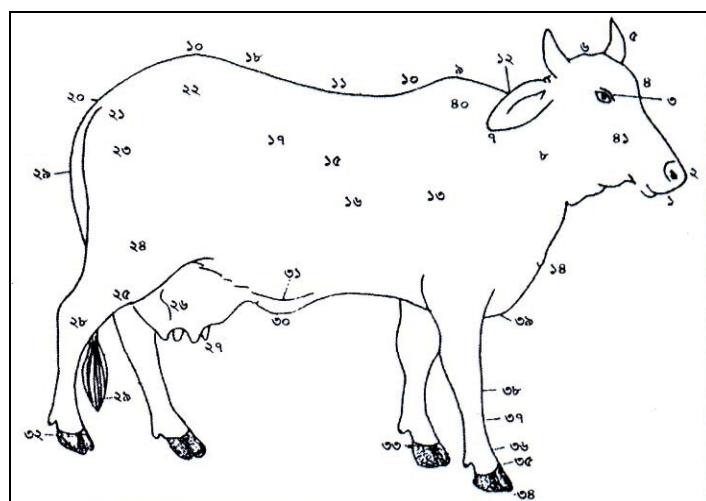
গৃহপালিত মহিষ দুই প্রকার। যথা -

(ক) নদী মহিষ ঃ ১. গুজরাট দলভুক্ত মহিষ ঃ সুরাটি, জাফরাবাদি, মেহসানা
২. মুররাহ দলভুক্ত মহিষ ঃ মুররাহ, নিলি-রাভি, কুন্ডি
৩. উত্তর ভারতীয় মহিষ ঃ ভাদাওয়ারি, টরাই
৪. মধ্য ভারতীয় মহিষ ঃ নাগপুরি, পান্দরপুরি, মন্ডা, সম্বলপুরি
৫. দক্ষিণ ভারতীয় মহিষ ঃ টোডা, দক্ষিণ কানারা

(খ) জলাভূমির মহিষ ঃ কোয়াকামও কোয়াইটুই, কোয়াইপ্র, লাল মহিষ, ম্যারিড।

১৫.২ গবাদি প্রাণির দৈহিক গঠন ও বিভিন্ন অংশের নাম।

১. মুখ, ২. নাকের ছিদ্র ৩. চোখ
৪. কপাল ৫. শিং ৬. পোল
৭. কান ৮. গলা ৯. কুঁজ
১০. শিড়দাঁড়া ১১. পিঠ ১২. স্কন্ধ
১৩. বক্ষ ১৪. গলকম্বল ১৫. বুকের পাশ
১৬. পাঁজর ১৭. ফ্লাঙ্ক(পেটের পাশ) ১৮. কটি
১৯. ক্রুপ ২০. লেজের গোড়া ২১. পিন হাড়
২২. পাছার হাড় ২৩. বাটক (কোমরের হাড়ের সন্ধিস্থল) ২৪. উরু
২৫. স্টাইফল জয়েন্ট ২৬. ওলান ২৭. বাঁট
২৮. হক জয়েন্ট ২৯. লেজের চুল ৩০. নাভি
৩১. দুগ্ধশিরা ৩২. পিছনের ক্ষুর (ডিউ-ক্লু) ৩৩. ক্ষুর
৩৪. কনুইয়ের সন্ধি ৩৫. প্যাস্টার্ন জয়েন্ট ৩৬. ফেটলক
৩৭. ক্যানন হাড় ৩৮. হাঁটু ৩৯.গলকম্লের নিচের হাড় (ব্রিসকেট)
৪০. কুঁজের পাশের হাড়(উইদার) ৪১. চোয়াল

চিত্র ১৫.১ঃ গবাদি প্রাণির দৈহিক গঠন ও বিভিন্ন অংশের নাম

১৫.৩ দেশী জাতের গরুর বৈশিষ্ট্য

আমাদের দেশে অধিকাংশ গরুই দেশী জাতের। এরা আকারে ছোট হয়। একটি প্রাপ্তবয়স্ক গরুর ওজন গড়ে ১৫০ কেজি হয়ে থাকে। দেশী জাতের গরুর কূঁজ উঁচু হয়। একটি দেশী জাতের গাভী হতে দৈনিক ১-৩ লিটার দুধ পাওয়া যায়। এদের কাজ করার ক্ষমতা কম। দেশী জাতের গরুর মধ্যে চট্টগ্রাম এলাকার " লাল চট্টগ্রাম(রেড চিটাগাং)" নামের গরু আছে। পাবনা, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর এবং ঢাকার কিছু এলাকায় দেশী জাতের গরু আছে যেগুলো আকারে কিছু বড় হয় এবং এগুলো থেকে কিছু বেশী দুধ পাওয়া যায়। দেশী জাতের বকনা প্রথম বাচ্চা দিতে ৩.৫-৪ বছর সময় লাগে।
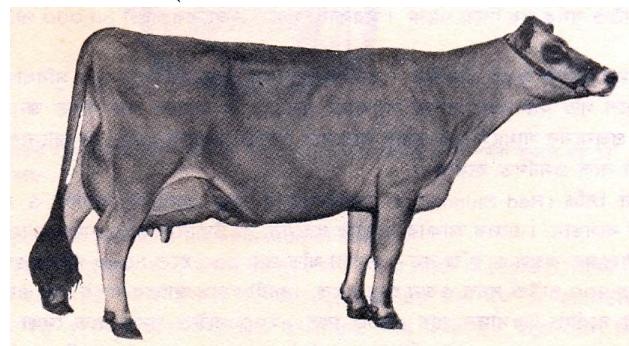
চিত্র ১৫.২ঃ দেশী জাতের গরু(রেড চিটাগাং)

১৫.৪ বিদেশী জাতের গরুর বৈশিষ্ট্য

বিদেশী জাতের গরুর মধ্যে জার্সি, হলস্টিন ফ্রিজিয়ান, গুয়ের্নসি, ব্রাউন সুইস, আয়ারশায়ার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে জার্সি এবং ফ্রিজিয়ান জাতের গরু আমদানি করে প্রজননের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

জার্সি ঃ ইউরোপের চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ জার্সি গাভীর উৎপত্তিস্থল। ইউরোপ ও আমেরিকাসহ পৃথিবীর বহু দেশে এখনও এজাতের গরু পাওয়া যায়। উন্নত জাতের বিদেশী দুধালো গাভীর মধ্যে জার্সির আকার সবচেয়ে ছোট। একটি গাভীর ওজন ৩০০-৪০০ কেজি এবং একটি ষাঁড়ের ওজন ৬০০-৭০০ কেজি হয়ে থাকে। জার্সির গায়ের রং ফিকে লাল এবং গাঢ় বাদামী হয়। মাথা লম্বা,এদের কুঁজ হয় না, ফলে শিরদাড়া সোজা হয়। শরীরে মেদ কম থাকে। এ জাতের গরু অল্প সময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে বাচ্চা ও দুধ দেয়। জন্মের সময় জার্সি জাতের বাচ্চা দুর্বল ও ছোট হয় এবং ওজনও কম হয়। একটি গাভী হতে বছরে ৪০০০-৪৫০০ কেজি দুধ পাওয়া যায়। দুধে চর্বির পরিমাণ ৫%।

চিত্র ১৫.৩ জার্সি জাতের গাভী
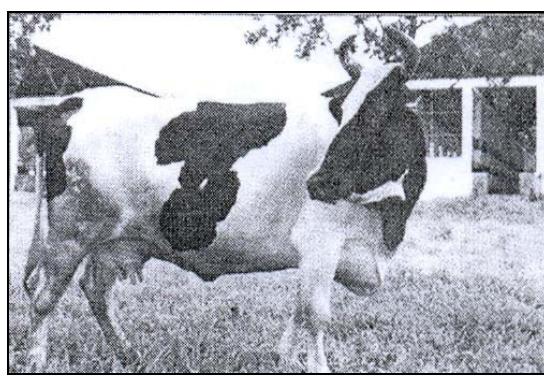
ফ্রিজিয়ান ঃ এ জাতের গরুর বৈশিষ্ট্য এরা আকারে অনেক বড় হয়। এদের কূঁজ উঁচু হয় না। এদের গায়ের রং সাধারণত সাদা-কালো মিশানো হয়। একটি গাভীর ওজন ৫০০-৬০০ কেজি এমনকি আরও বেশী হয়ে থাকে। একটি ষাঁড়ের ওজন ৮০০-৯০০ কেজি হয়ে থাকে। এরা অনেক বেশী দুধ দেয়। একটি গাভী দিনে ৪০ লিটার পর্যন্ত দুধ দেয় এবং বাচ্চা দেয়ার পর থেকে পরবর্তী বাচ্চা প্রদান পর্যন্ত একটানা দুধ দিয়ে থাকে। এদের থেকে মাংসও বেশী পাওয়া যায়। এ জাতের বকনা অল্প বয়সে অর্থাৎ প্রায় ২.৫ বছর বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয় এবং প্রতি বছর বাচ্চা দেয়। জন্মের সময় বাচ্চার ওজন ৩০-৪০ কেজি হয়ে থাকে। দুধে চর্বি পরিমাণ ৪-৪.৫%।

চিত্র ১৫.৪ ঃ ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী

১৫.৫ সংকর জাতের গরুর বৈশিষ্ট্য

উন্নত সংকর জাতের গরু পালন আমাদের দেশের আবহাওয়া উপযোগী। তাই আমাদের দেশে সংকর জাতের গরু উৎপাদনের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এক জাতের ষাঁড়ের সাথে অন্য জাতের বকনা বা গাভীর মিশ্রণে যে বাচ্চা হয় সেটাই সংকর জাতের গরু। আমাদের দেশে দুধরনের সংকর জাতের গরু উৎপাদন করা হয়ে থাকে, যেমন-ফ্রিজিয়ান ষাঁড়ের সাথে শাহীওয়াল বকনা বা গাভীর মিশ্রণে এবং ফ্রিজিয়ান ষাঁড়ের সাথে দেশী বকনা বা গাভীর মিশ্রণে।

চিত্র ১৫.৫ ঃ সংকর জাতের গাভী

বৈশিষ্ট্য ঃ এরা দেশী গরু হতে আকারে অনেক বড় হয়। একটি গাভীর ওজন ৩০০-৪০০ কেজি এবং একটি ষাঁড়ের ওজন ৫০০-৬০০ কেজি হয়ে থাকে। এরা দেশী গাভী হতে অনেক বেশী দুধ দেয়। একটি সংকর জাতের গাভী হতে দৈনিক ২০ - ২৫ লিটার দুধ পাওয়া যায়। এদের থেকে মাংসও বেশী পাওয়া যায়। এরা দেশী গরু অপেক্ষা বেশী কাজ করতে পারে। এ জাতের গরুর বয়ঃপ্রাপ্তিকাল দেশী গরুর চেয়ে আগে হয় এবং প্রথম বাচ্চা প্রদানও আগে হয়।
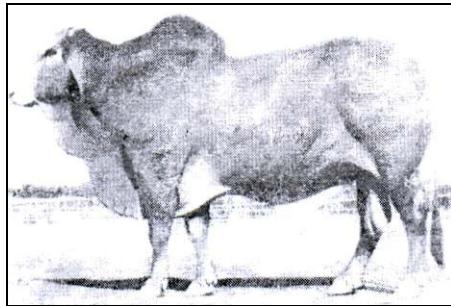
১৫.৬ বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী গবাদি প্রাণি

ভারত ও পাকিস্তানের গরু বাংলাদেশের আবহাওয়ায় পালনের উপযোগী। বর্তমানে আমাদের দেশের বিভিন্ন দুগ্ধ খামারে শাহীওয়াল, সিন্ধি, হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান এবং সংকর জাতের গরু পালন করে। বাংলাদেশের শাহজাতপুর, পাবনা, মুন্সি, মাদারিপুর এবং চট্টগ্রাম এলাকায় উন্নতমানের গবাদি প্রাণি রয়েছে। এ এলাকাগুলোতে অধিক পরিমাণে দুধ উৎপন্ন হয়। এ সমস্ত গবাদি প্রাণি দেশের সাধারণ প্রাণি অপেক্ষা উন্নত। বাংলাদেশী নয় কিন্তু আমাদের দেশের আবহাওয়া উপযোগী কয়টি উন্নত জাতের প্রাণির বর্ণনা নিচে উল্লখ করা হলো।

১। শাহীওয়াল

উৎপত্তিস্থল ঃ শাহীওয়ালের এর অপর নাম মন্তগোরামী। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মন্তগোরামী জেলায় এর আদি বাসস্থান। বাংলাদেশ সহ ভারত উপমহাদেশের সেরা দুধ উৎপাদনকারী গাভী শাহীওয়াল।

বৈশিষ্ট্য ঃ এরা সাধারণত হালকা লাল রং এর হয়ে থাকে। এদের শরীর খুব মোটা-সোটা, পা খাটো, কপাল চওড়া, শিং বেটে ও মোটা, গলকম্বল বড় ও ঝুলানো, ষাঁড়ের কুঁজ উঁচু ও মোটা এবং লেজ খুব লম্বা প্রায় মাটি স্পর্শ করে। একটা পূর্ণ বয়স্ক গাভীর ওজন প্রায় ৪৫০-৫৫০ কেজি এবং ষাঁড়ের ওজন প্রায় ৬০০-১০০০কেজি। গাভীর ওলান খুব বড় এবং প্রায়ই ঝুলন্ত থাকে। জন্মকালে বাছুরের ওজন২২-২৮ কেজি।
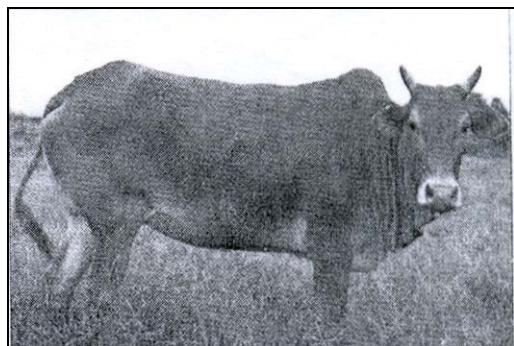
চিত্র ১৫.৬ ঃ শাহীওয়াল ষাঁড়

উপকারিতা ঃ এ জাতটা আমাদের দেশে দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেরা হিসাবে বিবেচিত। দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ৩০০০-৪০০০ লিটার। দুধে চর্বির পরিমাণ গড়ে ৪.৫%। এক কালীন ২৮০ দিন দুগ্ধবতী থাকে। বলদ ও ষাঁড় ষাধারণতঃ ধীর ও অলস প্রকৃতির।

২। লালসিন্ধি

উৎপত্তিস্থল ঃ পাকিস্তান সিন্ধু প্রদেশের করাচী ও হায়দারাবাদে অঞ্চলে এ জাতের আদি বাসস্থান।

বৈশিষ্ট্য ঃ এদের আকার মাঝারি ধরনের, রং টকটকে লাল, কোন কোন সময় কালচে লালও হয়। এদের শিং, গল-কম্বল ও কূঁজ বড়। একটা গাভী প্রায় ৩৫০-৪০০ কেজি ও ষাঁড় প্রায় ৪২৫-৫০০ কেজি ওজনের হয়। জন্মকালে বাছুরের ওজন ২১-২৪ কেজি।
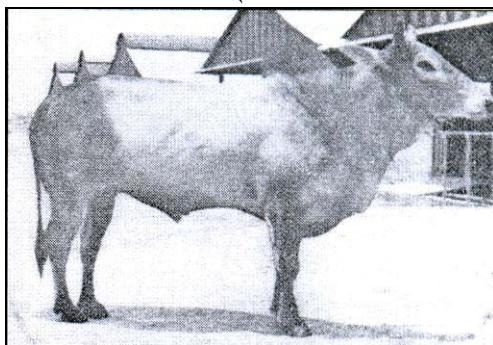
চিত্র ১৫.৭ঃ **সিন্ধি** গাভী

উপকারিতা ঃ এদের উৎপাদন বছরে গড়ে প্রায় ২০০০ কেজি। দুধে চর্বির পরিমাণ গড়ে ৫%। বলদ বা ষাঁড় দ্বারা গাড়ীটানা ও হালচাষ ভালভাবে করা যায়। আকারে মাঝারি বলেএ জাতকে অনেকেই বেশ পছন্দ করে থাকে।

৩। হরিয়ানা

উৎপত্তিস্থল ঃ ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব এর আদি বাসস্থান। বর্তমানে সারা ভারতে এবং পৃথিবীর অনেক দেশে এ জাত বিস্তার লাভ করেছে।

বৈশিষ্ট্য ঃ হরিয়ানা দেখলেই মনে হয় অত্যধিক পরিশ্রমী ও শক্তিশালী। এদের দেহ বড়, রং সাদা বা হালকা ধূসর, শিং বড় এবং পা লম্বা, মাথা বেশ লম্বা ও অপেক্ষাকৃত সরু। গাভীর ওজন প্রায় ৪০০-৫০০ কেজি এবং ষাঁড়ের ওজন প্রায় ৬০০-১১০০ কেজি। জন্মকালে বাছুরের ওজন ২২-২৫ কেজি।
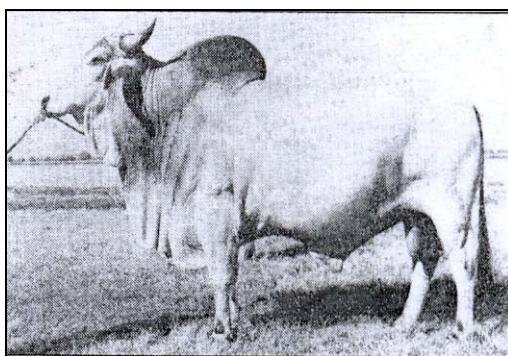
চিত্র ১৫.৮ ঃ হরিয়ানা ষাঁড়

উপকারিতা ঃ হরিয়ানা দুধ ও পরিশ্রম , দুই কাজের জন্যই প্রসিদ্ধ। বছরে দুধ উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে ১৫০০ কেজি। দুধে চর্বির পরিমাণ গড়ে ৫%। এ জাতের গাভী সাধারণতঃ প্রায় ৩০০ দিন দুধ দেয়। তবে এ জাতের দোষ হলো বকনা সাধারণতঃ ৩-৪ বছরের পূর্বে গাভী হয় না।

৪। থারপারকার

উৎপত্তিস্থল ঃ পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের থারপারকার জেলা এদের আদি বাসস্থান।

বৈশিষ্ট্য ঃ থারপারকার বেশ শক্তিশালী গরু। এ জাতের গাভী যেমন অধিক পরিমাণে দুধ দেয়, ষাঁড় ও বলদের দৈহিক গড়ন ও তেমন মজবুত। এদের রং সাদা, আকার মধ্যম, শিং ও কুঁজ মধ্যম আকারের এবং গল কম্বল মাঝারি আকারের। এদের একটা গুণ অল্প আহারে টিকতে পারে।

চিত্র ১৫.৯ ঃ থারপারকার ষাঁড়

উপকারিতা ঃ হারিয়ানার ন্যায় দুই কাজে ব্যবহার হয়। গাভীর দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বছওে গড়ে প্রায় ২০০০ কেজি। দুধে চর্বি পরিমাণ গড়ে ৫%।

উৎসঃ *গাভী পালন গাইড - এ. টি. এম. ফজলুল কাদের
*গৃহপালিত প্রাণিপালন - বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
*বাছুর, গাভী ও ছাগল পালন - বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
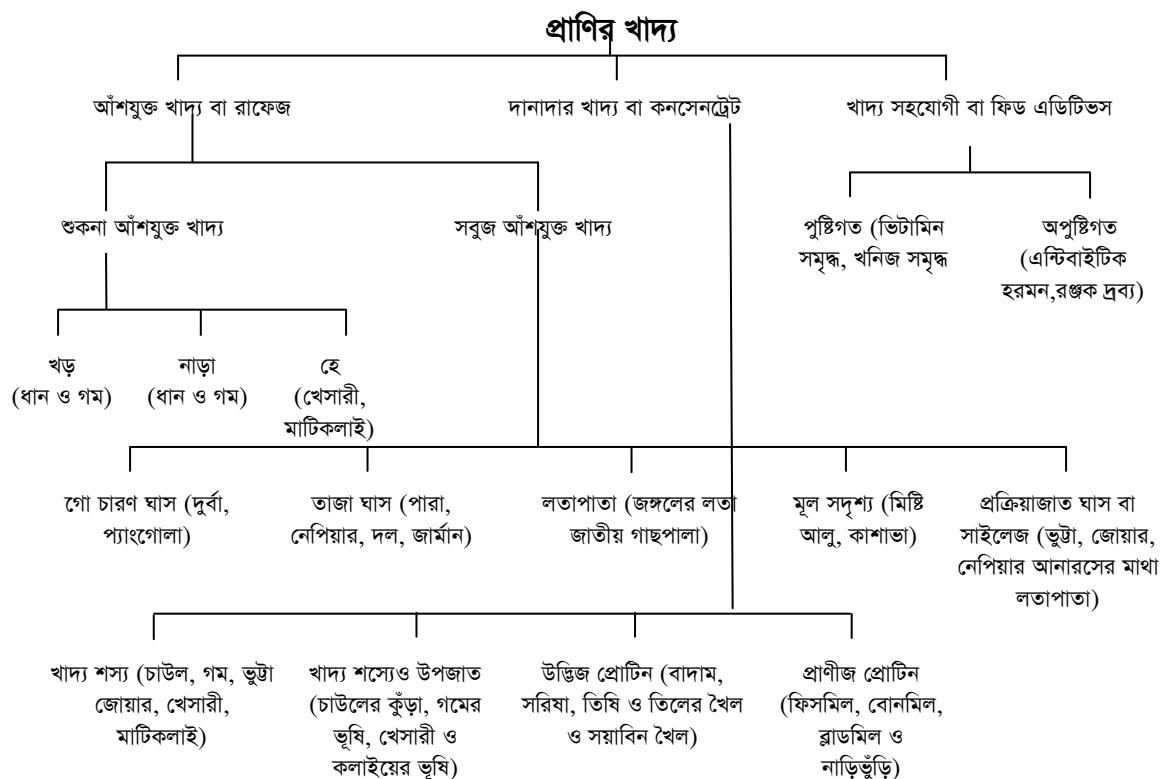
মডিউল-১৬ ঃ
গবাদি প্রাণির খাদ্য ও ঘাস চাষ

আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি প্রাণিদের বেঁচে থাকার জন্য প্রাণি খাদ্যের প্রয়োজন। প্রাণিরা যেসব খাদ্য খেয়ে জীবনধারণ করে সেসব খাদ্যকে প্রাণিখাদ্য বলে। খাদ্য গ্রহণ করে প্রাণির দেহে তাপ উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রাণিকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য খাওয়াতে হয়। কারণ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যে পুষ্টির পরিমাণ থাকে বিভিন্ন ধরনের। যেসব পুষ্টি উপাদান খাদ্যে উপস্থিত থেকে প্রাণীদেহের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে সে উপাদানগুলোকে ৬টি ভাগে ভাগ করা হয়। পুষ্টি উপাদানগুলো হল- পানি, শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ।

প্রাণীদেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন ও প্রাণী থেকে উৎপাদন পেতে হলে তাকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। সুষম খাদ্য প্রস্তুতের পূর্বেই জানতে হবে কোন খাদ্যে কোন ধরনের পুষ্টির পরিমাণ বেশি আছে এবং ঐ খাদ্যগুলো কী পরিমাণে প্রাণিকে সরবরাহ করতে হবে। এজন্য প্রাণিখাদ্যের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।

১৬.১ প্রাণি খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ

চিত্র ১৬.১ প্রাণিখাদ্যের শ্রেণীবিন্যাস

১৬.২ প্রাণীদেহে প্রাণিখাদ্যের কাজ

পানি ঃ প্রাণীদেহের দুই-তৃতীয়াংশ পানি। দেহে এ পানির ৭০% থাকে জীবকোষে এবং ৩০% থাকে জীবকোষের বাইরে ও রক্তে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, জৈব খাদ্য ছাড়া একটি প্রাণি ১০০ দিন বাঁচতে পারে কিন্তু পানি ছাড়া ১০ দিনের বেশি বেঁচে থাকতে পারে না। একটি প্রাণি খাবার পানি ছাড়াও সাধারণতঃ সবুজ ঘাসের মাধ্যমে
৭০%, খড়জাতীয় খাদ্যে ১৫% এবং দানাদার খাদ্যের মাধমে ১০% পানি পেয়ে থাকে। আবার মল, মূত্র, ঘাস ও প্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রাণির দেহ থেকে পানি বের হয়ে যায়।

প্রাণীদেহে পানির কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ
* পানি বিভিন্নভাবে দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন- দেহের অতিরিক্ত তাপ শোষণ করে, দেহের তাপ সৃষ্টিকারী অঙ্গ থেকে তাপ পরিবহন করে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে অথবা মল, মূত্র ও ঘামের সাহায্যে তাপ বের করে দেয়।
* শরীরের জন্য ক্ষতিকর ও বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করে।
* দেহের নির্দিষ্ট স্থানে পুষ্টি উপাদান পৌঁছে দেয়। হরমোন ও এনজাইমের কার্যকারিতায় সহায়তা করে।
* দেহে অভিস্রবণীয় চাপ ও অম্ল ক্ষারের সমতা বজায়সহ বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
* দেহে কোষের গঠন, আকৃতি ও স্থিতিস্থিাপকতা বজায় রাখে।
* টিস্যু ও ফুসফুসের গ্যাসীয় বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট ঃ কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে শর্করা গঠিত। যদিও প্রাণীদেহের ১% শর্করা তবুও এর অভাবে প্রাণীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। কারণ শর্করা দেহে তাপশক্তি ও কর্মশক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে। উদ্ভিদের বেশির ভাগ সেলুলোজ যা খেয়ে প্রাণিরা শর্করা জাতীয় খাদ্যের চাহিদা মেটায়। অতিরিক্ত শর্করা দেহে চর্বি হিসেবে জমা হয়।

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট-এর কাজ
* শর্করা হলো দেহচর্বি ও দুগ্ধচর্বির উৎস। শর্করার প্রধান কাজ হলো প্রাণীদেহে শক্তি সরবরাহ করা।
* চর্বি ও আমিষ প্রাণীদেহে কাজে লাগাতে শর্করা সহায়তা করে। অতিরিক্ত শর্করা দেহে চর্বি হিসেবে জমা হয় এবং খাদ্যে শর্করার ঘাটতি থাকলে এ জমাকৃত চর্বি থেকে প্রাণি শক্তি পেয়ে থাকে।
* শর্করা দেহে বিভিন্ন প্রকার জৈব সংশ্লেষণের সূত্রপাত ঘটায়। যেমন ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করে। শর্করা প্রাণীদেহের অনেক জৈব উপাদানের গাঠনিক উপাদান হিসেবে অবদান রাখে।

আমিষ বা প্রোটিন ঃ আমিষ একটি জটিল জৈব যৌগ যা সাধারণতঃ কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নিয়ে গঠিত। প্রোটিনের একককে অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে। সাধারণতঃ ২০টি অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা প্রোটিন অণু গঠিত হয়।
আমিষ ও প্রোটিনের কাজ
* দেহের গঠন, ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে।
* দেহের রক্ত, পেশী ও সংযোগকলার প্রধান অংশই প্রোটিন দ্বারা গঠিত।
* বাচ্চা ও গর্ভবতী প্রাণিতে প্রোটিন সঞ্চিত থাকে এবং প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হয়।
* দুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় ও দুগ্ধ প্রোটিন তৈরি করে।
* বিভিন্ন ধরনের হরমোন, এনজাইম ও এন্টিবডি তৈরিতে সহায়তা করে।
* শর্করার মত প্রোটিন থেকেও শক্তি পাওয়া যায়।
* প্রজনন, উৎপাদন, শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকার জন্য অপরিহার্য।

চর্বি বা ফ্যাট ঃ চর্বি বা ফ্যাট হলো ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের সমন্বয়ে গঠিত একটি জৈব যৌগ। চর্বি বা ফ্যাট কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন-এর সমন্বয়ে গঠিত। তবে শর্করার তুলনায় ফ্যাট-এ কার্বন ও হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেশি থাকে। কার্বনের পরিমাণ বেশী থাকে বলে ফ্যাট শর্করার তুলনায় প্রায় ২.৫ গুণ বেশি শক্তি দেয়।

চর্বি বা ফ্যাট এর কাজ

* প্রাণীদেহে চর্বি সঞ্চিত শক্তি হিসেবে জমা থাকে। দেহের শক্তির অভাব দেখা দিলে চর্বি ভেঙ্গে শক্তি উৎপন্ন হয়।
* দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে আঘাত থেকে রক্ষা করে।
* চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন শোষণে সাহায্যে করে।
* চর্বি কার্বোহাইড্রেটের তুলনায় প্রায় ২.৫ গুণ বেশি শক্তি সরবরাহ করে।
* প্রজননতন্ত্রে বিভিন্ন হরমোন জাতীয় পদার্থের প্রিকরসর হিসেবে কাজ করে।
* ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যামোনিয়া থেকে যকৃতে কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষিত হয়।
* খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি করে।
* পশমের উপর চর্বির আস্তরণ থাকে বিধায় পরিমিত চর্বি শরীর সুন্দর ও সতেজ রাখে।

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন ঃ ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ এক ধরনের জৈবযৌগ যা প্রাণীদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। যদিও ভিটামিন দেহের কোন গাঠনিক উপাদান নয় এমনকি শক্তিও সরবরাহ করতে পারে না তবুও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের পাশাপাশি খাদ্যে ভিটামিন না থাকলে প্রাণির জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। দ্রবণীয়তার উপর নির্ভর করে ভিটামিনকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন - চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (এ, ডি, ই, কে) এবং পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (বি$_{১}$, বি$_{২}$, বি$_{৩}$, বি$_{৬}$, বি$_{৯}$, বি$_{১২}$, ভিটামিন সি এবং বায়োটিন) বিভিন্ন ধরনের খাদ্যপ্রাণ প্রাণির শরীরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

খাদ্যপ্রাণের সাধারণ কাজ সমূহ-

* শরীরের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজ সমাধা করে।
* প্রজনন কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
* চোখের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখে।
* হাড় গঠনে সহায়তা করে।
* শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য খাদ্যপ্রাণ অপরিহার্য।

খনিজ দ্রব্য ঃ যে সমস্ত অজৈব পদার্থ প্রাণীদেহের স্বাভাবিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য খুবই সামান্য পরিমাণে দরকার হয় কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাদের অভাব দেখা দিলে কতগুলো নিদির্ষ্ট রোগের লক্ষণ দেখা যায় তাদেরকে খনিজ পদার্থ বলে। কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহের টিস্যুকে সম্পূর্ণরুপে পোড়ানোর পর যে অবশিষ্ট ছাই হিসাবে পাওয়া যায় তাই খনিজ পদার্থ। প্রাণীদেহের প্রায় ৩% খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত খনিজ পদার্থের মধ্যে ১৬-১৮ টি প্রাণীদেহে দরকার হয়। এর মধ্যে ৭টি (ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্লোরিন ও সালফার) বেশী পরিমানে দরকার হয় যাদের ম্যাক্রো মিনারেল বলা হয়। এছাড়াও কিছু কিছু খনিজ পদার্থ আছে যা খুব অল্প পরিমাণে খাদ্যের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হয়। এ ধরনের খনিজ পদার্থকে মাইক্রো মিনারেল বলা হয়। যেমন- আয়রন, জিঙ্ক, কপার, আয়োডিন, কোবাল্ট, মলিবডেনাম, ফ্লুরিন ইত্যাদি।

বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য প্রাণির শরীরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন-
* শরীরের কাঠামোর আকার, শক্তি ও সামর্থ প্রদান করে।
*শরীরের গাঠনিক উপাদানের অন্যতম উপকরণ।
* শরীরের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করে।
* রক্তের অন্যতম উপাদান।
* খাদ্য হজমে এনজাইমের কাজ তরান্বিত করে।
* বাচ্চা উৎপাদন ও দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য অত্যাবশ্যক।
* রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে।

১৬.৩ ঘাস চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

আমাদের দেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘন বসতি পূর্ণ দেশ তাই খাদ্য শস্য, ফল-ফলাদি ও শাক-শব্জি চাষের তুলনায় বর্তমানে অল্প জমিতে বেশী উৎপাদন পেতে হলে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ উপখাত প্রাণিসম্পদ খাতকে (ডেয়রী ও পোল্ট্রি শিল্প) বিকাশ ঘটানোর বেশী প্রয়োজন। মানব দেহের সুষ্ঠু বিকাশ ও স্বাস্থ্য সুস্থ্য রাখতে যেমন মাংস, দুধ ও ডিমের প্রয়োজন ঠিক তেমনি ভাবে মেধা ও মন বিকাশের জন্য দুধের প্রয়োজন। একজন মানুষের দৈনিক দুধের চাহিদা ২৫০ মি.লি.। আমাদের দেশে মাথা পিছু দুধের প্রাপ্যতা ৩৮ মি.লি.। সে মোতাবেক বছরে মোট দুধের প্রয়োজন ১২২.৫ কোটি লিটার এবং উৎপাদন ১৯.৯৭ কোটি লিটার। বছরে মোট ঘাটতি ৮৩.৭%।

বাংলাদেশে বর্তমানে মোট গবাদি প্রাণির সংখ্যা ২৪.২২ মিলিয়ন। তার মধ্যে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা প্রায় ৬.০৫ মিলিয়ন। সংখ্যার দিক থেকে পর্যাপ্ত হলেও উৎপাদনের দিক থেকে অপ্রতুল। বর্তমানে বাংলাদেশের গাভীর গড় উৎপাদন ক্ষমতা ১.৫ লি./দৈনিক। শংকরায়ণের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন করে প্রতিটি গাভীর গড় উৎপাদন ক্ষমতা ৮.০০ লি./দৈনিক করতে পারলে বর্তমান গাভীর সংখ্যা দ্বারাই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। দেশ ব্যাপি কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চালু আছে, এই কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে উন্নত জাতের গাভী উৎপাদন করা সম্ভব। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়নে বর্তমানে যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে তা হলো প্রাণি খাদ্য সংকট। কারণ কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে যে বাছুর/গাভী তৈরী হচ্ছে তাদের খাদ্য চাহিদা মেটানো সম্ভব না হওয়াতে কৃত্রিম প্রজননের সার্বিক সফলতা কাংখিত মাত্রায় পাওয়া যাচ্ছে না। গবাদি প্রাণির খাদ্যের প্রধান উৎস হলো কাঁচা ঘাস ও খড়। বর্তমানে দেশে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষের ফলে ধান গাছের উচ্চতা আগের তুলনায় ৩/৪ গুন কম । পাশাপাশি ছোট ধান গাছে অধিক ধান উৎপাদনের ফলে খড়ের পুষ্টিমানও আগের তুলনায় কমে গেছে। বর্তমানে ধান চাষের প্রতি কৃষকরা ঝুকে পড়াতে রবি মৌসুমে ডাল জাতীয় ফসল চাষের পরিমাণ আগের তুলনায় কয়েক গুন কম। ফলে উচ্চ পুষ্টি মান সম্পন্ন ডাল জাতীয় ফসলের খড়ও এখন আর গবাদি প্রাণির খাদ্য হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে না। সে জন্য কাঁচা ঘাসই গবাদিপ্রাণির প্রধান খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। আগে ঘাস চাষের উৎস ছিল চারণ ভূমি বা পতিত জমি। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য বসত বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার,স্কুল-কলেজ ইত্যাদি তৈরীতে চারণ ভূমি বা পতিত জমি ব্যবহার হচ্ছে ফলে গবাদিপ্রাণির কাঁচা ঘাস প্রাপ্তির উৎস এখন আর নেই বললেই চলে। তাই অল্প জমিতে বেশী উৎপাদন পেতে উন্নত জাতের ঘাস চাষের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। উন্নত জাতের ঘাসের মধ্যে নেপিয়ার, পারা, জার্মান, জাম্বু ঘাস গো-খাদ্য হিসাবে ভুট্টা, মাটি কলাই, খেসারী চাষ ইত্যাদি ঘাস চাষের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

১৬.৪.১ গবাদি প্রাণির খাদ্যে কাঁচা ঘাস সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা

গবাদি প্রাণিকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস সরবরাহ করলে নিম্ন লিখিত লাভ হয়।

- অধিক দুধ পাওয়া যায়।
- খাদ্য খরচ কম হয়।
- সুস্থ্য-সবল বাছুর জন্ম দেয়।
- কৃত্রিম প্রজননের সফলতা পাওয়া যায়।
- সঠিক বয়সে যৌন পরিপক্কতা আসে।
- জন্মের সময় বাচ্চার মৃত্যু হার খুবই কম হয়।
- দানাদার খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কম হয় ফলে উৎপাদন ব্যয় কমে যায়।
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে যে বাছুর জন্ম নেয় তার দৈহিক ওজন কাংখিত মাত্রায় পাওয়া যায়।
- লাভ বেশী হয় ফলে কৃষক গাভী পালনে উৎসাহিত হয়।
- উন্নত জাতের একটি গাভী পালন করে ছোট একটি সংসার চালনো যায় ফলে দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব হয়।
- রোগ-ব্যাধি কম হয় ফলে চিকিৎসা খরচ খুবই কম হয়।
- ঔষধ খরচ কম হয়।
- গাভীর মৃত্যু হার খুবই কম হওয়াতে আর্থিক ক্ষতি হয় না।
- দুধ উৎপাদন বেশী হলে গরিব কৃষক দুধ বিক্রয়ের পাশাপাশি নিজেরাও দুধ খেয়ে থাকে ফলে তাদেরও স্বাস্থ্য সুস্থ থাকে।
- এক একর জমিতে ধান চাষ করে যে লাভ পাওয়া যায় ঘাস চাষ করলে তার চেয়ে কয়েক গুন বেশী লাভ পাওয়া যায়।

১৬.৪.২ কাঁচা ঘাস না খাওয়ানোর অপকারিতা।

- দুধ উৎপাদন কম হয়।
- অপুষ্টিতে ভোগে ফলে রোগ-ব্যাধি বেশী হয়।
- প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- ঘন ঘন কৃত্রিম প্রজনন করতে হয়।
- গর্ভপাতের পরিমাণ বেড়ে যায়।
- দূর্বল ও কম ওজনের বাছুরের জন্ম হয়। ফলে বাছুরের মৃত্যু হার বেড়ে যায়।
- পরবর্তীতে অপুষ্টিতে ভোগার কারনে বাছুরের মৃত্যু হার বেড়ে যায়।
- যৌন পরিপক্কতা দেরিতে আসে।
- মাংস উৎপাদন কম হয় এবং মাংসের গুনগত মান নিম্নমানের হয়।
- দূর্বলতার কারণে রোগ-ব্যাধি বেশী হওয়াতে চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যায় এবং ঔষধের খরচও বেড়ে যায়। রোগ হওয়াতে উৎপাদন কমে যায় ফলে আর্থিক ক্ষতি হয়।
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জন্মানো বাছুরের পরবর্তীতে আশাতিত ওজন পাওয়া যায় না। ফলে আশানুরূপ উৎপাদনও পাওয়া যায় না।
- দানাদার খাদ্য বেশী দরকার হয় ফলে গাভী পালনের খরচ বেড়ে যায়।

১৬.৫ বিভিন্ন ধরনের ঘাস চাষ পদ্ধতি (নেপিয়ার, পারা, গিনি, জার্মান, ভুট্টা ইত্যাদি)

নেপিয়ার ঘাস চাষ পদ্ধতি

স্থায়ী ঘাসের মধ্যে নেপিয়ার উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় নেপিয়ার খুব ভাল হয়। কচি অবস্থায় পুষ্টিমান বেশী থাকে। গবাদি প্রাণির জন্য নেপিয়ার অত্যন্ত উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য।

চাষ পদ্ধতি ঃ প্রায় সব রকম মাটিতেই হয় তবে উঁচু ও বেলে-দোঁআশ মাটি সবচেয়ে ভাল। ডোবা, জলাভূমি, পানি জমে থাকে এরকম স্থানে ভাল হয় না। জমিতে ৪/৫টি চাষ দিয়ে আগাছা বেছে নিয়ে ঘাসের কান্ড অথবা শিকড়সহ মুথা মাটিতে পুঁততে হয়।

চিত্র ১৬.২ ঃ নেপিয়ার ঘাস

রোপণ প্রণালী ও সময় ঃ সারাবর্ষা মৌসুমেই রোপণ করা যায়। বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে প্রথম বৃষ্টির সময় রোপণ করলে প্রথম বছরেই ৩-৪ বার কাটা যায়। কান্ড লাগানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন রোপণকৃত কান্ডে দুইটি গিড়া থাকে। এ ঘাস সারিবদ্ধ ভাবে লাগাতে হয়, এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব ১.৫ - ২ ফুট ও সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব ১-১.৫ ফুট। চারার গোড়া মাটি দিয়ে শক্ত করে চাপা দিতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে চারা লাগানোর পর পরই পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচ ঃ বর্ষার সময় সেচের প্রয়োজন নেই। চারা লাগানোর আগে জমি তৈরীর একত্রে ২০০০-২৫০০ কেজি গোবর সার ছিটিয়ে ভাল করে মাটিতে মিশিয়ে দিলে ফলন ভাল হয়। এছাড়া একর প্রতি ৩৫ কেজি ইউরিয়া, ২৬ কেজি টি এস পি ও ২০ কেজি এম পি দেওয়া ভাল। প্রতিবার ঘাস কাটার পর একর প্রতি ২৬ কেজি ইউরিয়া দিলে ফলন ভাল পাওয়া যায়। সার ছিটানোর পূর্বে দুই সারির মাঝখানে লাংগল বা কোদাল দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে।

ফসল কাটা ও ফলন ঃ প্রথম লাগানোর ৪০-৫০ দিন পরেই ঘাস কেটে খাওয়ানো যেতে পারে। গোড়ায় ২-৩´´ রেখে ঘাস কাটতে হবে। বছরে ৮-১০ বার কাটা যায়। একর প্রতি ৬০,০০০-৬৫,০০০ কেজি কাঁচা ঘাস হতে পারে। পৌষ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত শীতের সময় শুষ্ক আবহাওয়ার দরুন ঘাসের ফলন কমে যায়। তবে সেচের ব্যবস্থা থাকলে ভাল ফলন পাওয়া যেতে পারে।

খাওয়ানোর নিয়ম ও সংরক্ষণ ঃ জমি থেকে কেটে এনে টুকরা করে খাওয়ানোই উত্তম। তাছাড়া খড়ের সাথে মিশিয়েও খাওয়ানো যায়। শুকিয়ে রাখা সুবিধাজনক নয় তবে সাইলেজ করে সংরক্ষণ করা যায়।

পারা ঘাস চাষ পদ্ধতি

পারা এক প্রকার স্থায়ী ঘাস। একবার রোপণ করলে কয়েক বছর পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

চাষ পদ্ধতি ঃ পারা ঘাস উঁচু, নীচু, ঢালু, জলাবদ্ধ, স্যাঁতসেতে এমনকি লোনা মাটিতেও যেখানে অন্যকোন ফসল হয় না সেখানে পারা ভাল জন্মে। জমি চাষ পদ্ধতি নেপিয়ার ঘাসের মতই।

চিত্র ১৬.৩ ঃ পারা ঘাস

রোপণ প্রণালী ও সময়ঃ বর্ষার সময় সারি করে লাগাতে হয়। দুই সারির মধ্যবর্তী দূরত্ব ১.৫ ফুট। তবে এই ঘাসের সারি থেকে সারিতে কাটিংয়ের দূরত্ব তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই ঘাসের কাটিং বা মুথা লাগানো যায়।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচঃ ঘাস লাগানোর ২-৩ সপ্তাহ পর একর প্রতি ৩৫কেজি ইউরিয়া দিতে হয়। পারা ঘাস পচা গোবর বা গো-শালা ধোয়া পচা পানিতে খুব ভাল হয়। রাসায়নিক সারের অভাবে ঘাস কাটার পর পচা গোবর জমিতে ছিটিয়ে দিলেও ভাল ফলন পাওয়া যায়। প্রতিবার ঘাস কাটার পর একর প্রতি ৩০-৩৫ কেজি ইউরিয়া দিলে ফলন বেশী হয়।

ঘাস কাটা ও ফলনঃ লাগানোর ৪০-৫০ দিন পরই ঘাস কেটে খাওয়ানো যায়। পরে অবস্থা অনুযায়ী ৪-৭ সপ্তাহ পর পর ঘাস কাটা যাবে। একর প্রতি বছরে উৎপাদন ৪০,০০০-৪৫,০০০ কেজি। গোড়া থেকে ৪-৫˝ রেখে কাটতে হয়।

খাওয়ানোর নিয়ম ও সংরক্ষণঃ এ ঘাস মাঠে গরু চড়িয়ে অথবা কেটে এনে খাওয়ানো যায়। তবে জমি থেকে কেটে এনে খাওয়ানোই ভাল। শুকিয়ে রাখা ভাল নয় তবে সাইলেজ করে রাখা যায়।

গিনি ঘাস চাষ পদ্ধতি

গিনি ঘাস দেখতে অনেকটা ধান গাছের মত। পারা ও নেপিয়ারের তুলনায় জলীয় ভাগ কম এবং খাদ্যমান বেশী।

চাষ পদ্ধতিঃ গিনি ঘাস উঁচু ও ঢালু জমিতে হয়। জলাবদ্ধ স্যাঁতসেতে এবং নীচু জমিতে ভাল হয় না। এ ঘাস ছায়াযুক্ত স্থানেও হয়। জমিতে ৪/৫ টি চাষ দিয়ে নেপিয়ারের মত সারিবদ্ধভাবে লাগাতে হয়।

রোপণ প্রণালী ও সময়ঃ বর্ষা মৌসুমে লাগাতে হয় তবে বেশী বৃষ্টি বা জলাবদ্ধ অবস্থায় চারার গোড়া পঁচে

মরে যেতে পারে। মাটিতে পর্যাপ্ত রস বা সেচের ব্যবস্থা থাকলে গ্রীষ্মে প্রথমে রোপণ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। গিনি ঘাসের বীজ বা কান্ড দু'ই লাগানো যায়। সারিবদ্ধ ভাবে লাগাতে হয়। দুই সারির মধ্যবর্তী দূরত্ব ১.৫-২ ফুট ও চারা থেকে চারার দূরত্ব ১-১.৫ ফুট। কান্ড লাগানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কান্ডের খন্ডিত অংশে কমপক্ষে দুইটি গিড়া থাকে।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচঃ জমি তৈরীর সময় একর প্রতি ৪০০০ কেজি গোবর সার দিতে হবে। প্রতিবার ঘাস কাটার পর একর প্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া দিলে ফলন বেশী হয়।

ঘাস কাটা ও ফলনঃ নেপিয়ার ঘাসের মত কাটা যায়। ফলন একর প্রতি ৩০,০০০-৩৫,০০০ কেজি।

খাওয়ানোর নিয়ম ও সংরক্ষণঃ কেটে খাওয়ানোই ভাল। খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যায়। এই ঘাস শুকিয়ে রাখা যায়।

জার্মান ঘাস চাষ পদ্ধতি

জার্মান এক প্রকারের স্থায়ী ঘাস। কান্ড বা মুথা লাগাতে হয়।

চাষ পদ্ধতিঃ এই ঘাস খাল, বিল, নদীর ধার, বা জলাবদ্ধ জমিতে ভাল হয়। নেপিয়ার ঘাসের মতই জমি তৈরী করে ঘাসের মুথা বা কাটিং লাগানো যায়।

চিত্র ১৬.৪ ঃ জার্মান ঘাস

রোপণ প্রণালী ও সময়ঃ বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাস এ ঘাস রোপণ করার উপযুক্ত সময়। নেপিয়ার ঘাসের মতই সারিবদ্ধ করে লাগানো হয়।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচঃ এ ঘাসের জমি সব সময় ভেজা থাকতে হয়। জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ গোবর সার দিতে পারলে ঘাস লাগানোর ২-৩ সপ্তাহ পর একর প্রতি ৩০-৩৫ কেজি ইউরিয়া দিতে হবে। তাছাড়া প্রতিবার ঘাস কাটার পর একর প্রতি ৩০-৩৫ কেজি ইউরিয়া দিতে হয়।
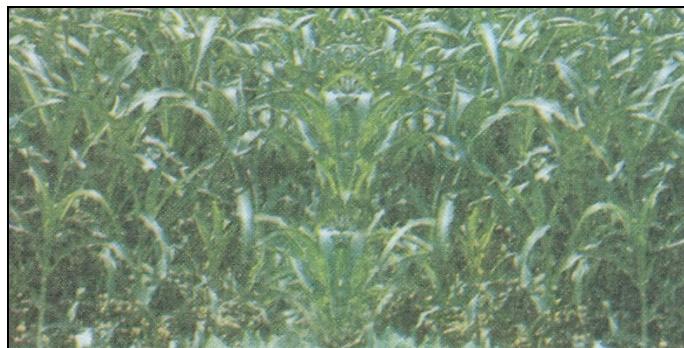
ঘাস কাটা ও ফলনঃ ঘাস লাগানোর ৪৫-৬০ দিন পরই প্রথমবার কাটা যায়। পরবর্তীতে ৪/৫ সপ্তাহ পর পর কাটা যাবে। ফলন বছরে একর প্রতি ৪০,০০০-৪৫,০০০ কেজি ঘাস পাওয়া যেতে পারে।

খাওয়ানোর নিয়ম ও সংরক্ষণঃ ঘাস কেটে এনে খাওয়ানোই উত্তম। শুকিয়ে রাখা ভাল নয় তবে সাইলেজ করে রাখা যায়।

ভুট্টা ঘাস চাষ পদ্ধতি

ভুট্টার কচি সবুজ গাছ গবাদি প্রাণির অত্যন্ত পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য। আমাদের দেশে এখন প্রচুর ভুট্টা চাষ হচ্ছে।

চাষ পদ্ধতিঃ উঁচু/নীচু কিন্তু পানি জমে থাকে না এরকম জমিতে ভুট্টার চাষ করা যায়। বছরের সকল সময়ই ভুট্টার চাষ করা যেতে পারে। নীচু জমিতে বর্ষার পানি চলে যাওয়ার পর এবং উঁচু জমিতে সেচের ব্যবস্থা থাকলে একই সময়ে কার্তিক অগ্রাহণ মাসে ভুট্টার চাষ করা যায়। শীতের শেষে ফাল্গুন-চৈত্র মাসেও পানি সেচ দিয়ে বা বৃষ্টি হওয়ার পর ভুট্টার বীজ বোপন করা যায়। ভুট্টা অধিক শীত ও অধিক বৃষ্টি কোন অবস্থাতেই ভাল জন্মে না। বীজ বপনের আগে ৫/৬ বার জমি চাষ করে জমি তৈরী করতে হবে। একর প্রতি ১৫-২০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

চিত্র ১৬.৫ ঃ ভুট্টা ঘাস

বপণ প্রণালী ঃ সারিবদ্ধ ভাবে বপন করা ভাল। দুই সারির মধ্যবর্তী দূরত্ব ১ ফুট ও ১´´ পর পর বীজ বপন করতে হয়। ক্ষেত সব সময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচ ঃ জমি তৈরীর সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে গোবর সার প্রয়োগ করা যায়, অতিরিক্ত একর প্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া, ২০ কেজি টি এস পি ও ১০ কেজি এম পি প্রয়োগ করলে ফলন ভাল পাওয়া যায়। জমিতে রস না থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

খাওয়ানোর নিয়ম ও সংরক্ষণ ঃ গাছের উচ্চতা ২-২.৫ ফুট হলেই ঘাস হিসাবে কেটে খাওয়ানো যায়। কিন্তু বীজ করলে গাছের উচ্চতা ১.৫ ফুট হলেই এক সারি পর পরবর্তী সারির গাছ তুলে ফেলতে হবে যা গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। অবশিষ্ট সারি সমূহের গাছ ৮´´ পর পর রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে। এর ফলে বীজ করার জন্য রেখে দেওয়া গাছগুলো সঠিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। বীজের জন্য রাখা গাছগুলোর গোড়ায় ভালভাবে মাটি দিতে হবে। ভুট্টা গাছ সাইলেজ করে সংরক্ষণ করা যায়।

উৎস ঃ

*গাভী পালন গাইড - এ. টি. এম. ফজলুল কাদের
*উচ্চতর প্রাণি বিজ্ঞান - এস এম ইমাম হুসাইন
* কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস চাষ ম্যানুয়েল - প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মডিউল-১৭ ঃ
বিশেষ ধরনের প্রাণিখাদ্য উৎপাদন প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি

১৭.১ ইউরিয়া মেলাসেস স্ট্র (ইউ এম এস) প্রস্তুতকরণ

এটি ইউরিয়া, মোলাসেস এবং খড় (স্ট্র) এর একটি মিশ্রিত খাবার যা গরুকে প্রতিদিন শুকনা খড়ের পরিবর্তে চাহিদা মত খাওয়ানো যায়। খাদ্যটিতে খড়, চিটাগুড় বা মোলাসেস ও ইউরিয়া এর অনুপাত যথাক্রমে ৮২:১৫:৩।

ইউ, এম, এস, তৈরী

ইউ এম এস তৈরীর প্রথম শর্ত হল এর উপাদানগুলির অনুপাত সর্বদা সঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ ১০০ ভাগ ইউ,এম,এস এর শুষ্ক পদার্থের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস এবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে । এ হিসাব মতে ১০০ কেজি শুকনা খড়, ঘনত্বের উপর নির্ভর করে ২১-১৪ কেজি ইউরিয়া মিশালেই চলবে । খড় ভিজা বা মোলাসেস পাতলা হলে উভয়ের পরিমাণই বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রথমে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়ার পরিমাণ মেপে নিতে হবে । বিভিন্ন পরিমাণ খড়ের সহিত ইউরিয়া ও মোলাসেস কি পরিমাণ মিশাতে হবে তার একটি সারণী (১৭.১) নিম্নে দেয়া হল। মোলাসেস ওইউরিয়া ওজনের পর প্রয়োজন মত পরিষ্কার পানিতে (সাধারণত ৪০-৬০কিলো)এমন ঘনত্বে মিশাতে হবে যাতে সম্পূর্ণ দ্রবণটুকু খড়ের সাথে সহজে মিশানো যায় । পানি বেশী হলে দ্রবণটুকু খড় চুষে নিতে পারবে না আবার কম হলে দ্রবণ ছিটানো সমস্যা হবে। শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে আস্তে ঝরণা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে,এবং সাথে সাথে খড়কে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড় দ্রবণ চুষে নেয় । এ ভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণ সমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে । ওজন করা খড়ের সাথে পুরো দ্রবণ মিশিয়ে নিলেই ইউ.এম.এস প্রাণিকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয় ।

চিত্র ১৭.১ ঃ ইউ এম এস প্রস্তুত করণ

অন্য ভাবে ও ইউ এম এস তৈরী করা যায় । এ পদ্ধতিতে যে কোন প্রকার পাত্রে ওজন করা মোলাসেস ও ইউরিয়াতে পরিমাণ মত পানি দিয়ে দ্রবণ তৈরী করে নিতে হবে । তারপর সারণী (১৭.১) তে উল্লেখিত হিসাব মোতাবেক ওজন করা খড় এমন ভাবে ভিজাতে হবে যাতে পুরো দ্রবণটি শুষে নেয় । উক্ত যে কোন উপায়ে তৈরী ইউরিয়া মোলাসেস খড় সঙ্গে সঙ্গে গরুকে খাওয়ানো যায় অথবা একবারে ২/৩ দিনের তৈরী

খড় সংরক্ষণ করে আস্তে আস্তে খাওয়ানো যায়। তবে কোন অবস্থাহে খড় বানিয়ে তিন দিনের বেশী রাখা উচিৎ নয়। কারণ তাতে খড়ে ইউরিয়া এবং মোলাসেস এর পরিমাণ কমতে থাকবে।

সারণী ১৭.১ ঃ ইউ.এম.এস তৈরীর জন্য বিভিন্ন উপাদানের আনুপাতিক হার

শুকনো খড় (কেজি)	পানি (লিটার)	মোলাসেস(কেজি)	ইউরিয়া (কেজি)
৫	২.৫ - ৩.৫	১.০৫ - ১.২০	০.১৫
১০	৫.০ - ৭.০	২.১০ - ২.৪০	০.৩০
২০	১০.০ - ১৪.০	৪.২০ - ৪.৮০	০.৬০
৫০	২৫.০ - ৩৫.০	১০.৫০ - ১২.০০	১.৫০
১০০	৫০.০ - ৬০.০	২১.০০ - ২৪.০০	৩.০০

সুবিধা

*ইউ.এম.এস বাছুর , বাড়ন্ত, দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী গরু অথবা মহিষকে তাদের চাহিদা মত খাওয়ানো যায়।

*শুধু ইউ.এম.এস খাওয়ালেও গরুর ওজন বৃদ্ধি পায়।

* ইউ.এম.এস তৈরীর পদ্ধতি সহজ। একজন শ্রমিক প্রায় ৫০০ - ৬০০ কেজি খড় তৈরী করতে পারেন।

* গবেষনা করে দেখা গাছে যে, এ পদ্ধতিতে খড়ের সঙ্গে ১.০০ টাকার মোলাসেস খাইয়ে প্রায় ৫.০০ থেকে ৭.০০ টাকার গরুর মাংস উৎপাদন সম্ভব।

*ইউরিয় মোলাসেস ব্লক চেটে খাওয়ালে প্রাণীর যে উপকার হয় তা ইউ.এম.দ্বারাই সম্ভব ।

* যেহেতু ইউরিয়া ও মোলাসেস খড়ের সাথে ধীরে ধীরে খাচ্ছে , বিধায় বিষক্রয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

* সকল বয়সের গরু মহিষ যথেচ্ছা পরিমাণ এই খাদ্য খেতে পারে।

* গর্ভবতী প্রাণির এই খাদ্য খেতে পারে।

*কৃষক তার দৈনিক চাহিদা মত খড় প্রস্তুত করে প্রতিদিন খাওয়াতে পারেন।

অসুবিধা

* ইউ.এম.এস পদ্ধতিতে ইউরিয়া মোলাসেস খাওয়ানোর তেমন কোন অসুবিধা নেই। শুধু মাত্র ইহা তৈরী করে তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করে রাখা যায় না।

সাবধনতা

অবশ্যই ইউ, এম, এস, তৈরী করার সময় ইউরিয়া, মোলাসেস, খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে । ইউরিয়ার মাত্রা কোন অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না । ইউ,এম,এস,এর গঠন পরিবর্তন করলে কাংখিত ফল পাওয়া যাবে না ।

সারণী ১৭.২ ঃ ইউ, এম, এস খাওয়ানোর নিয়ম

প্রাণীর ধরন	ইউ, এম, এস	দানাদার মিশ্রণ
গরু	গরুর ইচ্ছামত	ওজনের শতকরা ০.৮ - ১.০ ভাগ
দুগ্ধবতী গাভী	গাভীর ইচ্ছামত	দুধ উৎপাদনের ভিত্তিতে
বাছুর (৬ মাস)	বাছুরের ইচ্ছামত	ওজনের শতকরা ১.০ ভাগ

সারণী ১৭.৩ ঃ দানাদার মিশ্রণ

১.	গম, চাল বা ভূট্টা ভাংগা	= ১০- ২০ কেজি
২.	গমের ভূষি ও ধানের কুড়ার মিশ্রণ (১ঃ১)	= ৪৫- ৫৫ কেজি
৩.	সরিষা, তিল বা নারিকেলের খৈল	= ২০- ২৫ কেজি
৪.	মাছের গুড়া	= ৪-৫ কেজি
৫.	চুনাপাথর বা ঝিনুকের পাউডার	= ৩-৪ কেজি
৬.	লবন	= ০.৫- ১ কেজি

ইউ,এম,এস তৈরী সহজ, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ামুক্ত ও লাভজনক । ইউ,এম,এস গো- খাদ্য প্রযুক্তিটি গবাদি প্রাণির পুষ্টি সরবরাহ এবং একই সাথে গবাদিপ্রাণি হতে পরিবেশ দূষণ হ্রাস করে । দেশের দুধ ও মাংসের ঘাটতি পূরণ ও বর্ধিত জনসংখ্যার কর্মসংস্থান করতে বাণিজ্যিক ভাবে গরু মোটাতাজাকরন ও দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠায় ইউ,এম,এস প্রযুক্তিটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে ।

১৭.২ ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক প্রস্তুকরণ

আমাদের দেশের গরু সাধারনতঃ খড় খেয়ে জীবন ধারন করে। তারপরও অনেক সময় খাদ্যের তীব্র সংকট দেখা যায়। ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক একটি শক্তিশালী এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ জমাট খাদ্য। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় খনিজ ও ভিটামিন দেয়া থাকে। খড়ের সাথে পরিপাক খাদ্য হিসাবে ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক খাওয়ালে প্রাণির শরীরে মাংস/চর্বি বাড়ে। এক কেজির একটি ব্লকে সাধারনতঃ ৯ মেগা জুল শক্তি ও ২৪০ গ্রাম প্রোটিন থাকে।

ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক তৈরীর পদ্ধতি

চিত্র ১৭.২ ঃ ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক তৈরীর উপকরণ ও ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক প্রস্তুত করণ

সারণী ১৭.৪ ঃ ব্লকের মধ্যে শতকরা নিম্নরূপ উপাদান থাকে।

উপাদান	পরিমান
মোলাসেস/চিটাগুড়	৫০ - ৬০ ভাগ
গমের ভূষি	২৫ - ২৬ ,,
ইউরিয়া	৮ - ৯ ,,
পাথরী চুন (খাওয়ার চুন)	৫ - ৬ ,,

১০ কেজি পরিমান ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক তৈরীর পদ্ধতি নিম্নে দেয়া হল।

১। ৫ - ৬ কেজি পরিমাণ মোলাসেস বা চিটাগুড় একটি ড্রামে/লোহার কড়াইয়ে নিয়ে চুলায় দিয়ে তাপ দিতে হবে। ২.৫ - ৩.০ কেজি পরিমাণ ভূষি কড়াইয়ে নিতে হবে এবং নাড়নী দিয়ে চিটাগুড়ের সঙ্গে মেশাতে হবে।
২। এবার ৩৫ গ্রাম লবন এবং যে কোন ডিবি ভিটামিন ১০০ গ্রাম মেপে নিয়ে কড়াইয়ে দিতে হবে।
৩। এবার ৮০০ - ৯০০ গ্রাম ইউরিয়া আলাদাভাবে মেপে নিতে হবে।
৪। ৫০০ - ৬০০ গ্রাম পাথরে চুন ওজন করে মোলাসেস তৈরী করার পূর্বে দিনে সামান্য পানিতে ভিজে রাখতে হবে।
৫। ওজনকৃত চুন, ইউরিয়া, লবন ও ভিটামিন ভালভাবে মিশে নিতে হবে এবং কড়াইয়ে ছেড়ে দিতে হবে।
৬। এবার কড়াই বা ড্রামটি আগুন/চুলা থেকে নামিয়ে ভালভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে যতক্ষন পর্যন্ত না চিটাগুড়ের আঠা আঠা ভাব আসে ।
৭। চিটাগুড়, ভূষি, চুন, ইউরিয়া, খনিজলবন ও ভিটামিন মিশ্রিত মিশ্রণ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাঁচের আকার ও ধারন ক্ষমতা যেমনঃ ১ কেজি ওজনের ব্লক তৈরী করা যেতে পারে।
৮। মিশ্রণটি নির্দিষ্ট ছাঁচে/ ফর্মায় ঢালার পর ছাঁচের মাপ অনুযায়ী ঢাকনা উপরে রেখে চাপ দিতে হবে যেন মিশ্রনটি শক্ত জমাট বেঁধে ছাঁচের আকারের মত একটি ব্লকে পরিনত করতে সাহায্য করে।
৯। সাবধনতার সাথে ছাঁচটি ব্লক থেকে তুলে নিতে হবে এবং ৩০ মিনিটের মত বাহিরে রেখে দিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে ব্লকটি শক্ত হয়ে যাবে।
১০। যদি এক সঙ্গে অধিক পরিমাণ ব্লক তৈরী করা প্রয়োজন হয় তবে পলিথিনের মোড়কে আচ্ছাদিত করা উচিত। এতে ব্লকের গায়ে ধুলাবালি লাগবে না এবং অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাবে।

ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক খাওয়ানোর নিয়ম

প্রতিদিন গরুকে ২৫০ - ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক শুষ্ক অবস্থায় খাওয়াতে হবে। ব্লকটি গরু প্রথম প্রথম খেতে না চেলে ব্লকের উপর লবন বা ভূষি ছিটিয়ে দিতে হবে এবং যত্নসহকারে খাওয়াতে হবে। ব্লক খাওয়ানোর পাশাপাশি গবাদী প্রাণিকে অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার যেমনঃ খড়, তাজা ঘাস, দানাদার খাদ্য, পানি ইত্যাদি খাওয়াতে হবে।

চিত্র ১৭.৩ ঃ গরুকে ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক খাওয়ানো হচ্ছে

১৭.৩ গো- খাদ্য হিসাবে এ্যালজির উৎপাদন ও ব্যবহার

এ্যালজি এক ধরনের উদ্ভিদ যা আকারে এককোষী থেকে বহুকোষী বিশাল বৃক্ষের মত হতে পারে। তবে আমরা এখানে দুটি বিশেষ প্রজাতির এককোষী এ্যালজি ক্লোরেলা ও সিনেডেসমাস নিয়ে আলোচনা করবো যা গো- খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এরা সূর্যালোক, পানিতে দ্রবিভূত অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জৈব নাইট্রোজেন আহরন করে সালোক সংশ্লেষন প্রক্রিয়ায় বেঁচে থাকে। এরা অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উষ্ণ জলবায়ুতে।

এ্যালজির পুষ্টিমান

বিভিন্ন ধরনের অপ্রচলিত খাদ্যের মধ্যে এ্যালজি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পুষ্টিকর খাদ্য যা বিভিন্ন ধরনের আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন- খৈল, শুটকি মাছের গুঁড়া ইত্যাদির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। শুষ্ক এ্যালজিতে শতকরা ৫০ - ৭০ ভাগ আমিষ বা প্রোটিন থাকে, ২০ - ২২ ভাগ চর্বি এবং ৮ - ২৬ ভাগ শর্করা থাকে। এছাড়াও এ্যালজিতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন সি এবং বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন বি থাকে। কেবল মাত্র ”সিসটিন” ছাড়া এ্যালজির প্রোটিনে বিভিন্ন ধরনের এ্যামাইনো এসিডের অনুপাত প্রায় ডিমের প্রোটিনের সমান। রোমন্থনকারী প্রাণীতে (যেমন গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া) এ্যালজির প্রোটিনের পাচ্যতা ৭৩%।

এ্যালজির উৎপাদন পদ্ধতি

নিম্নে এ্যালজির উৎপাদন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

এ্যালজি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ এ্যালজির বীজ, কৃত্রিম অগভীর পুকুর, টিউবয়েলের পরিস্কার পানি, মাসকালই বা অন্যান্য ডালের ভূষি এবং ইউরিয়া।

- প্রথমে সমতল, ছায়াযুক্ত জায়গায় একটি কৃত্রিম পুকুর তৈরী করতে হবে। পুকুরটি লম্বায় ১০ ফুট, চওড়ায় ৪ ফুট এবং গভীরতায় ১/২ ফুট হতে পারে। পুকুরের পাড় ইট বা মাটির তৈরী হতে পারে। এবার ১১ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া একটি স্বচ্ছ পলিথিন বিছিয়ে কৃত্রিম পুকুরের তলা ও পাড় ঢেকে দিতে হবে। তবে পুকুরের আয়তন প্রয়োজন অনুসারে ছোট বা বড় হতে পারে। তাছাড়া মাটির বা সিমেন্টের চাড়িতেও এ্যালজি চাষ করা যায়।
- ১০০ গ্রাম মাসকলই (বা অন্য ডালের) ভূষিকে ১ লিটার পানিতে সারারাত ভিজিয়ে কাপড় দিয়ে ছেঁকে পানিটুকু সংগ্রহ করতে হবে। একই ভূষিকে অন্তত তিনবার ব্যবহার করা যায়, যা পরবর্তীতে গরুকে খাওয়ানো যায়।
- এবার কৃত্রিম পুকুরে ২০০ লিটার পরিমাণ কলের পরিস্কার পানি, ১৫ - ২০ লিটার পরিমান এ্যালজির বীজ, যা এ্যালজির ঘনত্বের উপর নির্ভর করে এবং মাসকলাই ভূষি ভেজানো পানি নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর ২- ৩ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া নিয়ে উক্ত পুকুরের পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- এরপর প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও বিকেলে কমপক্ষে তিনবার এ্যালজির কালচারকে নেড়ে দিতে হবে। পানির পরিমাণ কমে গেলে নতুন করে পরিমাণ মত পরিস্কার পানি যোগ করতে হয়। প্রতি ৩/৪ দিন পর পর পুকুর প্রতি ১ - ২ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া ছিটালে ফলন ভালো হয়।
- এভাবে উৎপাদনের ১২ - ১৫ দিনের মধ্যে এ্যালজির পানি গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। এ সময় এ্যালজির পানির রং গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়। এ্যালজির পানিকে পুকুর থেকে সংগ্রহ করে সরাসরি গরুকে খাওয়ানো যায়।
- একটি পুকুরের এ্যালজির পানি খাওয়ানোর পর উক্ত পুকুরে আগের নিয়ম অনুযায়ী পরিমাণ মত পানি, সার, এবং মাসকলাই ভূষি ভেজানো পানি দিয়ে নতুন করে এ্যালজি কালচার শুরু করা যায়, এ সময় নতুন করে এ্যালজি বীজ দিতে হয় না।

- যখন এ্যালজি পুকুরে পানির রং স্বাভাবিক গাঢ় সবুজ রং থেকে বাদামী রং হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে যে উক্ত কালচারটি কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে নতুন করে কালচার শুরু করতে হবে। এ কারণে এ্যালজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ।

চিত্র ১৭.৪ ঃ পুকুরে এ্যালজির উৎপাদন

সাবধনতা

১। এ্যালজির পুকুরটি সরাসরি সূর্যালোকের নিচে না করে ছায়াযুক্ত স্থানে করা উচিৎ। কারণ অতি আলোকে এ্যালজি কোষের মৃত্যু হয়। এ জন্য কালচারটি নষ্ট হয়ে যায়।

২। কখনোই মাসকলাই ভূষি ভেজানো পানি বর্ণিত পরিমানের চেয়ে বেশী দেয়া উচিৎ নয়, এতেও ”নিউট্রেন্ট সুপার সেচুরেশন” এর কারণে এ্যালজি কোষ মারা যেতে পারে।

৩। এ্যালজি পুকুরের পানিকে নাড়া না দিলে কোষের উপর কোষ থিতিয়ে কালচারটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৪। যদি কখনো এ্যালজি পুকুরের পানি গাঢ় সবুজ রংয়ের পরিবর্তে হালকা নীল রং ধারন করে তখন তা ফেলে দিয়ে নতুন করে কালচার শুরু করতে হবে। কারণ নীলবর্নের এ্যালজি ভিন্ন প্রজাতির বিষাক্ত এ্যালজি যা ক্লোরেলা ও সিনেডেসমাস থেকে ভিন্ন।

গরুকে এ্যালজি খাওয়ানো

এ্যালজির পানি সব ধরনের এবং সব বয়সের গরুকে অর্থাৎ বাছুর, বাড়ন্ত গরু, দুধের বা গর্ভবতী গাভী, হালের বলদ সবাইকেই খাওয়ানো যায়। এ্যালজি খাওয়ানোর কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। এটাকে সাধারণ পানির পরিবর্তে সরাসরি খাওয়ানো যায়। এক্ষেত্রে গরুকে আলাদা করে পানি খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। দানাদার খাদ্য অথবা খড়ের সাথে মিশিয়েও খাওয়ানো যায়। সাধারণত ঃ দুই এক দিনের মধ্যেই গরু এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। গরু সাধারণত ঃ তার ওজনের ৮ ভাগ অর্থাৎ ১৫০ কেজি ওজনের গরু ১২ কেজি পরিমান এ্যালজির পানি পান করে। তবে গরমের দিনে এর পরিমাণ বাড়তে পারে। এ্যালজির পানিকে গরম করে খাওয়ানো উচিৎ নয়, এতে এ্যালজির খাদ্যমান নষ্ট হতে পারে। যদি বেশী গরু থাকে, (যেমন ধরুন ৫টি গরু আছে)। এক্ষেত্রে অন্ততঃ পূর্বে বর্ণিত আকারের ৫টি কৃত্রিম পুকুরে এ্যালজি চাষ করা উচিৎ যাতে একটির এ্যালজির পানি শেষ হতে পরবর্তীটি খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়।

এ্যালজি খাওয়ানোর উপকারীতা

রোমন্থনকারী প্রাণী যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া যে ঘাস বা খড় ইত্যাদি খেয়ে থাকে তা পাকস্থলীর জীবাণু দ্বারা ভেঙ্গে হজম হয়। এই জীবাণুর পরিমাণ এবং কার্যক্রম খাদ্যের উপর নির্ভর করে। যদি ভাল মানের খাদ্য অর্থাৎ পরিমাণ মত প্রোটিন, সহজপাচ্য কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন এবং খনিজ যুক্ত খাবার খায় তা হলে এই

জীবাণুর পরিমাণ ও কার্যক্রম বেড়ে যায় তথা গরুতে প্রোটিন এবং বিপাকীয় শক্তি সরবরাহ বেড়ে যায়। আবার যদি নিম্নমানের খাদ্য যেমন- খড় খায় তবে গরু তার চাহিদা মত বিপাকীয় শক্তি ও প্রোটিন পায় না। তাই শুধু খড় খাওয়ালে গরুর উৎপাদন কমে যায়। খড়ের সাথে সাধারণ পানির পরিবর্তে এ্যালজির পানি খাওয়ালে বাড়ন্ত গরুর মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন সরবরাহ বেড়ে যায় এবং গরুর দৈহিক ওজন হ্রাস অনেক কমে যায়। আমাদের দেশে প্রায় সারা বছরই কাঁচা ঘাসের অভাব প্রকট। বিশেষ করে শহর এলাকায় এ সমস্যা তীব্রতর। এর ফলে গরুর ভিটামিন এবং খনিজের অভাব জনিত রোগ যেমন- অন্ধত্ব, রাতকানা,গাভীর অনুর্বরতা ইত্যাদি দেখা যায়। যেহেতু এ্যালজিতে প্রচুর পরিমানে বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজ থাকে, তাই এ্যালজি খাওয়ানোর ফলে গরুকে এসব পুষ্টির অভাব জনিত রোগ থেকে রক্ষা করা যায়।

আমাদের দেশে গরুর প্রধান খাদ্য খড়। তাছাড়া প্রোটিন এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবারের অপ্রতুলতা এবং দুর্মূল্যের কারণে সবাই এ সব খাদ্য গরুকে খাওয়াতে পারে না। ফলশ্রুতিতে গরুর উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় এ্যালজির পানি ব্যাবহার করে অধিক পরিমাণ গরুর মাংস এবং দুধ উৎপাদন সম্ভব, যা দারিদ্র বিমোচন এবং আত্নকর্মসংস্থানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়াও এ্যালজি বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে, প্রতি গ্রাম এ্যালজি প্রায় ১.৬ গ্রাম অক্সিজেন উৎপাদন করে। এভাবে এ্যালজি উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করাও সম্ভব।

১৭.৪ দেশীয় পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ

বাংলাদেশের বৃষ্টি মৌসুমে কোন কোন এলাকায় প্রচুর পরিমাণে ঘাস পাওয়া যায় যেমন, দূর্বা, বাকসা, আরাইল, সেচি, দল, শষ্য খেতের আগাছা ইত্যাদি। এ ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন গাছের পাতা যা গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়, যেমন ইপিল ইপিল, ধৈঞ্চা ইত্যাদি। দেশীয় এ সমস্ত সবুজ ঘাস অথবা জমিতে চাষ করা নেপিয়ার, পারা, ভুট্টা, সরগম, ওট ইত্যাদি খুব সহজেই "সাইলেজ" করে সংরক্ষণ করা যায়।

সাইলেজ একটি ইংরেজি শব্দ যা দ্বারা গো-খাদ্যের বেলায় সবুজ ঘাসের পুষ্টিমান অক্ষুন্ন রেখে একটি নির্দিষ্ট অম্লতায় বা ক্ষারত্বে সংরক্ষিত ঘাসকে বুঝায়। সাধারণতঃ খড় জাতীয় খাদ্য ব্যতীত সব ধরনের সবুজ ঘাসই অম্লতায় সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষণের পর বছরের যে কোন সময় সংরক্ষিত ঘাস তুলে সরাসরি গরুকে খাওয়ানো যায়। বর্ষা মৌসুমে প্রাপ্ত সবুজ ঘাসে প্রচুর পরিমাণে জলীয়াংশ থাকে। এ ধরনের ঘাসে সাইলেজ তেমন ভাল হয় না। তবে এ সমস্ত সবুজ ঘাসের সঙ্গে শতকরা ১৫ - ২০ ভাগ শুকনো খড়ের স্তর দিলে একদিকে সাইলেজের গুণাগুণ ভাল থাকে অন্য দিকে সাইলেজের নির্যাস চুইয়ে খড়ের খাদ্যমানও বৃদ্ধি করে। এতে একটা বাড়তি সুবিধা হল পরবর্তীতে শুকনো খড় আলাদা করে আর খাওয়নো লাগে না। খড়ের অভাব থাকলে খড় না দিলেও সাইলেজ করা যাবে। ডাল বা লিগুম জাতীয় ঘাস যেমন ঃ খেসারী, মাসকালাই, কাউপি বা হেলেন ডাল, ইপিল ইপিল ইত্যাদি ঘাসও সবুজ অবস্থায় সাইলেজ করে রাখা যায়। এ ধরনের ঘাসে অধিক পরিমাণে প্রোটিন বা আমিষ থাকে বিধায় শুধুমাত্র ডাল জাতীয় ঘাস দ্বারা সাইলেজ করলে ভাল সাইলেজ নাও হতে পারে। এজন্যএ ধরনের ঘাস অডাল বা নন লিগুম জাতীয় ঘাসের (ভুট্টা, নেপিয়ার ইত্যাদি) সাথে সর্বোচ্চ ১ঃ১ এবং সর্বনিম্ন ১ঃ৩ অনুপাতে মিশিয়ে চিটাগুড় দিয়ে সাইলেজ করা ভাল। নন-লিগুম জাতীয় ঘাস না পাওয়া গেলে শুকনা খড়ের সাথে মিশিয়েও সাইলেজ তৈরী করা যায়।

মাটির গর্ত ঃ একশ সিএফটি একটি মাটির গর্তে ২.৫০ - ৩.০০ টন সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা যায়। গর্তটি অবশ্যই উঁচু জায়গায় (যেখানে পানি ঢুকতে না পারে) হতে হবে। গর্তের গভীরতা ৩ ফুট, প্রস্থের তলায় ৩ ফুট, মাঝে ৮ ফুট ও উপরে ১০ ফুট হবে। দৈর্ঘ্যের মাপ নির্ভর করবে ঘাসের পরিমাণের উপর। গর্তটির তলা পাতিলের মত সমভাবে বক্র থাকলে ঘাস চাপানো সহজ হবে।

পলিথিন ঃ মাটির সাইলোর চারদিকে পলিথিন মুড়ে সাইলেজ করলে অবশ্যই নিশ্চিন্তে রাখা যায়। কিন্তু পলিথিনের ব্যবহার ঘাসের সংরক্ষণ খরচ বাড়িয়ে দেয় এজন্য সাইলোর তলায় এবং চারি দিকে শুকনো খড় দিয়ে মাটি ঢেকে দেয়া যায়। দুই গজ চওড়া ডাবল পলিথিনের ৮ - ৯ গজ হলেই ২০ ফুটের একটি সাইলোর শুধু উপরের দিক বন্ধ করা যায়।

সাইলেজ তৈরী পদ্ধতি

সবুজ ঘাসের শতকরা ৩ - ৪ ভাগ চিটগুড় মেপে একটি চাড়িতে নিতে হবে। তারপর ঘন চিটাগুড়ের মধ্যে ১ঃ১ অথবা ৪ঃ৩ পরিমানে পানি মিশালে ইহা ঘাসের উপর ছিটানো উপযোগী হবে। ঝরনা বা হাত দ্বারা ছিটিয়ে এ মিশ্রণ ঘাসে সমভাবে মিশাতে হবে। সাইলোর তলায় পলিথিন দিলে আগে বিছিয়ে নিতে হবে। পলিথিন না দিলে পরু করে খড় বিছাতে হবে। এরপর দু' পার্শ্বে পলিথিন না দিলে ঘাস সাজানোর সাথে সাথে খড়ের আস্তরণ দিতে হবে। এরপর পরতে পরতে সবুজ ঘাস এবং শুকনো খড় দিতে হবে। প্রতি পরতে ৩০০ কেজি সবুজ ঘাস এবং ১৫ কেজি শুকনো খড় দিতে হবে। ৩০০ কেজি ঘাসের পরতে পূর্বের হিসাবে ৯ - ১২ কেজি চিটাগুড় ও ৮ - ১০ কেজি পানির মিশ্রণ ঝরনা বা হাত দিয়ে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। খড়ের মধ্যে কোন চিটাগুড় দিতে হবে না। এভাবে পরতে পরতে ঘাস ও খড় সাজাতে হবে। যত এঁটে ঘাস সাজানো হবে তত সুন্দর সাইলেজ তৈরী হবে। এভাবে সাইলো ভর্তি করে মাটির উপরে ৪ - ৫ ফুট পর্যন্ত ঘাস সাজাতে হবে। ঘাস সাজানো শেষ হলে খড় দ্বারা পুরু করে আস্তরন দিয়ে সুন্দর করে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সর্বশেষে ৩ - ৪ ইঞ্চি পুরু করে মাটি দিতে হবে। সম্পূর্ণ ঘাস এক দিনেই সাজানো যায়। তবে বৃষ্টি না থাকলে প্রতিদিন কিছু কিছু করেও কয়েক দিন ব্যাপি সাইলেজ তৈরী করা যায়।

- নীচু জায়গায় সাইলো করা যাবে না। তাতে পানি জমে সাইলেজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- উপরের পলিথিন সুন্দর ভাবে এঁটে দিতে হবে যাতে কোন পানি সাইলেজের মধ্যে না ঢুকে।

চিত্র ১৭.৫ঃ সাইলোপিটে ঘাস সাজানো ও চিটাগুড় মিশ্রিত পানি দেয়া হচ্ছে

- চিটাগুড় পাতলা হলে পরিমাণ বাড়িয়ে পানি কম করে মিশাতে হবে। বেশী পাতলা হলে ঘাস হতে চুঁইয়ে নীচে চলে যাবে। এমনভাবে দ্রবন তৈরী করতে হবে যাতে আঠার মত ঘাসের গায়ে লেগে থাকে।
- ঘাস এবং খড় এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ফাঁকা জায়গাগুলো যথাসম্ভব বন্ধ হয়ে যায়।
- সাইলোর কোনগুলো এবং পাশ সমূহ পা দিয়ে পাড়িয়ে ঘাস সাজাতে হবে যাতে ফাঁকা বন্ধ হয়ে যায়।
- ঘাসের সাথে খুব বেশী পানি থাকা বাঞ্চনীয় নয়।

খাওয়ানোর নিয়ম

এভাবে সংরক্ষিত ঘাস প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০ কেজি হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

১৭.৫ বর্ষাকালে তাজা ও ভিজা খড় সংরক্ষণ

বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ১.৮-২ কোটি টন ধানের খড় উৎপাদিত হয় । এর মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ উৎপন্ন হয় বর্ষা মৌসুমে । এ সময়ে বোরো ও আউস ধান থেকে উৎপাদিত প্রায় ৮০ লক্ষ টন খড় বৃষ্টি, জলাবদ্ধতা ও অন্যান্য কারনে শুকানো যায় না, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায় । এ পরিমাণ খড়ের বর্তমান বাজার দর কমপক্ষে ৮০ কোটি টাকা ।এক দিকে এত বিপুল পরিমাণ খড় প্রতি বছর নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে দেশের গো-খাদ্যের চাহিদা শতকরা ৪৪ ভাগই ঘাটতি থেকে যাচ্ছে । তাছাড়া আমন মৌসুমে উৎপাদিত খড়কে শুকাতে কৃষক ভাইদের প্রচুর শ্রম, অর্থ ও সময় ব্যয় করতে হয় । এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণি সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ধানের খড়কে কাঁচা ও ভিজা অবস্থায় সংরক্ষণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে ।

ভিজা খড়কে রোদে বা অন্য কোন উপায়ে শুকিয়ে এর পানির পরিমাণ ১০% এর নিচে নামিয়ে আনলে খড়ের উপর জীবানু এবং এনজাইমের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এ অবস্থায় খড়কে সংরক্ষণ করলে খড় নষ্ট হয় না । আমাদের দেশে এ পদ্ধতিতেই খড় সংরক্ষণ করা হয় । কিন্তু বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত বৃষ্টিতে খড় শুকানো প্রায় অসম্ভব । তাছাড়া কৃষক ভাইয়েরা এ সময়ে ধান শুকানোতে ব্যস্ত থাকেন। তাই এ পদ্ধতি অন্তত বর্ষা মৌসুমে কার্যকর নয়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভিজা খড় সংরক্ষণ

এই পদ্ধতিতে খড় অতিমাত্রায় অম্লীয় বা ক্ষারীয় করে পচনকারী জীবাণু ও এনজাইমের কার্যক্রম রোধের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। খড় অম্লীয় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের জৈব এসিড যেমন ঃ এসিটিকএসিড, প্রোপায়োনিক এসিড ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে চিটাগুড় সহজলভ্য। চিটাগুড় দিয়ে খড় অবায়বীয় অবস্থায় সংরক্ষণ করলে চিটাগুড়ের সুগার থেকে লেকটিকএসিড তৈরী হয় যাহা পচনকারী জীবাণু ও এনজাইমের কার্যকারিতা রোধের মাধ্যমে খড় সংরক্ষণ করে। তবে চিটাগুড় ব্যবহারের কয়েকটি অসুবিধা হচ্ছে ঃ (ক)এটি ব্যয় বহুল (খ) অবায়বীয় অবস্থায় খড় সংরক্ষণ করতে হয় ।(গ) এ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণে খড়ের পুষ্টিমান বৃদ্ধিপায় না।

ইউরিয়া দিয়ে ভিজা খড় সংরক্ষণ

ইউরিয়া দিয়ে ভিজা খড় সংরক্ষণে কতগুলি সুবিধা হল

১. ইউরিয়া খড়ের পুষ্টিমান বৃদ্ধি করে
২. ইউরিয়া সহজলভ্য ও তুলনামূলোকভাবে দাম কম
৩. এই পদ্ধতিটি অত্যান্ত সহজ ও নিরাপদ

উপকরন ঃ খড়, পলিথিন ও ইউরিয়া।

চিত্র ১৭.৬ ঃ খড়ের সাথে ইউরিয়া মিশিয়ে পলিথিন দিয়ে খড় সংরক্ষণ

সংরক্ষণ পদ্ধতি

- যে স্থানে খড় সংরক্ষণ করা হবে প্রথমে সে স্থানে পুরানো খড়কুটা বা পুরানো পলিথিন বিছাতে হবে।
- এর পর এক স্তর ভিজা খড় যেমন ২৫ কেজি খড় বিছাতে হবে। উক্ত পরিমাণ খড়ের জন্য ৩৫০-৫০০ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হবে।
- এভাবে স্তরে স্তরে খড় এবং ইউরিয়া ছিটিয়ে খড়ের গাদা তৈরী করতে হবে। খড়ের গাদার আকার খাড়া গম্বুজাকার না হয়ে চওড়া হবে।
- যখন সম্পূর্ণ খড় শেষ হবে তখন খড়ের গাদাকে এমন ভাবে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে খড়ের গাদায় কোন বাতাস ঢুকতে বা বের হতে না পারে। পলিথিনের কিনারা গুলো মাটি দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিতে হবে। অধিক পরিমান খড় সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যখন খড়ের গাদা চওড়া হয় তখন দুই টুকরা পলিথিনকে প্রস্থ বরাবর জোড়া (গলিয়ে) দিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে পলিথিনে যাতে কোন বড় ধরনের ছিদ্র না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- অতিরিক্ত পানি যুক্ত খড়ের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে ৩/৪ স্তর পর পর এক স্তর শুকনা খড় দিলে খড়ের সংরক্ষণ ভাল হয়।
- সাধারনত, বিভিন্ন জমির ধান বিভিন্ন সময়ে কাটা হয়। এক্ষেত্রে যতটা সম্ভব এক সাথে সব খড় সংরক্ষণ সবচেয়ে উত্তম। তবে কিছু পরিমাণ খড় ইউরিয়া দিয়ে বায়ু রোধী (অর্থাৎ পলিথিনে ঢাকা) অবস্থায় সংরক্ষণের পর সেখানে নতুন ভিজা খড় যোগ করতে হলে গাদার পলিথিন সরিয়ে প্রথমে কিছু পরিমাণ (৩০০-৫০০ গ্রাম, গাদার আকারের উপর নির্ভর করে) ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হবে এবং পরবর্তীতে পূর্বের বর্ণিত নিয়মানুসারে খড় ও ইউরিয়া দিতে হবে। সব শেষে পূর্বের ন্যায় খড়ের গাদা পলিথিন দিয়ে বায়ুরোধী অবস্থায় ঢেকে দিতে হবে।

সংরক্ষণ কাল

সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত খড় এক বছরের অধিক সময় সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণের দুই সপ্তাহ পর থেকে যে কোন সময় ইচ্ছা করলে এ খড় গাদা থেকে বের করে গরুকে খাওয়ানো যেতে পারে।

সংরক্ষিত খড় খাওয়ানো

গাদা থেকে বের করা সংরক্ষিত খড়ে প্রচুর পরিমাণ অ্যামোনিয়া থাকে। খোলা বাতাসে আধা ঘন্টা পরিমাণ সময় রেখে দিলে অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া চলে যায়। এর পর উক্ত সংরক্ষিত খড় শুকনে খড় বা কাঁচা ঘাসের সাথে মিশিয়ে গরুকে খাওয়ানো যেতে পারে। গরু সাধারনত সংরক্ষিত খড় পছন্দ করে তাই খাওয়াতে

অসুবিধা হয় না। কোন ক্ষেত্রে গরু তা অপছন্দ করলে আস্তে আস্তে তাকে অভ্যস্ত করে তুলতে হয়। সংরক্ষিত ভিজা খড় পুনরায় শুকানোর প্রয়োজন নেইএতে খড়ের পুষ্টিমান কমে যায়।

সারণী ১৭.৫ঃ শুকনা ও ইউরিয়া সংরক্ষিত ভিজা খড়ের তুলনামূলক পুষ্টিমান

	উপাদান	শুকনো খড়	সংরক্ষিত খড়
১	প্রোটিন	৪ - ৫%	৯ - ১২%
২	রুমেন পাচ্যতা	২৭%	৪৫%
৩	বিপাকীয় শক্তি প্রতি কেজিতে	৭ মেগাজুল	১০ মেগাজুল
৪	প্রতি ১০০ কেজি গরুর ওজনে খাদ্য গ্রহণ	১.৭২ কেজি	২.৫ কেজি
৫	শুধু খড় খাওয়ালে দৈনিক ওজনের পরিবর্তন	-৩৭৯ গ্রাম	২৮৩ গ্রাম

সাবধনতা

১। এই সংরক্ষণ পদ্ধতিতে খড়ের গাদায় পর্যাপ্ত পরিমান অ্যামোনিয়া থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাই সংরক্ষণ কালে পলিথিনের আবরণ যাতে কোন ভাবেই নষ্ট না হয় সে দিকে বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

২। যে সব ক্ষেতের ধান পুরোপুরি চিটা হয়ে গেছে সে সব খড় এই প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা উচিত নয়। কারন এ ধরনের সংরক্ষিত খড়ে ইমিডেজল জাতীয় যৌগ উৎপাদন হয় যা খেলে গরুর অসুবিধা হতে পারে।

উপরোক্ত সংরক্ষণ পদ্ধতিটি শুধু বর্ষা মৌসুমে উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ খড়ের পচন রোধই করে না, বরং খাদ্যমানও বৃদ্ধি করে। তাছাড়া সংরক্ষণ পদ্ধতিটি কৃষকের শ্রম, সময় এবং আর্থিক সাশ্রয় করবে।

১৭.৬.১ গো-খাদ্য হিসেবে কলা গাছের সংরক্ষণ ও ব্যবহার

বাংলাদেশে প্রতি বছর কলা সংগ্রহের পর প্রায় ২৪ লক্ষ মেট্রিক টন কলাগাছ পাওয়া গেলেও এর খুব নগন্য অংশই গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়। সারা বছরের মধ্যে বর্ষা মৌসুমেই কলা উৎপাদনের পরিমাণ বেশী। উৎপন্ন কলা গাছ বৃষ্টির কারণে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। গো-খাদ্য হিসেবে এর উপযোগীতা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক।
কলাগাছ গো- খাদ্য হিসাবে দু'ভাবে ব্যবহার করা যায় (ক) সাইলেজ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার এবং (খ) সরাসরি মিশ্র খাদ্য হিসাবে ব্যবহার।

(ক) সাইলেজ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার

এ পদ্ধতিতে কলাগাছে শুকনো খড় ব্যবহার করে অথবা না করেও সাইলেজ তৈরী করা যায়। সাইলেজ তৈরীর প্রয়োজনীয় উপকরন গুলো হলো - উঁচু জায়গায় মাটির গর্ত, খড়কুটা, পলিথিন, চিটাগুড়, পানি এবং টুকরো কলাগাছ।

চিত্র ১৭.৭ ঃ কলাগাছের সাইলেজ

ক (১) শুকনো খড় ব্যবহার না করে কলাগাছ সংরক্ষণ

কলাগাছ সংরক্ষণ মাটির গর্ত অথবা পাকা সাইলোতে করা যায়। তবে পাকা সাইলো খুব ব্যয়বহুল। এ জন্য উঁচু জায়গায় লম্বালম্বি মাটির গর্ত খুঁড়ে কলাগাছ সংরক্ষণ করা যায়। মাটির গর্তটির উপরিভাগের প্রশস্থে ৩.১ মিটার, মাঝামাঝি গভীরতায় ২.৫ মিটার এবং তলায় ১.৫ মিটার হবে। এর ফলে গর্তটি কোনাকৃতি না হয়ে পাতিলের তলার ন্যায় বাঁকানো হবে। গর্তটির গভীরতা ৯২ সেন্টিমিটার হবে। দৈর্ঘ্য নির্ভর করবে কলাগাছের পরিমাণের উপর। কলা সংগ্রহ করার পর কলাগাছ চপার মেশিন বা কাস্তে দ্বারা ছোট ছোট (দৈর্ঘ্য ২-৩ সে.মি.) করে কাটতে হবে। তারপর উক্ত গর্তে টুকরো টুকরো কলাগাছ স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। পানির সাথে চিটাগুড়ের ১ঃ১ অনুপাতের দ্রবণ সমভাবে ছিটিয়ে ভালভাবে মিশাতে হবে। প্রতি ১০০ কিলো কলাগাছের সাথে ২.০-২.৫ কিলো চিটাগুড় দ্রবণ মিশাতে হবে। চিটাগুড়ের দ্রবণটি আস্তে আস্তে ঝরনা বা হাত দিয়ে বিছানো কলাগাছের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। একশ ঘনফুট একটি মাটির গর্তে ৮.০-১০.০ মেট্রিক টন কলাগাছ সংরক্ষণ করা যায়। গর্তটি অবশ্যই উঁচু জায়গায় হতে হবে। গর্তে তলায় ও চারিদিকে পুরু করে শুকনো খড় বা পলিথিন বিছাতে হবে। পরতে পরতে চিটাগুড় মিশ্রিত কলাগাছ গর্তে সাজাতে হবে এবং পা দিয়ে চেপে ভিতরের বাতাস যথা সম্ভব বের করে দিতে হবে। যত এঁটে সাজানো যাবে তত ভাল সাইলেজ হবে। এভাবে ভর্তি করে মাটির উপরে প্রায় ৯০-১২২ সে.মি. পর্যন্ত কলাগাছ সাজাতে হবে। সাজানো শেষ হলে খড় দ্বারা পুরু করে আস্তরন দিয়ে সুন্দর করে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সবশেষে ৮-১০ সে.মি. পুরু করে মাটি দিতে হবে। সম্পূর্ণ কলাগাছ একদিনেই সাজানো যায়। তবে বৃষ্টি না থাকলে প্রতিদিন কিছু

কিছু করেও কয়েক দিনব্যাপী সাইলেজ তৈরী করা যায়। এভাবে উন্নত মানের কলাগাছের সাইলেজর বৈশিষ্ট্যাবলী ও কলাগাছের বিভিন্ন অংশের পুষ্টিমান যথাক্রমে সারণী ১৭.৬ ও ১৭.৭ এ দেয়া হল।

সারণী ১৭.৬ ঃ উন্নত কলাগাছের সাইলেজর বৈশিষ্ট্যাবলী

সাইলেজের ধরন	পিএইচ	গন্ধ	রং	বাহ্যিক গঠন
চিটাগুড় মিশ্রিত কলাগাছের সাইলেজ	৪.৪	অম্লীয়	হলুদাভ সবুজ	টুকরো কলাগাছ অবিকৃত থাকে
খড়সহ চিটাগুড় মিশ্রিত কলাগাছের সাইলেজ	৪.৩	অম্লীয়	হলুদাভ সবুজ	টুকরো কলাগাছ অবিকৃত থাকে
চিটাগুড় ছাড়া কলাগাছের সাইলেজ	৭.০	দুর্গন্ধ	কালচে	টুকরো কলাগাছ বিকৃত হয়ে যায়

সারনী ১৭.৭ ঃ কলাগাছের বিভিন্ন অংশের পুষ্টিমান

উপাদান	কলাগাছের কান্ড	কলাগাছের পাতা	
		সবুজ পাতা	পাতার ডগা
শুষ্ক পদার্থ	৫.৯	২১.০	৯.৪
জৈব পদার্থ	৮৯.৫	৯০.২	৯১.৬
আমিষ	৭.৩	৮.৮	৪৩.৭
এডিএফ	৪৮.৪	৩৯.২	৪৩.৭

কলাগাছের সাইলেজ খাওয়ানোর পদ্ধতি

প্রতি একশত (১০০) কেজি কলাগাছের সাথে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া পরিস্কার জায়গায় মিশ্রণ প্রক্রিয়া শেষে গরুকে সরবরাহ করা যেতে পারে।

ক(২) ঃ শুকনো খড় ব্যবহার করে সংরক্ষণ

কলাগাছের সাইলেজে শুকনো খড় ব্যবহারের জন্য প্রতি ১০০ কেজি কলাগাছের স্তর সাজানো শেষ হলে এক স্তর শুকনো খড় (৫-১০ কিলো) উপরের নিয়মে ব্যবহার করতে হবে। পরতে পরতে কলাগাছ ও খড় সাজাতে হবে এবং পা দিয়ে মাটির গর্ত ভর্তি করে খড় দ্বারা পুরু করে আস্তরন দিয়ে সুন্দর করে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সবশেষে ৮-১০ সে.মি. পুরু করে মাটি দিতে হবে। এখানে শুধু স্মরণ রাখতে হবে খড়ের স্তরে কোন প্রকার চিটাগুড় ছিটানোর প্রয়োজন নেই। উল্লেখিত নিয়মে ৬ মাস পর্যন্ত কলাগাছ সংরক্ষণ করা যায়। তবে পানি ঢুকলে কলাগাছের সাইলেজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সংমিশ্রিত কলাগাছ (কলাগাছ+চিটাগুড়) ও সাইলেজের (কলাগাছ+চিটাগুড়) পুষ্টিমান সারণী ১৭.৮ এ দেয়াহল।

সারণী ১৭.৮ ঃ সংমিশ্রিত কলাগাছ (কলাগাছ+চিটাগুড়) ও সাইলেজের (কলাগাছ+চিটাগুড়) পুষ্টিমান

খাদ্যের নাম	শুষ্ক পদার্থের পরিমান(%)	পুষ্টিমান (%)				
		জৈব পদার্থ	আমিষ	এডিএফ	খনিজ	ক্রড ফাইবার
খড় ছাড়া কলাগাছের সাইলেজ	১৪.৬	৮৯.৫	১৫.৮	৪১.২	১০.৫	৩৩.৮
খড় যুক্ত কলাগাছের সাইলেজ	২৮.২	৯১.১	১৬.৭	৩৯.৬	৮.৯	৩৩.৭
সংমিশ্রিত কলাগাছ সরাসরি ভাবে	১০.১	৯০.৩	১৬.৭	৩৬.৪	৯.৭	২৮.৮

গরুকে খাওয়ানোর পূর্বে উপরে বর্ণিত খাদ্যে ২% ইউরিয়া মেশানো হয়েছে।

খড় যুক্ত কলাগাছের সাইলেজ খাওয়ানোর পদ্ধতি ঃ একশত (১০০) কেজি খড়যুক্ত কলাগাছের সাইলেজের সাথে ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া পরিষ্কার জায়গায় ভালভাবে মিশ্রণ প্রক্রিয়া শেষে গরুকে সরবরাহ করা যেতে পারে।

(খ) সরাসরি কলাগাছ খাওয়ানোর পদ্ধতি

- কলা সংগ্রহের পর কলাগাছ চপার মেশিন বা কাস্তে দ্বারা ছোট ছোট করে কেটে পলিথিন বা পাকা মেঝেতে বিছাতে হবে।
- প্রতি ১০০ কেজি কলা গাছের জন্য ২-২.৫ কেজি চিটাগুড় একটি পাত্রে মেপে নিয়ে ২-২.৫ কেজি পানি এবং ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ভালভবে মিশাতে হবে। চিটাগুড় ও ইউরিয়া মিশ্রিত দ্রবণ ঝরণা বা হাত দিয়ে কলাগাছের টুকরোয় ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে করে ইউরিয়া ও চিটাগুড়ের দ্রবণটি কলাগাছের সাথে ভালভাবে মিশে যায়।
- উক্ত মিশ্রিত খাদ্যটি সরাসরি গরুকে যথেচ্ছা পরিমাণ খাওয়ানো যায়। কলাগাছের সাইলেজ ও সংমিশ্রিত কলাগাছ সরাসরিভাবে গরুকে খাওয়ানোর পর এদের গ্রহন মাত্রা ও পরিপাচ্যতা সরণী ১৭.৯ এ দেয়া হল ।

সারণী ১৭.৯ ঃ গো-খাদ্য হিসাবে সংমিশ্রিত কলাগাছ (কলাগাছ +চিটাগুড়) ও সাইলেজের (কলাগাছ +চিটাগুড়) দৈনিক খাদ্য গ্রহন ও পরিপাচ্যতা

খাদ্যের নাম	প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের গরুর খাদ্য গ্রহনের পরিমান(কেজি/দিন)	পরিপাচ্যতা (%)	দৈহিক ওজন বৃদ্ধি(গ্রাম/দিন)
খড় ছাড়া কলাগাছের সাইলেজ	১৩.০	৫৯.০	৪১০.০
খড় যুক্ত কলাগাছের সাইলেজ	১৩.০	৭৮.০	৩৩১.০
সংমিশ্রিত কলাগাছ সরাসরিভাবে	৮.০	৬৫.০	৩৪৫.০

সুবিধাঃ

- শ্রমিক খরচ, ইউরিয়া ও মোলাসেস ক্রয় ব্যতীত অন্য কোন খরচ নেই।
- প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের একটি গরু প্রতিদিন ১৩ কেজি প্রক্রিয়াজাত কৃত কলাগাছ অথবা খড় মিশ্রিত সাইলেজের ৮ কেজি খেতে পারে, যার দ্বারা প্রাণির শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ সহ দৈহিক ওজনও বৃদ্ধি পায়।
- যেহেতু ইউরিয়া ও চিটাগুড় কলাগাছের সাথে ধীরে ধীরে খাচ্ছে অতএব বিষক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।
- কলা উৎপাদনের পাশাপাশি কলাগাছকে প্রক্রিয়াজাত করে গরুকে সরাসরি খাওয়ানো যায় অথবা পরবর্তী সময়ে খাওয়ানোর জন্য সাইলেজ করে রাখা যায়।

১৭.৬.২ ভূট্টা খড়ের সংরক্ষন ও ব্যবহার

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও ঢাকা বিভাগে প্রচুর ভুট্টা চাষ হয়। শুধুমাত্র রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগে ২২,১১০ হেক্টর জমিতে ভূট্টা চাষ করা হয়। এক চতুর্থাংশ জায়গার ভূট্টার খড়ও যদি সাইলেজ করা হয় তা হলে মোট ৮,৮৪,৪০০ টন সাইলেজ উৎপাদন করা সম্ভব। এই বিপুল পরিমাণ উচ্ছিষ্ট সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করে প্রাণি খাদ্যের অভাব দূরীকরণসহ প্রাণিজাত উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন খরচ বহুলাংশে কমানো যায়।

সুবিধা ঃ

- অধিক উৎপাদনশীল। ভুট্টা দানা ও খড় একই সংগে আহরণ করা যায়। তাছাড়া হাইব্রিড ভুট্টার খড় ভুট্টাদানা সংগ্রহের পরও সবুজ ও সতেজ থাকে ফলে খড়ের পুষ্টিমানও ভাল থাকে।
- ভুট্টা রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী) ও খরিপ (মার্চ-অক্টোবর) উভয় মৌসুমেই জন্মে। তাই ভুট্টার খড় হতে বছরে দুই বার সাইলেজ করা যায় এবং সারা বছর প্রাণিখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- কোন রকম দ্রব্যাদি যোগ করা ছাড়াই ভুট্টা খড়ের সাইলেজ তৈরী করা যায় তবে মোলাসেস অথবা ইউরিয়া যোগ করে সাইলেজ তৈরী করলে সাইলেজের পুষ্টিমানও বাড়ে এবং অধিককাল সংরক্ষণ করা যায়।
- হাইব্রিড ভুট্টা হতে রবি ও খরিপ মৌসুমে প্রতি হেক্টরে দানা উৎপন্ন হয় যথক্রমে ৬-১০ টন ও ৪-৫ টন। তাছাড়া প্রতি ঋতুতে প্রতি হেক্টরে ভুট্টার খড় উৎপন্ন হয় ২৫-৫০ টন। এই খড় সাধরনত জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি ব্যবহার করে উৎকৃষ্ট প্রাণিখাদ্য তৈরী করা যায়।
- দেশের মোট ভুট্টা উৎপাদন এলাকার যথাক্রমে ৫৪ শতাংশ (১৫ লক্ষ হেক্টর)এবং ২৫ শতাংশ (৭ লক্ষ হেক্টর) এলাকা রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভূক্ত। তাই এ সমস্ত এলাকায় সমন্বিত খামার ব্যব স্থাপনার মাধ্যমে ভুট্টা দানা ও খড় ব্যবহার করে ডেইরী, বীফ, লেয়ার, ব্রয়লার ও ছাগল উৎপাদন সম্ভব।

চিত্র ১৭.৮ ঃ ভুট্টা খড় সংরক্ষণ

ব্যবহার পদ্ধতিঃ

- খামারীগণ হাইব্রিড বা প্রচলিত যে কোন ভুট্টা যেমন বর্ণালী, মোহর,শুভ্র, প্যাসিফিক১১, প্যাসিফিক ৬০, প্যাসিফিক ৩৯৩, বারী-৫ ইত্যাদি রবি অথবা খরিপ যে কোন মৌসুমে লাগাতে পারেন।
- ভুট্টা গাছ হতে পরিপক্ক ভুট্টার মোচা উঠানোর পর সাইলেজ করার জন্য ভুট্টা গাছ কর্তন করা হয়।
- ভুট্টা গাছ কর্তনের পর ভালভাবে সাইলেজ করার জন্য ভুট্টা গাছকে ট্রাক্টর চালিত চপার মেশিনে বা দা দিয়ে ৭-১০ সেঃমিঃ সাইজে টুকরো করা হয়।
- টুকরাকৃত এ গাছকে সাইলো পিটে সংরক্ষণ করা হয়।
- একটি সাইলো পিটের আকৃতি হতে পারে এরূপ যেমন- ৩ ফুট গভীর তলদেশে ৩ ফুট প্রশস্ত, মধ্যভাগে ৮ ফুট প্রশস্ত,এবং উপরিভাগে ১০ ফুট প্রশস্ত। এভাবে তৈরীকৃত ১০০ বর্গফুটের একটি সাইলো পিটে ২.৫-৩.০ টন ঘাস সাইলেজ হিসাবে সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহারের সম্ভাবনাঃ রবি ও খরিপ মৌসুমে দেশের উত্তরাঞ্চল ও ঢাকা বিভাগের এলাকা সমূহে ভুট্টা খড় সংরক্ষণ করে স্বল্প খরচে দুগ্ধ ও গরু মোটাতাজা করন খামার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

পদ্ধতি ব্যবহারের সর্তকতাঃ সাইলো পিট উঁচু জায়গায় করতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি জমা হতে না পারে এবং পানি গড়িয়ে চলে যেতে পারে। তাছাড়া পিটের ভিতর সাইলেজ যেন আটশাট অবস্থায় থাকে এবং বাতাস ও পানি প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে।

১৭.৭ খামারের বর্জ্য হতে ডাকউইড উৎপাদন ও গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার

ডাকউইড এক ধরনের ক্ষুদ্রাকৃতির ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ যা বদ্ধ স্রোতহীন জলাশয়ের উপর দলবদ্ধ ভাবে ভেসে থাকে। ডাকউইডকে ভ্রমবশত অনেকে " শেওলা" মনে করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষেএরা সপুস্পক উদ্ভিদ অর্থাৎ এদের ফুল হয়। সপুস্পক উদ্ভিদ হলেও প্রকৃতিতে ডাকউইড প্রধানত "কুড়ি" উৎপাদনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে এবং এত দ্রুত বিভাজন হয় যে, আদর্শ পরিবেশে ৮-১৬ ঘন্টার মধ্যে এক কেজি ডাকউইড দুই কেজিতে পরিণত হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ডাকউইডের পুষ্টিমানও যথেষ্ট। ডাকউইডে ৪০% পর্যন্ত আমিষ থাকতে পারে । মানবদেহের ও প্রাণিপাখির জন্য আবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড গুলোর অধিকাংশ ডাকউইডে আছে। এছাড়া ডাকউইডে পর্যাপ্ত পরিমানে ভিটামিন "এ" ও "ডি" বিদ্যমান। এজন্য ডাকউইডকে মাছ ও প্রাণি-পাখির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

চিত্র ১৭.৯ ঃ জলাশয়ে ডাকউইড উৎপাদন

পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণী

গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগী ইত্যাদির খাদ্যে সরবরাহকৃত পুষ্টির ৫০-৬০% মল ও মূত্র হিসাবে বেরিয়ে আসে যা বর্তমানে আংশিক বা পরিপূর্ণ ভাবে নষ্ট বা অপচয় হয়। অথচ এই মুল্যবান পুষ্টি উপাদান সমূহকে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাণিপাখীর পুষ্টি চাহিদা বহুলাংশে পূরণ সম্ভব। খামারে উৎপাদিত বিভিন্ন বর্জ্যের মধ্যে গোবর, মুরগীর বিষ্ঠা ও গোয়াল ধোয়া পানি অন্যতম। এই গোবর বা বিষ্ঠাকে আবার অবায়বীয় ফার্মেন্টেশন করেও ব্যবহার করা যেতে পারে। সারণী ১৭.১০ বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যের গড় পুষ্টিমান দেয়া হল।

সারণী ১৭.১০ ঃ খামারে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যের গড় পুষ্টিমান

বর্জ্যের নাম	শুষ্ক পদার্থে (%)	জৈব পদার্থ (%)	নাইট্রোজেন (%)	এমোনিয়া নাইট্রোজেন (গ্রাম/কেজি)
গোবর	২১.৬০	৭৯.১৯	১.৮৩	০.১৮৪
মুরগীর বিষ্ঠা	৩৪.৬৪	৬০.৫৩	৫.২৮	১.৪৬৩
ফার্মেন্টেড গোবর	৬.৪৭	৭৯.৬০	২.৭৯	০.৪৬৬
ফার্মেন্টেড মুরগীর বিষ্ঠা	৭.৯৮	৭০.৬৮	৫.২৪	৪.২৯৮
গোয়াল ধোয়া পানি	-	-	০.০০৫	০.০২৪ (গ্রাম/লিটার)
হাঁসের বিষ্ঠা মিশ্রিত পানি	-	-	-	০.১০২(গ্রাম/লিটার)

ছোট আকারের কৃত্রিম পুকুরে ডাকউইড চাষ

পলিথিনের কৃত্রিম পুকুরঃ এ ধরনের পুকুর সমতল জায়গায় মাটি বা ইটের দেওয়ালের তৈরী হতে পারে। যা ৮ মিটার লম্বা, ২ মিটার প্রশস্ত এবং ০.৫ মিটার গভীর হতে পারে। এভাবে তৈরী আয়তকার দেয়ালের উপর পলিথিন বিছিয়ে কৃত্রিম পুকুর তৈরী করা হয়। পুকুরে ৩০ - ৩৫ সেঃ মিঃ (প্রায় ১ ফুট) পর্যন্ত পানি দিয়ে ডাকউইড উৎপাদন করা হয়। ১৬ বর্গ মিটার আয়তন এবং ০.৩৫ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট পুকুরে প্রায় ৫৬০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয়।

ডাকউইড উৎপাদনে বিভিন্ন খামার বর্জ্যের মাত্রা

সারণী ১৭.১০ এ দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন ধরনের খামার বর্জ্যের পুষ্টিমান, বিশেষত, মোট নাইট্রোজেন ও এমোনিয়া-নাইট্রোজেনের পরিমাণ ভিন্ন। ফলে ডাকউইড উৎপাদনে এদের ব্যবহার মাত্রাও ভিন্ন। সারণী ১৭.১১ এ ১৬ বর্গ মিটার আয়তন ও ০.৩৫ মিটার পানির গভীরতা সম্পন্ন কৃত্রিম পলিথিনের পুকুরে ডাকউইড উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের খামার বর্জ্য কি পরিমাণ ব্যবহার করা হবে তা দেয়া হল।

সারণী ১৭.১১ ঃ ১৬ বর্গ মিটার আয়তন ও ০.৩৫ মিটার পানির গভীরতা সম্পন্ন কৃত্রিম পলিথিনের পুকুরে ডাকউইড উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের খামার বর্জ্য ব্যবহারের মাত্রা এবং মিডিয়াতে এমোনিয়ার পরিমাণ

বর্জ্যের নাম	প্রাথমিক বর্জ্যের মাত্রা (কেজি)	দৈনিক বর্জ্যের মাত্রা (কেজি)	মিডিয়া এমোনিয়া (মিঃগ্রাঃ/লিঃ)
তাজা গোবর	৫০	১৩	৭.৭৭
তাজা মুরগীর বিষ্ঠা	১১	১	৮.৩৯
ফার্মেন্টেড গোবর	১০৮	২৯	৭.৪৬
ফার্মেন্টেড মুরগীর বিষ্ঠা	৪৭	৪	৯.২২
গোয়াল ধোয়া পানি	সম্পূর্ণ পানি	সম্পূর্ণ পানি	২৪
হাঁসের বিষ্ঠা মিশ্রিত পানি	সম্পূর্ণ পানি	সম্পূর্ণ পানি	১০০

বর্জ্যের প্রয়োগ

ডাকউইড পুকুরে পুষ্টির উপাদান একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখার জন্য প্রথমে বেশী পরিমানে (সারণী **১৭.১১** দেখুন) বর্জ্য উপাদান দিতে হয়। যেহেতু ডাকউইড বৃদ্ধির সাথে সাথে পানিতে দ্রবীভূত পুষ্টির পরিমান কমতে থাকে, এ অবস্থায় ডাকউইডের উৎপাদন আশানুরূপ রাখার জন্য প্রতিদিন সারণী **১৭.১১** অনুসারে বর্জ্য দিতে হবে।

ডাকউইড চাষের বীজের মাত্রা

বিভিন্ন ধরনের ডাকউইড চাষে ভিন্ন মাত্রার বীজ দিতে হয়। যেমনঃ লেমনা, উলফিয়া ও স্পাইরোডেলার বীজের মাত্রা যথাক্রমে প্রতি বর্গ মিটারে ৪০০, ৫০০ এবং ৬০০ গ্রাম।

দৈনন্দিন পরিচর্যা

১. পুকুরের ডাকউইড প্রতিদিন অন্তত একবার নেড়ে দিতে হয় যা ডাকউইডের মূল এবং পাতার ময়লা দূর করে এর পুষ্টি সংগ্রহ সহজ করে। তাজা গোবর এবং মুরগীর বিষ্ঠা পুকুরের তলদেশে অবায়বীয় ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মিথেন উৎপাদন করে যা বর্জ্যসহ সরের মত পুকুরের উপর ভেসে উঠে ফলে ডাকউইডের পুষ্টি শোষণে ব্যঘাত ঘটে। এই সরকে ভেঙ্গে না দিলে ডাকউইড পুষ্টির অভাবে মারাযেতে পারে। তাছাড়া নাড়া চাড়া ডাকউইডের অঙ্গজ প্রজননেও সহায়তা করে।

২. স্পাইরোডেলা বিভিন্ন ধরনের পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিঃ লিঃ মেলাথিয়ন ব্যবহার করতে হবে। তবে লেমনাও উলফিয়াতে এ ধরনের কোন সমস্যা সাধারনত দেখা যায় না।

৩. জৈব বর্জ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দীর্ঘ দিন ধরে একটি পুকুরে নির্ধারিত পরিমাণ বর্জ্য ব্যবহার করা সত্ত্বেও ৩০-৩৫ দিন পর ডাকউইড উৎপাদন কমতে থাকে। এক্ষেত্রে প্রতি এক মাস পর পর পানি পরিবর্তন করে নতুন ভাবে ডাকউইড উৎপাদন শুরু করতে হবে।

ডাকউইডের সংগ্রহঃ প্রতি বর্গ মিটারে ৮০-১০০ গ্রাম হিসাবে **১৬** বর্গ মিটার পুকুর থেকে দৈনিক **১.২৮-১.৩২** কেজি ডাকউইড সংগ্রহ করা যায়।

গোবর/বিষ্ঠা ব্যবহারে কৃত্রিম পুকুরে ডাকউইডের ফলনঃ খামার বর্জ্য থেকে উৎপাদিত ডাকউইডের মধ্যে কাঁচা অবস্থায় উৎপাদন সবচেয়ে বেশী উলফিয়া প্রজাতির (১৭৫০ কেজি/ হেঃ/দিন)এর পর লেমনা(৮২০ কেজি/হেঃ/দিন) ও স্পাইরোডেলার (৭২০ কেজি/হেঃ/দিন)। কিন্তু শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে সবচেয়ে বেশী উৎপাদন লেমনাতে এরপর উলফিয়া ও স্পাইরোডেলার। সারণী **১৭.১২**এ বিভিন্ন বর্জ্য থেকে উৎপাদিত স্পাইরোডেলার পুষ্টিমান দেয়া হল।

সারণী **১৭.১২** বিভিন্ন খামার বর্জ্য ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত ডাকউডের (স্পাইরোডেলার) পুষ্টিমান

ব্যবহৃত বর্জ্যর নাম	ডাকউইডের পুষ্টিমান		
	শুষ্ক পদার্থ (%)	জৈব পদার্থ(%)	প্রোটিন (%)
কাঁচা গোবর	১০	৮৮	৩৩
কাঁচা মুরগীর বিষ্ঠা	৭	৯৬	৩৭
ফার্মেন্টেড গোবর	৮	৯৮	৪১
ফার্মেন্টেড মুরগীর বিষ্ঠা	৮	৯৮	৪০

বৃহদাকার গবাদি প্রাণির খামারে ডাকউইড উৎপাদন

একশত পঞ্চাশ থেকে দুইশত গরু বিশিষ্ট গবাদি প্রাণির খামারে দৈনিক প্রায় ১৫০০০-২০০০০ লিটার পানি গোয়াল ধোয়া, খাওয়ানো এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। এই পানিতে মলমূত্র মিশে বিভিন্ন জৈব পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ হয় যা ডাকউইডের পুষ্টি সরবরাহ করতে পারে। এক্ষেত্রে গোয়ালধোয়া পানি প্রথমে একটি পুকুরে জমিয়ে মিনারালাইজড করা হয়। পরবর্তীতে সেই পানিতেই ডাকউইড উৎপাদন করা হয়। এ ধরনের বর্জ্য থেকে উৎপাদিত ডাকউইডের(লেমনার) ফলন ও গুনগত মান সারণী ১৭.১৩ এ দেয়া হলো।

সারণী ১৭.১৩ গোয়াল ধোয়া পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ডেইরী লেগুনে ডাকউইডের (লেমনার) গড় উৎপাদন ও পুষ্টিমান

ডাকউইড	কাঁচা ফলন (কেজি/হেঃ/দিন)	শুষ্ক পদার্থ (%)	জৈব পদার্থ(%)	প্রোটিন (%)
লেমনা	৫২০	৫.৪৩	৭২.৫৬	৩১.৫৪

প্রাণিখাদ্য হিসাবে ডাকউইডের ব্যবহার

সবুজ ঘাসের বিকল্প হিসাবে গরুর খাদ্যে ডাকউইড ব্যবহার করা যায়। একটি গরু দৈনিক ১০-১২ কেজি কাঁচা ডাকউইড খেতে পারে। এক্ষেত্রে কুড়া বা ভূষির সাথে প্রতি কেজি ডাকউইডের ১০০ গ্রাম পরিমান মোলাসেস মিশাতে হয়। এতে গরুর মাংস ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

খামারে উৎপাদিত বর্জ্য ব্যবহারে ডাকউইডের উৎপাদন এবং প্রাণিখাদ্য হিসাবে এর ব্যবহার খাদ্য খরচ বহুলাংশে কমিয়ে দিতে পারে।

উৎসঃ

* প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা - বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

মডিউল-১৮ ঃ
কৃত্রিম প্রজনন

১৮.১ কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

বর্তমানে সারা বিশ্বে গবাদি প্রাণির জাত উন্নয়নের জন্য কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি বহুল ভাবে প্রচলিত। গবাদি প্রাণির জাত উন্নয়ন ছাড়া তার উৎপাদন বৃদ্ধি ও গুনগতমান পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। বংশগত কারণে গাভী বা বলদ যথাক্রমে নির্দিষ্ট মাত্রায় দুধ উৎপাদন করে এবং আকারে বড় হয়। খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে চারিত্রিক বৈশিষ্ট পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। বেশী উৎপাদনশীল জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে গাভীকে প্রজনন করানো হলে উন্নত গুনাবলী তার বাচ্চার দেহে সঞ্চালিত হয়। উন্নত দেশ থেকে ষাঁড়ের পরিবর্তে উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে এদেশের গবাদি প্রাণির জাত উন্নয়ন করার এক মাত্র মাধ্যম কৃত্রিম
প্রজনন।

১৮.১.১ কৃত্রিম প্রজননের সুবিধা

- একটি ষাঁড় থেকে একবার সংগৃহীত সিমেন দ্বারা ১০০ - ৪০০ গাভী প্রজনন করানো যায়; ফলে ষাঁড়ের ব্যবহার যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। একটি ষাঁড়ের সারাজীবনের সংগৃহীত সিমেন দ্বারা প্রায় একলক্ষ থেকে দেড় লক্ষ গাভী প্রজনন করানো সম্ভব।
- অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উন্নত জাতের ষাঁড় নির্বাচন করতে সুবিধা হয়।
- উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন দ্বারা অতি দ্রুত এবং ব্যাপক ভিত্তিতে উন্নত জাতের গবাদি প্রাণি তৈরী করা সম্ভব।
- এ পদ্ধতিতে শুক্রানুর গুনাগুন পরীক্ষা করা সম্ভব হয়।
- অনুন্নত ষাঁড় এবং অপ্রয়োজনীয় ষাঁড় বাছাই করতে সুবিধা হয়।
- ষাঁড়ের জন্মগত ও বংশগত রোগ বিস্তার প্রতিরোধ করা যায়।
- প্রজনন কাজে ব্যবহারের জন্য বাড়তি ষাঁড় পালনের প্রয়োজন হয় না।
- যে কোন সময় যে কোন স্থানে কৃত্রিম প্রজনন করা যায়।
- কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতিতে কম খরচে অনেক বেশী গাভীকে পাল দেয়া যায়।
- যৌন রোগ সংক্রমন রোধ করা যায়। প্রাকৃতিক উপায়ে প্রজননের সময় বিভিন্ন যৌন রোগ যেমন ঃ- ব্রুসোলোসিস, ভিব্রিওসিস ট্রাইকোমনিয়াসিস ইত্যাদি মারাত্মক যৌন রোগ সমূহ ষাঁড়ের মাধ্যমে আক্রান্ত গাভী থেকে অন্যান্য গাভীর মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে।
- গাভীর জন্মগত ক্রটি কিংবা রোগ ব্যাধি থাকলে নির্ণয় করা সম্ভব ও সহজ হয়।
- নির্বাচিত ষাঁড়ের সিমেন সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজনমত যে কোন সময় ব্যবহার করা যায়।
- প্রয়োজন হলে বিদেশ থেকে উন্নত জাতের ষাঁড়ের পরিবর্তে অল্প খরচে তার সিমেন আমদানী করা যায়।
- সংগমে অক্ষম উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে তা ব্যবহার করা যায়।
- ষাঁড় ও গাভীর দৈহিক ও অসামঞ্জসতার কারনে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সম্ভাব্য সংগঠিত দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।
- যে সমস্ত গাভী ষাঁড়কে উপরে উঠতে দেওয়া পছন্দ করে না সে সমস্ত গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতিতে পাল দেওয়া যায়।
- ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির গবদি প্রাণির মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে শংকর জাত সৃষ্টি করা যায়।

- উন্নত পালন পদ্ধতি অনুসরন করে সঠিক পরিসংখ্যান রাখা যায়।

১৮.১.২ কৃত্রিম প্রজননের সীমাবদ্ধতাঃ

- সুষ্ঠভাবে প্রজনন করানো, সিমেন সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহরের জন্য দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন হয়।
- গাভীর উত্তেজনা কাল সুষ্ঠভাবে নির্ণয় করতে হয়।
- প্রজননের জন্য রক্ষিত ষাঁড়ের জন্য বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয়।
- গর্ভবতী গাভীকে ভূলক্রমে জরায়ুর গভীরে প্রজনন করালে গর্ভপাত হওয়ার সম্ভবনা থাকে।
- কৃত্রিম প্রজননের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মূল্য তুলনামূলক ভাবে বেশী।
- কৃত্রিম প্রজনন কাজের জন্য সহায়ক গবেষণাগারের প্রয়োজন হয়।

১৮.২ কৃত্রিম প্রজনন ফলপ্রসূ না হওয়ার কারণঃ

সিমেন ষ্ট্র

- ক্রটিপূর্ণ ভাবে ষ্ট্র পরিবহন।
- ক্রটিপূর্ণ ষ্ট্র সংরক্ষণ।
- ক্রটিপূর্ণ ভাবে সিমেন ক্যান থেকে ষ্ট্র বের করা।
- সিমেন ক্যানে নাইট্রোজনের পরিমাণ কমে যাওয়া।
- সিমেন ক্যানের ঢাকনির সাথে সংলগ্ন লাল সিলের ক্রটি।
- ক্রটিপূর্ণ থোইং পদ্ধতি।

প্রজননকারী

- প্রজননকারীর অনভিজ্ঞতা।
- ক্রটিপূর্ণ ও অদক্ষভাবে প্রজনন করানো।
- প্রজনন অংগের ভিতর ভুল স্থানে শুক্রানু স্থাপন।
- গাভীর ইষ্ট্রাস সম্বন্ধে ভুল ধারনা।
- সঠিক সময়ে প্রজনন না করা।
- জীবাণু দ্বারা শুক্রানু সংক্রমিত হওয়া।
- সিমেনের গুনগত মান সঠিক না থাকা।
- প্রজননের সরঞ্জাম জীবাণুমক্ত না থাকা।
- প্রজননের পর গাভীকে বিশ্রাম না দেওয়া।

গাভীর মালিক

- গাভীর ডাকে আসা বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রদান না করতে পারা।
- ডাকে আসার লক্ষণ সঠিক ভাবে যাচাই না করতে পারা।
- গাভীকে সঠিক ভাবে পরিচর্যা না করা।
- সুষম খাদ্য প্রদান না করা।

গাভী

- সংক্রমক রোগে আক্রান্ত হওয়া।
- যৌন রোগে আক্রান্ত হওয়া।
- জনন অঙ্গে যে কোন ধরনের প্রদাহ।
- অনিয়মিত ঋতুচক্র।
- পুনঃ পুনঃ গরম হওয়া ও ভুল বা ফলস গরম হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া।
- হরমন নিঃসরনের অভাব।
- হরমন নিঃসরনে ভারসাম্যহীনতা।
- নীরব ইষ্ট্রাস।
- অধিক বয়স।
- পুষ্টির অভাব।

সিমেন

- মৃত শুক্রানুযুক্ত সিমেন ব্যবহার।
- দুর্বল শুক্রানুযুক্ত সিমেন ব্যবহার।
- সিমেনর মধ্যে প্রয়োজনের তুলনায় শুক্রানুর সংখ্যা কম থাকা।
- অনুর্বর ষাঁড়ের সিমেন ব্যবহার।
- বয়স্ক অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড়ের সিমেন ব্যবহার।

১৮.৩ বকনা বা গাভী গরম হওয়ার লক্ষণ

বকনা বা গাভী গরম হলে বিভিন্ন ধরনের স্বভাবগত ও শরীরবৃত্তীয় লক্ষণ ও পরিবর্তন দেখা দেয়। এগুলো হলো

- বকনা বা গাভী অশান্ত থাকবে এবং একজায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে ছটফট করবে।
- গরম হওয়ার শুরুতে নিজে অন্য প্রাণির উপর লাফ দিবে এবং পুরোপুরি গরম অবস্থায় অন্য প্রাণিকে নিজের উপর লাফ দিতে উদ্বুদ্ধ করবে।
- অন্য প্রাণিকে নিজের পশ্চাৎদেশ চাটতে দিবে।
- খাওয়ার আগ্রহ কমে যাবে ও দুধালো গাভীর ক্ষেত্রে হঠাৎ করে দুধ দেয়া কমে যাবে।
- বকনা বা গাভীকে খুব সতর্ক মনে হবে এবং সবসময় কান খাড়া করে থাকবে।
- ঘনঘন অল্প পরিমাণে প্রস্রাব ও পায়খানা করবে।
- লেজ নাড়তে থাকবে।
- যোনি পথ দিয়ে স্বচ্ছ মিউকাস বা শ্লেস্মা বের হবে।
- হাত দিয়ে যোনিমুখ সামান্য ফাঁক করলে ভেতরটা অন্য সময়ের চেয়ে বেশী লালচে দেখাবে।
- স্পেকুলামের সাহায্যে সার্ভিক্সের মুখ দেখলে মনে হবে সাভিক্স খোলা রয়েছে।
- বকনা বা গাভী হাম্বা হাম্বা করে অনবরত ডাকতে থাকবে।
- রক্তে প্রথমে ইস্ট্রোজেন ও পরে লিউটিনাইজিং হরমোনের মাত্রা বেড়ে যাবে।

১৮.৪ বকনা বা গাভী গরম হওয়ার পর করণীয়

বকনা বা গাভী গরম অবস্থায় প্রধান কাজ হলো পাল দেওয়া। এজন্য প্রথমেই পাল দেওয়ার উপযুক্ত সময় নির্ণয় করতে হবে। সাধারণতঃ গাভী গরম হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাবার পর থেকে পরবর্তী ১৮ ঘন্টার মধ্যে পাল দিলেই চলে। এস্ট্রাস ধাপ শুরু হওয়ার ৮ ঘন্টা পর গাভীতে গরম হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং পরবর্তী ১৮ ঘন্টা পর্যন্ত গরম অবস্থা স্থায়ী থাকে। এরপর থেকে গরম অবস্থা চলে যেতে থাকে। গরম অবস্থায় আসার শুরু থেকে ৬ ঘন্টার মধ্যে পাল দিলে সফলতার হার হবে শতকরা ৪৫ - ৭০ ভাগ আর ৭ থেকে ১৮ ঘন্টার মধ্যে পাল দিলে শতকরা ৭০ - ৯০ ভাগ পর্যন্ত সফলতা পাওয়া যাবে। তবে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যাবে ১২-১৮ ঘন্টার মধ্যে পাল দিলে। ১৮ ঘন্টার পর পাল দিলে ক্রমান্বয়ে সফলতার হার কমতে থাকবে।

পাল দেওয়ার পদ্ধতি

১। প্রাকৃতিক পদ্ধতি ঃ বকনা বা গাভীর সঙ্গে প্রজননক্ষম ষাঁড়ের মিলনের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

২। কৃত্রিম পদ্ধতি ঃ এক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে ষাঁড়ের বীর্য বকনা বা গাভীর জননতন্ত্রে প্রবেশ করানো হয়। বকনা বা গাভীর ক্ষেত্রে মলদ্বার যোনি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

১৮.৫ গর্ভাবস্থা বা গর্ভধারণ নির্ণয়ের পদ্ধতি

কয়েকটি পদ্ধতি দ্বারা গাভীর গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা যায় ঃ যেমন-

১। বাহ্যিক লক্ষণ দেখে।

২। হাত দিয়ে আভ্যন্তরীন পরিবর্তন অনুভব করে।

৩। রাসায়নিক পরীক্ষা, ইত্যাদি।

বাহ্যিক পরিবর্তন

- গাভীর ইস্ট্রাস চক্র বন্ধ হবে, ডাকে আসবে না।
- ষাঁড় এড়িয়ে চলবে এবং ষাঁড় ও গাভীর কাছে আসবে না।
- গাভী শান্ত হয়ে যাবে। চেহারা উজ্জ্বল হতে থাকবে ও পশম চকচকে হবে।
- গাভীর পেট ক্রমশঃ বড় হতে থাকবে এবং শেষ দিকে বাচ্চার নড়াচড়া বুঝা যাবে।
- গাভীর দুগ্ধ উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমে যাবে।
- যোনিমুখ ক্রমশঃ ফুলা ফুলা ও নরম হতে থাকবে।
- ওলান ক্রমেই বড় হতে থাকবে ও বাট দিয়ে দুধের মত কস বের হবে।

অভ্যন্তরীন পরিবর্তন

রেকটাল পালপেশন পদ্ধতিতে গর্ভবতী গাভীর অভ্যন্তরীন পরিবর্তন পরীক্ষা করা হয় এবং এটা প্রজননের ৬-১২ সপ্তাহ পর করতে হবে।

- জরায়ুর গ্রীবা বন্ধ হবে।
- ডিম্বাশয়ে কারপাস লুটিয়াম বড় হতে থাকবে।
- ৯০ দিনের মধ্যে জরায়ুর হর্ণ -দ্বয়ের আকারে অসামঞ্জস্যতা বোঝা যাবে অর্থাৎ গর্ভধারনকৃত হর্ণ-এর বৃদ্ধি হতে থাকবে।
- ৩ মাস ১৫ দিন হতে ৪ মাসের মধ্যে জরায়ূর ধমনীর স্পন্দন স্পষ্ট বোঝা যাবে।

- বাচ্চা বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে পেটের দিকে নেমে যাবে এবং গর্ভবস্থার শেষ পর্যায়ে পেলভিক কেভিটি-তে চলে আসবে।

রেকটাল পালপেশনের মাধ্যমে গর্ভাবস্থা নির্ণয় করার সময় ডিম্বাশয়কে অতিরিক্ত নাড়াচাড়া করা ঠিক নয়, এতে কারপাস লুটিয়াম বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে।

রাসায়নিক পরীক্ষা

এক্ষেত্রে জারন বিজারন ইনডিকেটর ব্যবহার করা হয়। একটি টেষ্ট টিউবে ৩ মিঃ লিঃ গাভীর মূত্রের মধ্যে সাধারণ তাপমাত্রায় ০.৬ মিঃ লিঃ বেনজোয়েট ইনডিকেটর যোগ করতে হবে। টিউবটি একটু ঝাকিয়ে ইনডিকেটর ও মূত্র ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে,এবং ৩০ সে. সময় অপেক্ষা করতে হবে। ইনডিকেটর ও মূত্রের মিশ্রণটি সবুজ বর্ণ ধারণ করবে। গাভীটি গর্ভবতী হলে ১০ মিনিট রেখে দিলেও মিশ্রণটি বর্ণহীন হবে না, কিন্তু গর্ভহীন গাভীর মূত্র হলে মিশ্রণটি ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই পূর্বের বর্ণ ধারণ করবে।

গর্ভস্থ বাচ্চার দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্রঃ

বাচ্চার দৈর্ঘ্য = ক(ক+২) সেন্টিমিটার

ক = গর্ভাবস্থার মাসের সংখ্যা।

সারণী ১৮.১ গর্ভাবস্থার বিভিন্ন সময়ে বাচ্চার দৈর্ঘ্য ও ওজন ঃ

গর্ভস্থ বাচ্চার বয়স	গর্ভস্থ বাচ্চার দৈর্ঘ্য	গর্ভস্থ বাচ্চার ওজন
০-৩০ দিন	১ সেঃ মিঃ	০.০০১ পাউন্ড
৩১-৬০ দিন	৭ সেঃ মিঃ	০.০১৩ পাউন্ড
৬১-৯০ দিন	১৪ সেঃ মিঃ	০.১৬০ পাউন্ড
৯১-১২০ দিন	২৭ সেঃ মিঃ	০.৭৩০ পাউন্ড
১২১-১৫০ দিন	৩৮ সেঃ মিঃ	৩.৬ পাউন্ড
১৫১-১৮০ দিন	৪৬ সেঃ মিঃ	৮.৪ পাউন্ড
১৮১-২১০ দিন	৬২ সেঃ মিঃ	২১ পাউন্ড
২১১-২৪০ দিন	৭৩ সেঃ মিঃ	৩৯ পাউন্ড
২৪১-২৭০ দিন	৯৫ সেঃ মিঃ	৬৩ পাউন্ড
২৭১ হতে প্রসব পর্যন্ত	৯৯ সেঃ মিঃ	৮৮ পাউন্ড

১৮.৬ গাভীর গর্ভপাতের কারণ।

নির্দ্ধারিত সময়ের আগে অপরিণত বয়সে মাতৃগর্ভ থেকে বাচ্চা বের হয়ে আসলে তাকে গর্ভপাত বলে। সাধারণতঃ রোগ জীবাণুর সংক্রমণ, শারীরিক আঘাত, বিষক্রিয়া, ত্রুটিপূর্ণ চিকিৎসা, গর্ভাবস্থায় ভুলকরে প্রজনন, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি কারণে গাভীর গর্ভপাত হতে পারে।

রোগ জীবাণুর সংক্রমণঃ গবাদী প্রাণিতে ব্রুসেলোসিস, ভিব্রিওসিস, ট্রাইকোনিয়াসিস, লেপটোসপিরোসিস ইত্যাদি রোগ গর্ভপাতের কারণ। তাছাড়া এ্যনথ্রাক্স,ক্ষুরারোগ, গলাফুলা, গো-বসন্ত,ইত্যাদির মত মারাত্মক রোগের কারণেও গর্ভপাত হতে পারে।

শারীরিক আঘাতঃ গর্ভাবস্থায় কোন মারাত্মক আঘাত, আছাড় পড়া, অতিরিক্ত লাফালাফি, ছুটাছুটি বা কাজের চাপেও গর্ভপাত হতে পারে।

পুষ্টিহীনতাঃ অপুষ্টিজনিত কারণেও গাভীর গর্ভপাত হতে পারে। ভিটামিন এ, ও কিছু খনিজ পদার্থ যেমন - ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়োডিন, কোবাল্ট ইত্যাদির অভাবে গাভীর অনুর্বরতা ও গর্ভপাত হয়।

বিষক্রিয়াঃ বিভিন্ন রাসায়নিক ও ভেষজ পদার্থ যেমন- পটাশিয়াম নাইট্রেট, সিসা ও আরসেনিক জাতীয় ঔষধ এবং ষ্টিলবেষ্টেরল ও ইসট্রোজেন হরমোন গর্ভকালের যে কোন সময় গর্ভপাত ঘটাতে পারে।
ত্রুটিপূর্ণ চিকিৎসাঃ কোন কোন সময় রোগের ত্রুটিপূর্ণ চিকিৎসার ফলেও গর্ভপাত হতে পারে।
গর্ভাবস্থায় ভুলকরে প্রজননঃ অনেক সময় গাভী গর্ভধারণ করলেও গরম হতে পারে (৩-৭%) অথবা যদি গাভীর কোন আচরণকে গরমের লক্ষন বলে ধরে নিয়ে প্রজনন কারার ব্যবস্থা নেওয়া হয় তবে গর্ভপাত হয়ে যায়।

১৮.৭ গাভীর বন্ধ্যাত্ব ও অনুর্বরতার কারণ, লক্ষন ও প্রতিকার

একজন গাভী পালন্‌কারীর নিকট সময় মত গাভীর গর্ভধারণ অত্যন্ত জরুরী। সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতাকে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা বলে। একটি গাভীতে বিভিন্ন কারণে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা যেতে পারে। যেমন-
গঠন জনিত ঃ শরীরের অনেক জন্মগত বা বংশগত ত্রুটিজনিত কারণে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা হয়। যেমন- ডিম্বাশয়, সার্ভিক্স ইত্যাদির অস্বাভাবিকতা। গাভীর জমজ বাচ্চা জন্মের ফলে একটি এড়েঁ অন্যটি বকনা হলে সাধারনতঃ ৯১% ভাগ ক্ষেত্রে বকনা বাছুরটিকে বন্ধ্যা হতে দেখা যায়, একে ইংরেজীতে ফ্রিমার্টিন বলে। অনেক প্রাণিতে আবার অংগের কোন একটি অংশ থাকে না বা ঠিক মত বিকাশ লাভ করে না, এসব ক্ষেত্রেও প্রাণি বন্ধ্যা হয়। ক্রোমোজম সংখ্যার তারতম্য হলেও প্রাণি বন্ধ্যা হয়।
দূর্ঘটনা জনিতঃ প্রজনন তন্ত্রে যে কোন ধরনের আঘাতের ফলে অথবা জরায়ুর বহির্গমন, যোনির বহির্গমন ইত্যাদির কারণে গাভী বন্ধ্যা বা অনুর্বর হতে পারে।
শরীর বৃত্তীয় কারণঃ বিভিন্ন হরমোনের অভাব ও অনিয়মিত ক্ষরণের ফলে গাভীতে বন্ধ্যা বা অনুরবরতা দেখা দেয়। যেমন- ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন, লিউটিনাইজিং হরমোন, প্রোজেষ্টেরন হরমোন ইত্যাদি। এছাড়াও ডিম্বাশয়ের বিভিন্ন রোগ যেমন- স্থায়ী করপাস লিউটিয়াম, সিষ্ট, ফলিকুলার এট্রফি ইত্যাদি।
পুষ্টিগতঃ সুষম খাদ্যের অভাবে গাভীতে বন্ধ্যা বা অনুরর্বরতা দেখা যায়। যেমন- ভিটামিন-এ, ডি,ই ও খনিজ পদার্থের মধ্যে ফসফরাস, কপার, কোবাল্ট ইত্যাদির অভাবে বন্ধ্যা বা অনুরর্বরতা দেখা যায়। ক্যালসিয়ামের অভাবে বন্ধ্যাত্বের কোন প্রমাণ নেই তবে ফসফরাস শরীরে কাজে লাগার জন্য খাদ্যে ক্যালসিয়াম অপরিহার্য। প্রাণির খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত ২ঃ১ হওয়া বাঞ্ছনীয়।
মনস্তাত্বিকঃ ভয় বা স্নায়ুবিক উত্তেজনার ফলে প্রাণির গর্ভধারন বিঘ্নিত হতে পারে। বিশেষতঃ বকনার ক্ষেত্রে প্রজনন ভিতি বা অস্থিরতা অথবা মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনার বশে এ ধরনের অনুর্বরতা দেখা যায়।
রোগ জনিতঃ বিভিন্ন সংক্রামক যৌন রোগ যেমন-ব্রুসেলোসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, ভিব্রিওসিস, লেপটোসপাইরোসিস ইত্যাদি রোগ অথবা জনন তন্ত্রের অন্যান্য যেমন- মেট্রাইটিস, সার্ভিসাইটিস, পায়োমেট্রা, সালফিনজাইটিস ইত্যাদি রোগে গাভী বন্ধ্যা বা অনুর্বর হয়।
বংশগতঃ অনেক সময় বংশগত কারণে প্রাণি বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা যায়। যেমন- ফ্রি-মারটিন বা হোয়াইট হেইফার ডিজিজ হলে প্রাণি বন্ধ্যা হয়।
ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনাঃ লালন-পালন ও ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির কারনে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা যায়। যেমন অযত্ন, অবহেলা, অপর্যাপ্ত খাদ্য, অনিয়মিত দুধ দোহন, প্রসবকালীন অবহেলা, ইত্যাদি।
অন্যান্যঃ বিভিন্ন বিষয় যেমন- প্রাণির বয়স,ঋতু, তাপমাত্রা, আলো ইত্যাদি প্রাণির উর্বরতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণতঃ ৪ বছর বয়স পর্যন্ত গাভীর উর্বরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে ও ৬ বছর পর্যন্ত তা বিরাজ থাকে। কিন্তু ৬ বছর পর থেকে উর্বরতা হ্রাস পেতে থাকে। গাভী সাধারণতঃ বসন্তকালে অধিক উর্বও থাকে।

বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতার লক্ষণ

- গাভী বাচ্চা প্রসবের ৯০-১০০ দিনের মধ্যেও গরম হয় না।
- সব সময় গরম থাকে বা অনিয়মিতভাবে গরম হয়।
- ১৫ দিনের কম সময় বা ২৮ দিনের বেশী সময় পর পর গরম হয়।

- দীর্ঘদিন অর্থাৎ গাভী এক বছর বা অধিক সময় গরম না হওয়া।
- স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র থেকে ঘোলা, পুজ বা রক্ত মিশ্রিত মিউকাস নির্গত হওয়া।
- গর্ভপাত হওয়া।
- তিন বারের অধিক প্রজননের পরও গর্ভধারণ না করা।
- গর্ভফুল না পড়া, জরায়ুর বহির্গমন ইত্যাদি।

বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা প্রতিকারের উপায়

- স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন করতে হবে।
- সুষম খাদ্য খাওয়াতে হবে।
- সঠিকভাবে গাভীর গরমকাল নির্দ্ধারণ করে সময়মত প্রজননের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
- প্রজনন তন্ত্রে কোন অসুখ থাকলে সময়মত তার চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- প্রসবের সময় সঠিক যত্ন নিতে হবে।
- প্রসবের পর কমপক্ষে ৬০-৯০ দিনের মধ্যে পুনরায় প্রজনন করাতে হবে।

উৎসঃ

* কৃত্রিম প্রজনন নির্দেশিকা - প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
* কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস চাষ ম্যানুয়েল - প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
*আধুনিক প্রাণিপালন ও ব্যবস্থাপনা ট্রেনিং ম্যানুয়েল - প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মডিউল-১৯ ঃ
বাছুর পালন

বাছুর পালনকে সাধারনত পালের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কারণ আজকের বাছুর আগামীদিনের ভবিষৎ। বাছুর লালন-পালন যদি যথাযথ না করা হয় তবে ভবিষ্যৎ উৎপাদন হ্রাস পাবে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গাভীর উৎপাদন ক্ষমতা বজায় থাকে। পর্যায়ক্রমে উন্নত জাত এবং উৎপাদনশীল গাভী দ্বারা কম উৎপাদনশীল গাভীকে অপসারনের মাধ্যমেই উচ্চ উৎপাদনশীল পাল গঠন করা সম্ভব। তাই বাছুর লালন-পালন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯.১.১ বাছুরের পরিচর্যা/যত্ন

বাছুরের গর্ভকালীন যত্ন ঃ বাছুরের গর্ভকালীন যত্ন বলতে প্রধানত মায়ের যত্নই বুঝায়। এক্ষেত্রে গর্ভবতী গাভীকে অন্তত গর্ভের শেষ তিনমাস পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ করতে হবে। দুধ দোহানো হলে ধীরে ধীরে শেষ তিন মাসে শুকিয়ে ফেলতে হবে। গাভীকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। অন্য গরুর সাথে যেন মারামারি না করে তা খেয়াল রাখতে হবে। প্রসব নিকটবর্তী হলে মেটারনিটি পেন বা আলাদা স্থানে রাখতে হবে।

জন্মের প্রাক্কালে যত্নঃ গাভী প্রসবের প্রাক্কালে গাভীকে অবশ্যই আলাদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শুকনো জায়গায় রাখতে হবে। অপরিষ্কার স্যাঁতসেতে জায়গাতে বাছুর প্রসব করলে বাছুরের বিভিন্ন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে। স্বাভাবিক প্রসবের লক্ষণ ব্যতীত অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পেলে প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহন করা কর্তব্য । এ সময় শুকনো খড় বিছিয়ে দিয়ে পাশে পর্যাপ্ত খাওয়ার পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

জন্মের পর বাছুরের যত্নঃ জন্মের পর পরই বাছুরকে শুকনো খড়কুটো বা ছালার উপর রাখতে হবে। বাছুরের নাক ও মুখ মন্ডল হতে লালা বা ঝিল্লি পরিষ্কার করতে হবে। নতুবা শ্বাসরূদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি বাছুরের শ্বাস- প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তবে বুকের পাঁজরের হাড়ে আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ পর পর কয়েক বার চাপ প্রয়োগ করতে হবে। বাছুরের নাকে, মুখে, নাভীতে ফুঁ দিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রয়োজনে শ্বাস-প্রশ্বাস বর্ধনকারী ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। জন্মের সাথে সাথে বাছুরের নাভীতে কিছু এন্টিসেপটিক যেমন টিংচার আয়োডিন, ডেটল বা সেভলন লাগাতে হবে। ফলে ধনুষ্টংকা, নাভী ফুলা ইত্যাদি হবার সম্ভাবনা থাকে না। গাভী যেন তার বাছুরকে চাটতে পারে সে সুযোগ করে দিতে হবে অথবা শুকনা খড় বা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বাছুরের শরীর ভাল ভাবে মুছে দিতে হবে। এ অবস্থায় বাছুরকে পানি দিয়ে ধৌত করা সমীচিন হবে না। কারণ, পানির সংস্পর্শে আসলে বাছুরের ঠান্ডা লেগে যেতে পারে এবং নানা ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। বাছুর উঠে দাঁড়ালে বাছুরকে শালদুধ খাওয়াতে হবে।

বাছুরের অন্যান্য যত্ন ঃ বাছুরের প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সময় মত খাদ্য ও পানি সরবরাহ দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে। বৃহত খামারে প্রতিটি বাছুরকে আলাদা করে চেনার জন্য প্রয়োজনীয় ট্যাগ নম্বর দিতে হবে। বাছুর বড় হওয়ার সাথে সাথে শিং কেটে ফেলাই ভাল। তা না হলে বিভিন্ন ধরনের দূর্ঘটনা ঘটতে পারে।

১৯.১.২ বাছুরের বাসস্থান

বাছুরের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান অত্যন্ত প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান বাছুরকে রোগমুক্ত রাখার প্রধান সহায়ক। বাছুরকে রোগমুক্ত রাখার জন্য তাদেরকে আলাদা আলাদা ঘরে রাখতে হবে এবং এর ফলে প্রতিটি বাছুরের রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হবে। অনেক বাছুর একসাথে থাকলে দূর্বল বাছুরগুলো আরও দূর্বল হয়ে পড়ে। কারন দূর্বলগুলো সবলদের সাথে প্রতিযোগীতা করে প্রয়োজন মত খেতে পারে না। বাছুরের ঘর ঢালু এবং শুকনো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত । বাসস্থানে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের সরাসরি প্রবেশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম ও শীতকালে প্রচন্ড ঠান্ডা দ্বারা বাছুরগুলো যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ঘরের মেঝেতে শুকনো খড় বা ছালার চট বিছিয়ে দিতে হবে। গ্রামীণ পর্যায়ে বাঁশ ও কাঠের সাহায্যে অতি সহজেই ঘর নির্মাণ করা যেতে পারে। ঘরে খাদ্য ও পরিষ্কার পানি সরবরাহের জন্য পাত্র রাখতে হবে। বাছুরের ঘর সেঁতসেঁতে ময়লা আবর্জনাময় হলে বাছুরের শ্বাস কষ্ট হয়। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বাছুরকে তিন দলে ভাগ করা যায়।

চিত্র ১৯.১ ঃ বাছুরের বাসস্থান

ক। এক বছরের কম বয়সী।

খ। এক বছরের বেশী বয়সী বকনা বাছুর।

গ। এক বছরের বেশী বয়সী এঁড়ে বাছুর।

বাছুরকে তিন সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পৃথকভাবে ও পরে ৩ মাস বয়স পর্যন্ত ৪-৫ টির দল করে পৃথকভাবে লালন পালন করা উত্তম। এক বছরের কম বয়সী বাছুরের ঘর মায়ের কাছাকাছি ও মুক্তভাবে ঘোরা ফেরার জন্য ঘরের সাথে উন্মুক্ত স্থান থাকবে। বাছুরের ঘরে মাঝ বরাবর পথের দুপার্শ্বে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা ও উভয় পার্শ্বে মুক্তভাবে চলাফেরার জন্য উন্মুক্ত স্থান থাকবে।

সারণী ১৯.১ ঃ বাঁধা ঘরে বাছুরের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা

বয়স	ঘরে স্থান (বর্গমিটার)	মুক্তভাবে বিচরণের উন্মুক্ত স্থান (বর্গমিটার)
১-৩ মাস	১.৮-২.৩	০.৯-১.৮
৩-৬ মাস	২.৩-২.৮	২.৮-৩.৭
৬-১২ মাস	২.৮-৩.৭	৪.৬-৫.৫
১২ মাস	৩.৭-৪.৬	৫.৫-৯.২

১৯.২ ও ৩ বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

বাছুরের জন্মের পর থেকে ৩ মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরকে যতটুকু পুষ্টিসাধন করা হবে পরবর্তী জীবনকালের বৃদ্ধি ও উৎপাদন তার উপর সিংহভাগ নির্ভর করবে। জন্মের প্রথম দিন থেকে সাধারণতঃ ৩ মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরের দৈহিক বৃদ্ধি ও ওজন দ্রুত বাড়তে থাকে। এ সময় যদি শরীরে পুষ্টির অভাব হয় তবে এর যৌনাঙ্গের বিকাশ, যৌবন প্রাপ্তি দেরীতে আসবে যার ফলে গর্ভ ধারণ ও বাচ্চা উৎপাদন কম হবে। অনেক ক্ষেত্রে বাছুর পুষ্টির অভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে মারাও যেতে পারে। এসব কারণে জন্মের পর থেকেই পরিমিত খাদ্য সরবরাহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

কলোস্ট্রাম বা কাচলা বা শালদুধ বাচ্চা জন্মের প্রথম দুই ঘণ্টার মধ্যে খাওয়ানো প্রয়োজন। এই দুধ বাছুরের জন্য অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য। কেননা এই দুধে এমন কতগুলি উপাদান ও এন্টিবডি রয়েছে যা বাছুরকে বিভিন্ন রোগ বালাই হতে রক্ষা করে। অথচ গ্রামে অনেকেই গাভী প্রসবের পর এই শালদুধ বাছুরকে না খাওয়ায়ে পানিতে ফেলে দেয়। শালদুধ বাছুরকে একদিকে খাদ্য সরবরাহ করে অন্যদিকে বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শালদুধে প্রোটিনের ভাগ অত্যন্ত বেশী। এছাড়া এই দুধে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ’এ’ যা বাছুরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এ শালদুধ বাছুরের রেচন কার্যের জন্য পরিপাক তন্ত্রকে পরিষ্কার করে এবং উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

চিত্র ১৯.২ ঃ বাছুর মায়ের দুধ খাচ্ছে

জন্মের পর থেকে ৪-৬ মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরকে দুধ খাওয়ানো উচিত। তবে ১ম মাসে ৩-৪ লিটারের বেশী দুধ না খাওয়ানোই ভাল। এরপর দুধ না খাওয়ালেও বাছুরের সুষম বর্ধন এবং স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না। বাচ্চাকে গাভী থেকে দুধ চুষে খেতে দিতে হবে । এতে গাভী বেশী দুধ দিবে এবং গাভী দেরীতে দুগ্ধহীনা হবে। সাধারণতঃ বাছুরকে দুবেলা দুধ খেতে দিতে হবে এবং নিয়মিত একই সময়ে দুধ খাওয়াতে হবে। দেড় মাস বয়স পর্যন্ত শারীরিক ওজনের শতকরা ১০ ভাগ হারে দুধ খাওয়াতে হবে। দুই সপ্তাহ পর বাচ্চকে দুধ সরবরাহের সাথে সাথে অল্প পরিমাণ কচি ঘাস ও দানাদার খাদ্য খাওয়ানো উচিত। নতুবা এর হজম ক্ষমতা কমে যাবে এবং পাকস্থলির পরিপক্কপতা দেরীতে আসবে।

সারণী ১৯.২ ঃ জন্ম থেকে দুধ ছাড়া পর্যন্ত বাছুরের দুধ সরবরাহ

বয়স	দৈনিক	মন্তব্য
০-৭ দিন (১ম সপ্তাহ পর্যন্ত)	২ লিটার শালদুধ	(ক) ১-২ ঘণ্টা বয়স থেকে ৭ দিন পর্যন্ত শালদুধ খাওয়াতে হবে। দানাদার ও খড় ঘাসের প্রয়োজন নেই। (শরীরের ওজনের ১০% হারে দুধ খাওয়াতে হবে)
২য় সপ্তাহ	৩ লিটার	(খ) ২ সপ্তাহ পর থেকে দানাদার খাদ্য অর্থাৎ কাফ স্টার্টার (২০% আমিষ সমৃদ্ধ) এবং কিছু কচি সবুজ ঘাস বাছুরকে সরবরাহ করতে হবে।
৩য়-১২ সপ্তাহ	৪ লিটার	(গ) ৮ সপ্তাহ বয়স থেকে দৈনিক ০.৫ কেজি দানা খাদ্য এবং ১ কেজি হারে উচ্চ মানের কচি নরম সবুজ ঘাস দিতে হবে।
১৩-১৬ সপ্তাহ (৪ মাস)	৩ লিটার	(ঘ) ৪ মাস বয়সের বাছুরকে দৈনিক ০.৭৫ কেজি দানা খাদ্য এবং ৩ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস দিতে হবে।
১৭-২০ সপ্তাহ (৫ মাস)	২ লিটার	(ঙ) ৫-৬ মাস বয়স এর বাছুরকে দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি দানা খাদ্য এবং ৭ কেজি কাঁচা নরম সবুজ ঘাস সরবরাহ করা উচিত। দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না।
২১-২৪ সপ্তাহ	১ লিটার	ঐ

সারণী ১৯.৩ ঃ বাছুরকে সরাসরি মায়ের (গাভীর) দুধ খাওয়ানো

বয়স	খাদ্য
১ম সপ্তাহ	গাভীর বাট চুষে বাছুরকে দৈনিক সকাল বিকাল শালদুধ খাওয়াতে হবে (২-৩ বার)
২য় সপ্তাহ	গাভীর স্বাভাবিক দুধ সকালে এবং বিকালে প্রয়োজনমত খাওয়াতে হবে।
৩-২৪ সপ্তাহ	সকালে এবং বিকালে প্রয়োজনমত দুধ খাওয়াতে হবে। সবুজ কচি নরম ঘাস ও দানা খাদ্য খাওয়াতে হবে।
২৫-৫০ সপ্তাহ	দুধের সাথে দৈনিক ১-১.৫ কেজি দানা খাদ্য, ৮ কেজি সবুজ নরম ঘাস অথবা ২-২.৫ কেজি খড় খাওয়াতে হবে।
১২ মাস (উর্ধ্বে)	দৈনিক ১.৫-২ কেজি দানা খাদ্য, ১২-১৫ কেজি কচি সবুজ নরম ঘাস অথবা ৩-৪ কেজি শুকনা খড় দরকার

সংকর জাতের বাছুরকে বালতিতে দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস করালেও স্বাস্থ্যের তেমন ক্ষতি হয় না। তবে খাওয়ানোর বাসনপত্র সব সময় জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে এবং শরীরের তাপমাত্রায় দুধ গরম করে খাওয়াতে হবে। তাপমাত্রার গরমিল হলে বদহজম বা পীড়া দেখা দিতে পারে।

বাছুরের জন্য খাদ্যের ফরমূলা

(ক) বাছুরের জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ ফরমূলা

১. গমের ভুষি ৩০%
২. খেসারী ভাংগা ১০%
৩. ছোলা ভাংগা ১০%
৪. বার্লি ২০%
৫. তিলের খৈল ১০%
৬. মাটি কলাই ভাংগা ১০%
৭. ভুট্টা ভাংগা ৫%
৮. খনিজ দ্রব্য ৪%
৯. লবণ ১%

(খ) মিল্ক রিপ্লেসার ঃ ইহা বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত এক প্রকার প্রাণিখাদ্য যা দুধের সমস্ত উপাদান দ্বারা গঠিত এবং দুধের পরিবর্তে ব্যবহার উপযোগী। মিল্ক রিপ্লেসার এর উপকরণগুলি নিম্নরূপ-

স্কিম মিল্ক পাউডার	৫৫ কেজি
ছানার পানি	৩৫ কেজি
চর্বি (তৃণজ বা উদ্ভিজ)	১০ কেজি
ওরিওমাইসিন	২০০০ আই, ইউ
খাদ্য প্রাণ- 'এ' এবং 'ডি'	১০০০ ইউ,এস, পি।

(গ) কাফ স্টারটার ঃ ইহা বাছুরের উপযোগী বিশেষ দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ যাতে ২০% এর অধিক পরিপাচ্য আমিষ এবং ১০% এর কম আঁশ যুক্ত খাদ্য থাকে।

তুলাবীজ (২০% ডি, পি ও ৭% আঁশ)	৩৮ কেজি
ভুট্টা	৩০ কেজি
যব	১০ কেজি
ছানার গুঁড়া	১০ কেজি
গমের ভুষি	১০ কেজি
হাড়ের গুঁড়া (বিশোধিত)	১ কেজি
লবণ	১ কেজি
মোট	১০০ কেজি

১৯.৪ বাছুরের স্বাস্থ্য বিধি, রোগ ব্যাধি ও প্রতিকার

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে " Prevention is better than cure" অর্থাৎ রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ যাতে না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করাই বুদ্ধি মানের কাজ। বাছুরের স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগমুক্ত রাখার জন্য বিশেষ কয়েকটি নিয়মের প্রতি খেয়াল রাখলে ভবিষ্যতে অসুখ- বিসুখ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

১. জন্মের পরপরই বাছুরকে শালদুধ খাওয়াতে হবে। যেহেতু শালদুধ অধিক পরিমাণে 'এন্টিবডি' দ্বারা গঠিত সেহেতু নবজাত বাছুরের জন্য ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই শালদুধ খাওয়ালে বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
২. স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, পরিষ্কার সুষম খাদ্য, পরিষ্কার পানি, সেবা-যত্ন ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার।
৩. বাছুর গুলোকে পৃথক পৃথক রাখা উচিত। সুস্থ্য বাছুরকে কোন অবস্থাতেই রোগাক্রান্ত প্রাণির সংস্পর্শে যেতে দেয়া যাবে না। এতে রোগ সংক্রমনের ভয় থাকে।
৪. বাছুরের শরীর নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত। শুকনো খড় দ্বারা তাদের শরীর ঘসে পরিষ্কার করে গোসল করানো প্রয়োজন।
৫. খাবার পাত্র ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত।
৬. কুকুর, বিড়াল, উকুন, আটালী, মশা-মাছি, পোকা-মাকড় এ সবের যেন উপদ্রব না থাকে তা খেয়াল রাখা উচিত।
৭. কোন রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া বা অসুস্থতা দেখা দেয়ার সাথে সাথে সেটাকে আলাদা করে ত্বরিত চিকিৎসার ব্যবস্থা ও পরিচর্যা করা উচিত।
৮. রোগে কোন বাছুর মারা গেলে তা মাটিতে পুতে রাখা বা পুড়ে ফেলা উচিত।
৯. বছরে দুইবার অর্থাৎ বর্ষার প্রারম্ভে ও শরতের শেষে নির্দিষ্ট মাত্রায় কৃমি নাশক ঔষধ ব্যবহার করলে বাছুরের দৈহিক বৃদ্ধি ভাল হয়।
১০. যে সব রোগের প্রতিষেধক টিকা আছে, সময়মত সে সব টিকা দেয়া।

বাছুরের রোগ ব্যাধি

জন্মের পর থেকেই বাছুরের নানাবিধ রোগ-ব্যাধি হতে পারে। বাছরের জন্য যে কোন রোগই মারাত্মক। কারণ বয়স্ক প্রাণির চেয়ে বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ বাছুরের যে সব রোগ হয়, সেগুলো হলো

ক) সংক্রামক রোগ
খ) কৃমি বা পরজীবীজনিত রোগ
গ) প্রোটজোয়াজনিত রোগ
ঘ) সাধারণ রোগ-ব্যাধি।

ক) সংক্রামক রোগ

বাছুরের নানা ধরনের সংক্রামক রোগ হয়ে থাকে, যার মধ্যে মারাত্মক রোগগুলো হলো-
১।সাদা বাহ্য বা কাফ স্কাওয়ার ২.নেভাল ইল বা নাভীর রোগ ৩. সালমোনেলোসি ৪. বাছুরের ডিপথেরিয়া ৫. নিউমোনিয়া ৬. বাদলা ৭. তড়কা ৮. গলাফুলা ৯. ধনুস্টংকার ১০.ক্ষুরারোগ ১১. জলাতংক ১২. গো-বসন্ত।

খ) কৃমি বা পরজীবীজনিত রোগ

পরজীবী অর্থ পরের উপর জীবনধারণকারী। বাছুরের উপর বিভিন্ন পরজীবী জীবনধারণ করে থাকে। যেগুলো বাছুরের কোন উপকার না করে ক্ষতিসাধন করে থাকে। পরজীবী সাধারনত দুই ধরনের হয় যেমনঃ-
(১)দেহাভ্যন্তরের পরজীবী (২) বহিঃদেহের পরজীবী

দেহাভ্যন্তরের পরজীবীঃ এটি কৃমি। বাছুর খুব তাড়াতড়ি এ কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশে বেশির ভাগ বাছুরই দেহাভ্যন্তরের পরজীবী অর্থাৎ কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। দেহাভ্যন্তরের পরজীবী সাধারনত তিন ধরনের হয় যেমন-
১)গোল কৃমি ২) ফিতা কৃমি ৩) পাতা কৃমি
দেহাভ্যন্তরের পরজীবী বাছুরের অনেক ক্ষতি করে কেননা তারা শরীর হতে পুষ্টি গ্রহণ করে। তাই এসব পরজীবী দমনে বাছুরকে দু'মাস বয়স হলে কৃমিনাশক খাওয়ানো আরম্ভ করতে হবে।

বহিঃদেহের পরজীবীঃ এগুলোকে দেহের পোকা বলা হয়। বাছুরের ত্বকে বাস করে ত্বকের যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। বহিঃদেহের পরজীবীর মধ্যে বাছুরে আঁঠালি, উকুন, মাছি, মাইটস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহিঃদেহের পরজীবী দমনে বাছুরের শরীর ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে। বাছুরের বয়স ৬ মাস হলে বহিঃদেহের পরজীবী ধ্বংসকারী ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

গ) প্রোটোজোয়াজনিত রোগ

প্রোটোজোয়া এক প্রকার এককোষী জীব বা আদ্যপ্রাণী। বাছুর বিভিন্ন ধরনের প্রোটোজোয়া যেমন ঃ বেবেসিয়া, এনাপ্লাজমা, ককসিডিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। তবে বাছুরে সাধারণতঃ ককসিডিয়া নামক প্রোটোজোয়ার আক্রমণ বেশী হতে দেখা যায়।

ঘ) সাধারণ রোগ-ব্যাধি

বাছুরের সাধারণতঃ রোগ-ব্যাধির মধ্যে রয়েছে বিষক্রিয়াজনিত রোগ, অপুষ্টিজনিত রোগ, পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ যেমন ঃ পেট ফাঁপা, উদারাময়, কোষ্ঠকাঠিণ্য এবং বিপাকীয় রোগ।

বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

লাভজনক গবাদি প্রাণি পালনে রোগবালাই অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ সমস্যাকে কার্যকরী ভাবে প্রতিহত করতে হবে। যে সকল রোগের টিকা পাওয়া যায় সে সকল রোগের টিকা সঠিক সময়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া বাছুর বিভিন্ন কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে কেঁচো কৃমি বাছুরের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে থাকে। মায়ের রক্ত প্রবাহের সাথে গর্ভস্থ বাচ্চা এবং মায়ের দুধের মাধ্যমেও বাছুর এ কৃমি দ্বারা আক্রান্ত

হয়। বাছুর জন্মের পর পরই এক সপ্তাহ বয়সের মধ্যেই বাছুরের ওজন অনুপাতে সুবিধাজনক কোন কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।

হঠাৎ করে কোন কারণে বাচ্চা যেন অসুস্থ হয়ে না পড়ে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার:

১। গাভীর খাবারে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন থাকা প্রয়োজন। এতে করে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

২। বাচ্চা জন্ম নেবার ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত বাচ্চাকে প্রচুর পরিমাণে গাভীর শালদুধ খাওয়াতে হবে। এতে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হবে।

৩। দূর্বল বাছুরকে প্রচুর দুধ খাওয়াতে হবে।

৪। বাছুরকে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো স্থানে রাখতে হবে।

৫। খাবারের পাত্র ও পানির পাত্র সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৬। হঠাৎ বাছুরের যেন ঠান্ডা বা গরম না লাগে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৭। কয়েক দিন পর পর পরিষ্কার করে বিছানা বদল করে নতুন করে শুকনা খড় দিয়ে বিছানা করে দিতে হবে।

উৎসঃ

*গাভী পালন গাইড - এ. টি. এম. ফজলুল কাদের

* প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা - বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট

*বাছুর, গাভী ও ছাগল পালন - বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

মডিউল-২০ ঃ
গাভী পালন

নিজস্ব পরিবেশে নিজ বাড়িতে ১-৫টি গাভী পালন করাকে পারিবারিকভাবে গাভী পালন বুঝায়। পরিবারের আকার, জীবনযাত্রার মান ও মূলধনের উপর গাভীর সংখ্যা নির্ভর করে। অনেকে অন্যের গাভী বর্গা নিয়ে পালন করে থাকে। গাভী পালন পরিবারের সচ্ছলতা ও আয় বৃদ্ধি করে ও পাশাপাশি দুধের চাহিদা মেটায়। গাভী পালনের জন্য পালনকারীকে গাভী পালনের বিবেচ্য বিষয়, বাসস্থান, খাদ্য, গোসল বা ব্রাশ করানো সহ সর্বাবস্থায় গাভীর পরিচর্যা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। গাভী পালনের মাধ্যমে বেকার যুবকদের বেকারত্ব দূর হয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

২০.১ গাভী পালনের বিবেচ্য বিষয়

১। গাভীর জাত ঃ নিজস্ব পছন্দ, আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে গাভীর জাত নির্বাচন করতে হবে। এলাকার জনগণের চাহিদা ও বাজার দর বিবেচনা করতে হবে, সাধারণতঃ যে গাভী বেশি দুধ দেয় ও পরিবেশের সাথে উপযোগী তাদের পালন করতে হবে।

২। গাভী প্রতি উৎপাদন ক্ষমতা ঃ প্রতিটি গাভীর নিজস্ব উৎপাদনের পরিমাণের একটি নিম্নতম সীমারেখা থাকা উচিত। কোন গাভীর উৎপাদনের ক্ষমতা সীমারেখার নিচে নেমে গেলে তাকে বাদ দিতে হবে। প্রতিটি গাভীর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পালনকারীকে সজাগ দৃষ্টি রেখে কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। গাভীর সংখ্যা ঃ পালনকারীর মূলধন, সুযোগ-সুবিধা এবং ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করেই গাভীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করতে হবে। এ সংখ্যা কোনভাবেই নির্দিষ্ট সংখ্যার কম বা বেশি হবে না। কারণ গাভীর সংখ্যা বাড়ালেই যে সংখ্যানুপাতে আয় বাড়বে তা ঠিক নয়।

৪। গাভীর শারীরিক অবস্থা ঃ গাভীর শারীরিক অবস্থার উপর উৎপাদন নির্ভর করে। গাভী পালনে অবশ্যই গাভীর শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করতে হবে।

৫। গাভীর খাদ্য ঃ খাদ্যের গুণগত মান, ধরন এবং পছন্দ-অপছন্দ ও কোন প্রকারের গাভীকে কখন কিভাবে কতটুকু খাদ্য দিতে হবে তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। গাভীকে জীবনধারণ ও উৎপাদনের জন্য খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

৬। খাদ্য সরবরাহ ঃ গাভী পালনে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা হল প্রধান সমস্যা। গাভীর জন্য কাঁচা ও শুকানো ঘাস, খড় ও বিচালী, ডাল জাতীয় শস্য, গম, ভুট্টা প্রভৃতি নিজস্ব খামারেই উৎপাদন করার ব্যবস্থা রাখা ভাল। দানাদার খাদ্য মৌসুমের সময় ক্রয় করে সংরক্ষণ করে রাখা ভাল।

৭। নতুন গাভীর আমদানি ঃ পালনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ছাঁটাই করা গাভীর জায়গায় উন্নতমানের গাভী আমদানি করতে হবে। গাভীর নিজস্ব উৎপাদন কমে যাওয়া, স্বাস্থ্যহানী, রোগাক্রান্ত গাভী ও সংখ্যা বেড়ে যাওয়া বা অতিরিক্ত গাভী ছাঁটাই করতে হবে।

৮। বিনিয়োগ ঃ গাভী পালনের জন্য ঘর-বাড়ী ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা একান্ত প্রয়োজন। এগুলো ক্রয় করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, এর ফলে শ্রম খরচ ও সময় বাঁচবে কিনা, অনায়াসে কাজ করা সম্ভবপর কিনা, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দুধের গুণাগুণ বৃদ্ধি পাবে কিনা ইত্যাদি বিবেচনা করার পর বিনিয়োগ বাড়ানো যেতে পারে।

৯। বাজার পরিস্থিতি ঃ গাভী পালনে এলাকার লোকজনের চাহিদা, ক্রয় ক্ষমতা, বাজারজাতকরণের সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় মালামাল আনা-নেয়ার জন্য রাস্তা-ঘাট, যানবাহন আছে কিনা তাও দেখতে হবে।

১০। ব্যবস্থাপনা ঃ গাভী পালনে ২৪ ঘন্টার কখন কিভাবে গাভীকে খাওয়াতে হবে, ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে ও উৎপাদনের প্রতি কড়া নজর রাখতে হবে। প্রজনন বিধিসম্মত হচ্ছে কিনা, কি পদ্ধতিতে খামারকে রোগমুক্ত রাখা যায়, উৎপাদিত পণ্য সঠিকভাবে বিতরণ হচ্ছে কিনা, বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঠিকমত জমা হচ্ছে কিনা, পরিবেশ দূষণ মুক্ত থাকছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে।

১১। দ্রব্যের উৎপাদন ঃ গাভী পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল উৎকৃষ্ট মানের দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাংস ইত্যাদি উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করা। উৎকৃষ্টমানের দুধ পাওয়ার প্রথম ও প্রধান শর্ত হল দোহন কাজে নিয়োজিত গোয়ালা, ব্যবহারকৃত পাত্র ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা। দ্বিতীয় শর্ত দুধে জীবাণুর সংখ্যা হ্রাস করা। ৩য় শর্ত অপ্রীতিকর স্বাদ বা গন্ধমুক্ত হওয়া। ৪র্থ শর্ত রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যবান গাভী ও পরিচর্যাকারী। গাভীর ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে মাঝে মাঝে শোধন করতে হবে, যাতে কোন প্রকার মহামারী লাগতে না পারে। এদিকগুলো বিশেষভাবে বিবেচনায় আনতে হবে।

১২। নথিপত্রের ব্যবহার ঃ গাভী পালনে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করার জন্য উপযুক্ত নথি রাখতে হবে। দৈনন্দিন নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করলে খামারের সঠিক চিত্র একনজরে দেখা যায় ও সেভাবে কাজ করা যায়। আয়-ব্যয় নির্ভর করে নথিপত্র বিবেচনা করে কাজ করার উপর।

১৩। গাভীর বংশবৃদ্ধি ঃ সুস্থ, সবল ও দোষমুক্ত গাভী সাধারণতঃ প্রতি বছরই একটি করে বাচ্চা প্রসব করে। গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হলে উৎপাদনক্ষম গাভী পালন করতে হবে ও লাভবান হওয়া যাবে।

১৪। শুরুর সময় ঃ কোন সময় থেকে গাভী পালন শুরু করলে বেশি লাভবান হওয়া যাবে ও গাভীকে প্রতিকূল পরিবেশ থেকে রক্ষা করা যাবে তা বিবেচনা করতে হবে।

১৫। মালিকের নৈপুণ্য ঃ দক্ষতার সাথে কর্মচারী পরিচালনার উপরই সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে। গাভী পালন সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা করার তিনটি মূলমন্ত্র- **১ম** পালনের যাবতীয় কাজের একটি নিখুঁত খসড়া বানানো। ২য় বিভিন্ন শাখার কাজ কর্ম সঠিকভাবে বন্টন করা ও ৩য় ঠিকমত কাজ হচ্ছে কিনা তা দেখাশুনা করা এবং সময়মতো উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়া।

২০.২ অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভীর বৈশিষ্ট্য ও স্কোরকার্ড

যে গাভী অধিক দুধ দেয় তার শারীরিক আকার ও বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখেই গাভীটির দুধ উৎপাদন সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত ধারনা করা যায়। কাজেই কোন ব্যক্তি যখন দুধের জন্য গাভী কিনতে বাজারে বা অন্য কোথাও গরু দেখতে যান তখন গাভীর মালিক বা দালাল গাভীটির দুধ উৎপাদন সম্পর্কে যে তথ্যই দিক না কেন ক্রয়কারী ব্যক্তি যদি অধিক দুগ্ধদানশীল গাভীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা থাকে তবে তিনি নিজেই গাভীটি ভালভাবে দেখে যাচাই করে দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে ধারনা করতে পারবেন।

বেশী উৎপাদনশীল গাভী নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো-

মাথা ঃ মাথা হালকা ও ছোট আকারের, কপাল প্রশস্ত ও উজ্জ্বল চোখ হবে।

দৈহিক আকৃতি ঃ দেহের সামনের দিক হালকা, পিছনের দিক ভারী ও সুসংগঠিত হবে। গাভীর সমস্ত অংগ প্রতঙ্গ সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুগঠিত হবে। দৈহিক আকার আকর্ষণীয় ও শরীরের গঠন ঢিলা হবে।

পাঁজর ঃ পাঁজরের হাড় স্পষ্ট অনুভব করা যাবে ও হাড়ের গঠন ঢিলা হবে।

চামড়া ঃ চামড়া পাতলা হবে। চামড়ার নিচে অহেতুক চর্বি জমা থাকবে না। চামড়ার রং উজ্জল হবে। লোম মসৃণ ও চকচকে হবে।

ওলান ঃ ওলান বড় ও সুগঠিত এবং দেহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। পিছনের দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্ত হবে। বাটগুলো একই আকারের হবে। চারটি বাট সমান দূরত্বে ও সমান্তরাল হবে। ওলান দেখেই দুগ্ধ ধারন ক্ষমতা অনুমান করা যাবে।

দুগ্ধ শিরা ঃ দুগ্ধ শিরা মোটা ও স্পষ্ট হবে। তলপেটে নাভীর পাশ দিয়ে দুগ্ধ শিরা আঁকাবাঁকা ভাবে বিস্তৃত থাকবে।

চিত্র ২০.১ঃ অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভী

গাভী মূল্যায়নের কৃতিত্ব -পত্র (স্কোরকার্ড)

বৈশিষ্ট্য	পূর্ণমান	গাভী	প্রাপ্তমান
(ক) সাধারণ আকৃতিঃ আকর্ষনীয় চেহারা, গাভী সুলভ আকৃতি, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নিখুঁত অঙ্গ প্রতঙ্গ, সুন্দর ও আকর্ষনীয় গতিবিধি।	৩০		
(খ) দুধাল বৈশিষ্ট্য ঃ ঢিলেঢালা শরীর, কৌনিক গঠন, অপ্রয়োজনীয় পেশীমুক্ত, চামড়া পাতলা।	২০		
(গ) দেহের গঠন ঃ দেহের আকার হবে বেশ বড়, দেহের আকার অনুপাতে বুকের ও পেটের বেড় গভীর হওয়া উত্তম। পাঁজরগুলি হবে বেশ ভিন্ন ভিন্ন এবং স্ফীত।	২০		
(ঘ) ওলানের বৈশিষ্ট্য ঃ ওলান হবে বেশ বড় এবং অধিক দুগ্ধ ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন। ওলান শরীরের সঙ্গে শক্তভাবে আটকানো থাকা ভাল। ওলানের গঠন হবে সুন্দর। বাঁটগুলি হবে একই আকারের এবং সমান্তরাল ভাবে সাজানো।	৩০		
মোট	১০০		

২০.৩ গর্ভ কালীন সময়ে গাভীর/বকনার যত্ন ও পরিচর্যা।

গাভী সাধারণতঃ ২৭০-২৯০ দিন নিজ গর্ভে বাছুর বহন করে। এই সময়কে গর্ভকাল(Gestation Preiod) বলে। গর্ভাবস্থায় গাভীর যত্ন ও অন্যান্য পরিচর্যার উপরই স্বাভাবিক প্রসব, ভাল বাছুর, দুগ্ধ উৎপাদন ও পরবর্তী কালে স্বাভাবিক গর্ভধারণ নির্ভর করে। কাজেই গাভী পালনের ক্ষেত্রে গর্ভবতী গাভীর যত্ন ও খাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিম্নলিখিত ভাবে গর্ভবতী গাভীর যত্ন নিতে হবে।

- গাভীর গর্ভধারণ কালের হিসাব ও সম্ভাব্য বাচ্চা প্রসবের তারিখ জানা থাকতে হবে।
- গর্ভকালের সাত মাস পর্যন্ত গাভীর খাদ্য, পরিচর্যা, দুধ দোহন, স্বাভাবিক ভাবেই চলবে। তবে ৭ মাসের পরেই গাভীকে অবশ্যই পৃথক করতে হবে। এই সময় খাদ্য, পরিচর্যা ও বাসস্থান গাভীর অবস্থার উপযোগী হতে হবে।
- পর্যাপ্ত আলো বাতাস যুক্ত সুপরিসর, সহজেই গাভী নড়াচড়া করতে পারে এরকম ঘরে রাখতে হবে।

- গাভীর ঘর দৈনিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে জীবাণুনাশক ঔষধ মিশ্রিত পানি দ্বারা ঘর ধুয়ে দিতে হবে।
- গাভী যেন পড়ে গিয়ে আঘাত না পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- গর্ভবতী গাভীর উপর অন্য কোন গরু বা প্রাণী যেন লাফিয়ে উঠতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- গর্ভাবস্থার ৭-৮ মাস দুধ দোহন বন্ধ করতে হবে। দুধের প্রবাহ বন্ধ না হলে দানা খাদ্য কিছুটা কমিয়ে দিতে হবে তবে এমনভাবে কমানো যাবে না যাতে গাভীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা থাকে।
- গাভীর শোবার জায়গাতে খড় দিয়ে বিছানা তৈরী করে দিতে হবে। বিছানার খড় নোংরা হয়ে গেলে তা পরির্বতন করে দিতে হবে, তাছাড়া বিছানার খড় দৈনিক রোদে শুকাতে হবে।
- গাভীকে কোনক্রমেই ভয় পাওয়ানো, দ্রুত তাড়ানো বা উত্তেজিত / উত্তোক্ত করা চলবে না।
- গর্ভবতী গাভী দ্বারা হালটানা, ভারবহন, ফসল মাড়াই ইত্যদি কাজ করানো যাবে না।
- প্রসবের দুই সপ্তাহ আগে সহজে হজম হয় ও শরীর ঠান্ডা থাকে এমন খাদ্য খাওয়াতে হবে। এ অব স্থায় গাভী যেন পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। শীতের সময় পানি কুসুম কুসুম গরম করে দিতে হবে।
- গরমের দিন হলে গাভীকে প্রতিদিন গোসল করাতে হবে।
- আসন্ন প্রসবা গাভীকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে হবে। প্রসবের ২/৩ দিন আগে থেকে ২৪ ঘন্টা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

২০.৪ গাভী/বকনার প্রসবের পূর্বাভাস এবং করণীয়

লক্ষণ

- গাভীর ওলান বড় হয়ে যাবে ও বাঁট দিয়ে দুধজাতীয় তরল পদার্থ বের হবে।
- যোনিমুখ বড় হয়ে ঝুলে যায় এবং নরম ও ফোলা হয়ে যাবে।
- পেট ঝুলে পড়ে। লেজের গোড়ায় দুই পাশের রগের স্থানে গর্তের মত হবে।
- যোনিমুখ দিয়ে আঠাল তরল পদার্থ নির্গত হবে। গাভী ঘন ঘন প্রস্রাব করার চেষ্টা করবে।
- চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাভাবিক প্রসবের ক্ষেত্রে বাছুরের সামনের দুই পা ও নাক দেখা যাবে।

গাভীর প্রসবকালীন পরিচর্যা

প্রসবকালীন লক্ষন দেখে সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে হবে।

- প্রসবের সময় গাভীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আরামদায়ক বিছানায় লোক চোখের আড়ালে নিরিবিলি স্থানে রাখতে হবে ও কুকুর, বিড়াল, শিয়াল যেন পরিবেশ অশান্ত না করে সেদিকে নজর রাখতে হবে।
- প্রসবের পূর্ব থেকে চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।
- প্রসবের সময় প্রসূত বাচ্চা সাধারনত সামনের দুপায়ের মধ্যে মাথা দিয়ে বেরিয়ে আসবে। এর ব্যতিক্রম হলে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক কাজ করতে হবে।
- প্রসবকালীন সময়ে গাভী বারবার উঠা-বসা করবে। এ সময় সাবধানের সাথে ধীরে ধীরে বাছুরকে বের করতে হবে।
- প্রসবের ২/১ দিন আগে থেকে রাতে পাহারা দিতে হবে যেন গাভী প্রসব করলে গর্ভফুল খেয়ে না খেয়ে ফেলতে পারে। কারণ এতে গাভীর মারাত্মক ক্ষতি হয়।

২০.৫ প্রসবোত্তর গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা

- বাচ্চা প্রসবের পর পরই নিমপাতা বা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর কিছু দানা সহযোগে পানি গরম করে গাভীর জননতন্ত্রের বাইরের অংশ, ফ্লাংক এবং লেজ পরিষ্কার করতে হবে।
- গাভীর ঠান্ডা লাগলে উষ্ণতার ব্যবস্থা করতে হবে।
- কুসুম কুসুম গরম পানি এরকম পানিতে তৈরী গুড়ের সরবত গাভীকে খাওয়ানো যেতে পারে।
- গাভী যাতে নবজাতজক বাছুরকে চাটতে পারে এজন্য বাছুরকে গাভীর কাছে যেতে দিতে হবে।
- প্রসবের পরপরই গাভীকে আংশিকভাবে দোহন করতে হবে।
- সাধারণতঃ প্রসবের ২-৪ ঘন্টার মধ্যেই গর্ভফুল বের হয়ে যায়। ১২ ঘন্টার পরেও গর্ভফুল বের না হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- গর্ভফুল বের হওয়ার সাথে সাথে তা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। গাভী যেন গর্ভফুল না খেয়ে ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- বাছুরকে কাচলা বা কলস্ট্রাম খাওয়ানোর জন্য ওলানের বাঁট চুষতে দিতে হবে।
- গাভীকে প্রথমতঃ হালকা গরম পানিতে গমের ভূষি ভিজিয়ে খেতে দিতে হবে। একই সাথে অল্প পরিমাণ কাঁচা ঘাসও খাওয়ানো যেতে পারে। বাচ্চা প্রসবের ২ দিন পর থেকে গাভীকে দানাদার খাদ্য খাওয়ানো শুরু করতে হবে।
- গাভী দোহনের আগে ও পরে গাভীর ওলান, তলপেট, আশ-পাশ ঈষৎ উষ্ণ গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় দ্বারা মুছে দিতে হবে।
- বাছুরকে দুধ খাওয়ানোর আগে ওলান একইভাবে ধুয়ে মুছে নিতে হবে এবং এক্ষেত্রে প্রথম খানিকটা দুধ ফেলে দিয়ে পরে বাছুরকে খেতে দিতে হবে। কারণ বাঁটের প্রথম দুধে ময়লা ও জীবাণু থাকতে পারে।
- বাছুরকে দুধ চুষে খেতে দেওয়া উচিত, এর ফলে গাভী দেরীতে দুগ্ধহীনা হয়। বাছুর বাঁট চুষলে এক ধরনের ষ্টিমুলেশান হওয়ায় দুগ্ধদানের হরমোন নিঃসৃত হয়।
- গাভীর ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ও শোবার জায়গায় পরিষ্কার শুকনা খড়ের নরম বিছানা করে দিতে হবে।
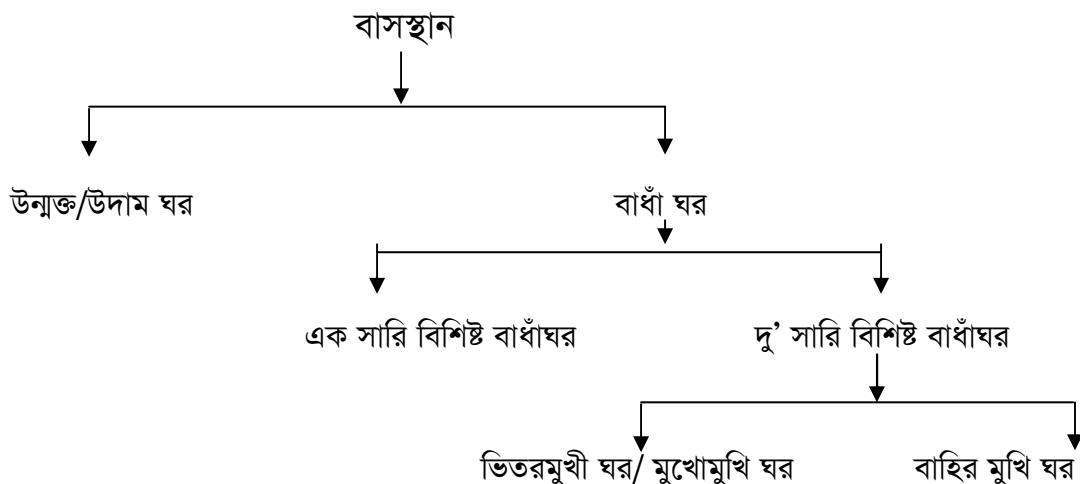
২০.৬ গাভীর বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

বাসস্থান বলতে বিভিন্ন প্রতিকূলতা (যেমন- ঝড়ঝাপটা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোদ, বৃষ্টি ইত্যাদি), বিভিন্ন প্রকার হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ, পোকামাকড়, চোর ও সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা করে গৃহপালিত প্রাণি বা পাখির সঠিক উৎকর্ষ সাধন, উপযুক্ত খাদ্য ব্যবস্থা ও প্রজননে সুযোগ-সুবিধা এবং যাবতীয় পরিচর্যার সুবন্দোবস্ত করে নিরাপদ আশ্রয় দেয়াকে বুঝায়।

উন্মুক্ত বাসস্থান

এ ধরনের বাসস্থানে গবাদি প্রাণিকে ছেড়ে পালন করা যায়। এর ভিতরে আশ্রয়, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, প্রজনন ব্যবস্থা থাকবে। এখানে দুধ দোহন, বাছুর থাকা, বাচ্চা প্রসবের ঘর, খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র ইত্যাদির সুব্যবস্থা থাকবে। মলমূত্র ও ঘর-ধোয়ার পানি যাতে সহজে নিষ্কাশিত হতে পারে তার জন্য ঢালু পাকা ড্রেন থাকবে। ঘরের ছাউনি ঢেউটিন বা অন্য কিছু দিয়ে তৈরী হবে। ঘরের সাথেই প্রাণির মুক্তভাবে চলার জন্য ইটের সোলিং যুক্ত স্থান থাকবে। এখানে প্রাণির জন্য খাদ্য পাত্র ২-২.৫ ফুট এবং খাদ্যের পাত্রের সাথে ১ ফুট চওড়া পানির পাত্র থাকবে। গাভীর ঘরের সাথে একপাশে বাছুরের জন্য পৃথক জায়গা এবং সাথে মুক্তভাবে বিচরণের জন্য খোলা স্থানও থাকবে। এরূপ বাসস্থানে জায়গা বেশী দরকার হয়, ব্যবস্থাপনাও কষ্টকর এবং ব্যয়বহুল।

বাসস্থানের শ্রেণী বিন্যাস

চিত্র ২০.২ ঃ বাসস্থানের শ্রেণীবিন্যাস

সারণী ২০.২ ঃ উন্মুক্ত বাসস্থানে গাভী ও বাছুরের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা

প্রাণির ধরন	ঘরের স্থান/প্রাণি (ব.মি)	উন্মুক্ত স্থান/প্রাণি(ব. মি.)	খাদ্য পাত্র (সে. মি.)
বকনা ও এঁড়ে বাছুর	২.৫-৩	৫-৬	৩৭.৫-৫০
গাভী	৩-৩.৫	৮-১০	৫০-৬০
গর্ভবতী গাভী	১০-১২	১৮-২০	৬০-৭০
ষাঁড়	১২-২৪	২০-২৫	৬০-৭০

বাঁধাঘর

এ ধরনের বাসস্থানে গরু বাঁধা অবস্থায় থাকে। আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনায় এরূপ বাসস্থান তৈরী করা হয়। সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য আধুনিক খামারে সাধারণতঃ দুগ্ধবতী গাভীর, বাচ্চা প্রসবের, অসুস্থ প্রাণির, বাছুরের ও ষাঁড় বা বলদের জন্য আলাদা আলাদা ঘর থাকা দরকার। এছাড়াও অফিস,গুদাম, স্টোররুম, গরুর গোবর ও নোংরা আবর্জনা জমানোর স্থান ইত্যাদি থাকে।

দুগ্ধবতী গাভীর বাঁধাঘর

এক্ষেত্রে গাভীর জন্য অন্তত ৩-৪ ব.মি. জায়গা দরকার। ৪/৫ টি গাভীর জন্য এক সারিতে এক চালা ঘর এবং ১০ টির বেশী হলে দুসারিতে দোচালা ঘর তৈরী করতে হবে। সারি করে গরু রাখার ক্ষেত্রে পাশাপাশি প্রতিটির জন্য ১-১.৫ মি. জায়গা লাগে। প্রতিটি গাভীর জন্য আলাদা করে ইট বা কংক্রিটের তৈরী খাদ্য ও পানির পাত্র থাকবে। খাদ্য ও পানির পাত্র এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যেন গরু পাত্রের মধ্যে পা ঢুকে দিতে না পারে। খাদ্য পাত্র রোজ পরিষ্কার করতে হবে। এক সারি ঘরে গাভীর পিছনে অগভীর ৫-৭.৫ সে.মি. চওড়া ড্রেন রাখতে হবে। গাভীর ঘরের সকল আবর্জনা ড্রেন দিয়ে বাইরে প্রধান নর্দমায় পড়ার জন্য ঘরের মেঝে পিছনের দিকে সামান্য ঢালু হবে।

দুসারি মুখোমুখি ঘর তৈরী করতে মাঝ বরাবর ১.৫ মি. চওড়া যাতায়াতের বা খাদ্য সরবরাহের পথ রাখতে হবে। এরপর দুসারিতে ৭৫ সে. মি. চওড়া করে খাদ্য পাত্র, তারপর ১.৫ মি. চওড়া গাভী দাঁড়ানোর স্থান, এরপরে ৩০ সে. মি. চওড়া নর্দমা তৈরী করতে হবে। বহির্মুখী ঘরের উভয় প্রান্তে ৯০ সে. মি.চওড়া করে

চিত্র ২০. ৩ ঃ দু সারি বহির মুখি ঘর

চিত্র ২০.৪ ঃ দু সারি ভিতর মুখি ঘর

চলাচল বা খাদ্য সরবরাহের পথ থাকবে। এরপর ভিতরের উভয় দিকে ৭৫ সে. মি. চওড়া করে খাদ্য ও পানির পাত্র থাকবে। এরপর পাশে দুসারি গাভীর জন্য ১.২ মি. পার্শ্বে এবং ১.৫ মি. লম্বা করে স্টল তৈরী করতে হবে। গাভীর পিছনে দুসারিতে ৩০ সে. মি. চওড়া নর্দমা থাকবে। দুদিকের নর্দমার মাঝখানে ১ মি. চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ থাকবে। গাভীর ঘরের মেঝে ও খাদ্য পাত্র ইত্যাদি পাকা হওয়ায় ভাল, তবে গাভী যাতে না পড়ে সে জন্য মেঝে অমসৃণ রাখতে হয়। ঘরের মেঝে মজবুত ও ক্রমশ ঢালু হবে।

বাচ্চা প্রসবের ঘর ঃ প্রসবের ঘর পর্যাপ্ত আলো- বাতাস যুক্ত ৯-১৪ ব. মি. আয়তন বিশিষ্ট হতে হবে। এ ঘরে খড় বা অন্য কিছু দ্বারা নরম বিছনা থাকতে হবে। দুগ্ধবতী গাভীর ঘর থেকে এ ঘর পৃথক হবে।

অসুস্থ প্রাণির ঘর ঃ গবাদি প্রাণি বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হলে বা অসুস্থ হলে এ ঘরে রাখা হয়। এ ঘর ১৪ ব.মি. আয়তন বিশিষ্ট ও খামারের অন্যান্য ঘর থেকে বেশ খানিকটা দূরে তৈরী করতে হয়।

বাছুরের ঘর ঃ বাছুর পালনে আলোচনা করা হয়েছে।

ষাঁড়ের ঘরঃ প্রচুর আলো-বাতাস যুক্ত পাকা মেঝে বিশিষ্ট ১.৩ ও ০.৯ বর্গমিটার আয়তনের ০.৩৬ মি. প্রশস্ত ও ০.৬৪ মিটার উচ্চতার দরজা বিশিষ্ট ঘরই ষাঁড়ের জন্য যথেষ্ট। প্রতিটি প্রাণির খাদ্য ও পানির পাত্র ভিন্ন হবে ও ঘরের ভিতরে না গিয়েই যাতে খাদ্য ও পানি খেতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি মুক্তভাবে চলাফেরার জন্য ১৮.৪ - ২৩ বর্গমিটার আয়তনের ফাঁকা স্থান থাকবে।

২০.৭ গাভীর খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা

সুষম খাদ্য বলতে ঐ সব খাদ্যকে বুঝায়, যে সব খাদ্যে প্রাণীর প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি (শর্করা, আমিষ, চর্বি, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন ও পানি) আনুপাতিক হারে ও গুণগত অবস্থায় প্রয়োজনীয় মাত্রায় থাকে। গাভীর জীবনধারণ ও উৎপাদনের জন্য পুষ্টির প্রয়োজন। সুষম খাদ্য না খাওয়ালে গাভী দুর্বল হবে, দুধ কম দিবে ও প্রজনন ক্ষমতা কমে যাবে। গাভীর সুষম খাদ্য তৈরী করার জন্য প্রথমে নির্ণয় করতে হবে গাভীর জন্য কি পরিমাণ শুস্ক পদার্থ, পরিপাকযোগ্য ক্রুড প্রোটিন এবং মোট পরিপাকযোগ্য পুষ্টি প্রয়োজন। গাভীর সুষম খাদ্য তৈরীর জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো ঃ গাভীর দেহের ওজন, গাভী গর্ভবতী কি না, গাভী দুধ দেয় কি না, দুধের পরিমাণ কত, দুধে চর্বির পরিমাণ কত ইত্যাদি।

গাভীর খাদ্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা ঃ

ধ. আঁশ বা ছোবড়া জাতীয় খাদ্য।

ন. দানা জাতীয় খাদ্য

প. সহযোগী অন্যান্য খাদ্য যেমন ঃ খনিজ উপাদান, ভিটামিন ইত্যাদি।

আঁশ বা ছোবড়া জাতীয় খাদ্য দু'ধরনের যথা ঃ

ক) শুস্ক খাদ্য যেমনঃ ধানের খড়, গমের খড়, খেসারী, মাসকালাই ইত্যাদির খড় বা ভূষি। শুস্ক খাদ্যে পানির পরিমাণ থাকে ১০-১৫%।

খ) রসালো খাদ্য যেমন ঃ কাঁচা ঘাস, গাছের পাতা, শাক-সবজি ইত্যাদি।

দানাদার খাদ্য সাধারণতঃ কম আঁশযুক্ত এবং শুস্ক হয়, যার মধ্যে আমিষ, শর্করা এবং চর্বি জাতীয় উপাদানগুলো বেশী থাকে। গমের ভূষি, চাউলের কুঁড়া, তিলের খৈল, খেসারী ভাংগা ইত্যাদি দানাজাতীয় খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

গাভীর দৈনন্দিন খাদ্য প্রস্তুত করার সময় নিম্নে বর্ণিত বিষয় বিবেচনায় এনে খাদ্য তৈরী করতে হবে

১। গাভীর খাদ্য সুষম হতে হবে। অর্থাৎ খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ সঠিক মাত্রায় থাকতে হবে।

২। খাদ্য অবশ্যই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক হতে হবে। অর্থাৎ সহজ প্রাপ্য এবং দাম কম এরূপ উপকরণ দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে।

৩। বিভিন্ন ধরনের উপকরণ দিয়ে খাদ্য তৈরী করা উচিত যাতে খাদ্য সুস্বাদু ও সহজপ্রাচ্য হয়।

৪। গাভীর পরিপাকতন্ত্রের ধারণ ক্ষমতা অনেক, তাই প্রাণির পেট না ভরা পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। একটি দেশী গাভীর চেয়ে উন্নত একটি গাভী অনেক বড় হয়। দুধও বেশী দেয় এবং সেজন্য খায়ও বেশী। তাই খাদ্য প্রদানের সময় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে প্রাণির পেট ভরে এবং পুষ্টির অভাবও পুরণ হয়। প্রাণি পেট ভরে না খেতে পারলে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে ফেলতে পারে।

৫। গাভীর খাদ্যদ্রব্য টাটকা হতে হবে। পরিস্কার হতে হবে। প্রাণির খাদ্য ভিজা স্যেঁতস্যাঁতে হলে ছত্রাক জন্মাতে পারে। এতে বিষক্রিয়া হয়ে গাভীর ক্ষতি করতে পারে। ময়লা, কাঁকড়, পাথর, বালু, মাটি, ছাতাপড়া দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য, প্রাণিকে খেতে দেওয়া উচিত নয়।

৬। গাভীর জন্য কাঁচা ঘাস অত্যাবশ্যকীয়। কাঁচা ঘাসে প্রচুর খনিজ উপাদান ও ভিটামিন থাকে যা সহজে হজম হয়। তাই গাভীকে দৈনিক প্রয়োজনীয় কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে। গাভীর দেহ গঠনে, দুধ উৎপাদনে, গর্ভধারণে, বাচ্চা উৎপাদনে ও দু'টি উপাদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্যে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ ও খাদ্য উপাদান সরবরাহ করতে হবে। দানাদার খাদ্যের সাথে নিয়মিত ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ মিশিয়ে খাওয়ালে এগুলোর অভাব হবে না।

৭। প্রাণির দানাদার খাদ্য অবশ্যই সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। দানাদার খাদ্য উপাদানগুলো মিশানোর পূর্বে ভেঙ্গে নিতে হবে। তাতে ভালভাবে মেশানো যাবে এবং সহজে হজম হবে।

৮। আঁশ বা ছোবড়া জাতীয় খাদ্য যেমন ঃ খড়, কাঁচা ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি আস্ত না দিয়ে ছোট ছোট করে কেটে প্রাণিকে খাওয়াতে হবে। এতে খাদ্য দ্রব্যের অপচয় হবে না। প্রাণির খেতে সুবিধা হবে এবং হজমেও সহায়ক হবে। খড় কুচিকুচি করে কেটে পানি বা ফেনে ভিজিয়ে অন্যান্য দানাদার মিশ্রণ ও চিটাগুড় মিশিয়ে দিলে গাভী খেতে অধিক পছন্দ করবে এবং সহজ প্রাচ্যও হবে।

৯। খাদ্য উপকরণ হঠাৎ করে পরিবর্তন করা উচিত নয়। খাদ্য উপকরণের পরিবর্তন প্রয়োজন হলে আস্তে আস্তে দিনে দিনে করতে হবে।

গাভীর সুষম খাদ্যের শুস্ক বস্তু, পরিপাকযোগ্য ক্রুড প্রোটিন ও মোট পরিপাকযোগ্য পুষ্টির সংরক্ষিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো।

খড় ও সবুজ ঘাস ঃ প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য গাভীকে দৈনিক ২ কেজি খড় বা 'হে' অথবা দৈনিক ৬ কেজি সবুজ ঘাস সরবরাহ করতে হবে। কিন্তু যদি খড় ও সবুজ ঘাস উভয়ই তালিকায় অন্তর্ভূক্ত থাকে তখন প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১ কেজি খড় ও ৩ কেজি সবুজ ঘাস সরবরাহ করতে হবে।

দানাদার খাদ্য ঃ প্রথম ৩ লিটার দুধের জন্য ৩ কেজি দানাদার এবং পরবর্তী ৩ লিটারের জন্য ১ কেজি করে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

খনিজ ঃ সিদ্ধ হাঁড়ের গুড়া গাভীর জন্য বরাদ্ধ মোট দানাদার খাদ্যের ১% হারে এবং খাদ্য লবণ অনুরূপভাবে দানাদার খাদ্যের ১% সরবরাহ করতে হবে।

পানি ঃ পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি গাভীকে সরবরাহ করতে হবে। একটি দুধাল গাভীকে দৈনিক ৩৫-৪০ লিটার পানি সরবরাহ করতে হবে।

গাভীর সুষম খাদ্য উপকরণঃ গাভীর সুষম খাদ্য হলো শুকনা খড়, সবুজ কাঁচা ঘাস, দানাদার খাদ্য এবং পানি।

শুকনা খড় ঃ ধানের বা গমের শুকনা খড় প্রাণিকে খাওয়াতে হয়। খড় নিম্নমানের ছোবড়া জাতীয় খাদ্য। এর খাদ্যমান কম হলেও এটি আমাদের দেশে তৃণভোজী প্রাণি খাদ্যের একটি প্রধান অংশ। খেসারী, মাসকলাই, কাউপি খড় গাভীর জন্য উন্নতমানের খড়। একটি দেশী গাভীকে দৈনিক ৩ কেজি খড় খাওয়াতে হয়। উন্নত সংকর জাতের একটি গাভীর জন্য দৈনিক ৪ কেজি খড় প্রয়োজন হয়। ধানের খড়ের মধ্যে ক্রুড প্রোটিন থাকে ৩.৫% যার মধ্যে পরিপাকযোগ্য ক্রুড প্রোটিন থাকে ২% যা অত্যন্ত কম। তাই খড়ে প্রোটিনের ভাগ বাড়ানোর জন্য খড়কে ইউরিয়া দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। খড়ের সাথে ইউরিয়া এবং মোলাসেস মিশিয়েও খড়ের খাদ্যমান অনেক বাড়ানো যায়।

সবুজ কাঁচা ঘাস ঃ গাভীর সুষম খাদ্যের প্রধান অংশ সবুজ কাঁচা ঘাস। কাঁচা ঘাস গাভীর দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করে। তাই দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্যে প্রতিদিন ১০-১২ কেজি কাঁচা ঘাস অবশ্যই যোগ করতে হবে। একটি উন্নত সংকর জাতের গাভীকে দৈনিক ১৫ কেজি সবুজ কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হয়। আমাদের দেশে চারণ ভূমির অভাবে উন্নত সংকর জাতের গাভী পালন করেও আশানুরূপ লাভ পাওয়া যায় না। কিন্তু বহু উন্নত জাতের ঘাস রয়েছে যা সীমিত জমিতেই পরিকল্পিত উপায়ে চাষ করলে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা গিয়েছে যে, আমাদের দেশে বহু ফসল অপেক্ষা উন্নত জাতের ঘাস চাষ অধিক লাভজনক। আবাদি জমি ছাড়াও অনাবাদি পতিত জমি, রেল লাইনের পাশ, রাস্তার ধার, পুকুর পাড়, জমির আইল, বাধেঁর ধার, বাড়ী, স্কুল মাদ্রাসা, কল-কারখানার অব্যবহৃত জমিতে উন্নত জাতের কাঁচা ঘাস চাষ করে গবাদিপ্রাণির সবুজ ঘাসের অভাব পুরণ করা সম্ভব। উন্নতজাতের বিভিন্ন ধরনের কাঁচা ঘাস রয়েছে, সেগুলো হলো ঃ

১। স্থায়ী ঘাস ঃ গ্রীষ্মকালীন স্থায়ী ঘাস যেমন- নেপিয়ার, পারা, গিনি, জার্মান ইত্যাদি।
২। অস্থায়ী ঘাস ঃ শীতকালীন ঘাস যেমন- ওটস, ভুট্টা ইত্যাদি।
৩। শুটি জাতীয় ঘাস ঃ খেসারী,মাসকলাই, কাউপি, সেন্ট্রোশিমা, বারশিম, লুসার্ন ইত্যাদি।
৪। গাছের পাতা ঃ মান্দার, জিগা, ডুমুর, কাঁঠাল, ডেওয়া,ইপিল ইপিল ইত্যাদি।

গাভীর সুষম খাদ্য

১। কাঁচা সবুজ ঘাস ঃ দৈনিক ১২-১৫ কেজি
২। শুকনা খড় ঃ দৈনিক ৩-৪ কেজি
৩। দানাদার খাদ্য মিশ্রণ ঃ

দানাদার খাদ্য মিশ্রণের তালিকা

উপকরণ	পরিমাণ
(ক) চালের কুঁড়া	২ কেজি
(খ) গমের ভূষি	৫ কেজি
(গ) খেসারি ভাঙ্গা	১.৮ কেজি
(ঘ) তিল বা বাদাম খৈল	১ কেজি
(ঙ) লবণ	০.১ কেজি
(চ) খনিজ মিশ্রণ	০.১ কেজি
মোট	১০.০০ কেজি

৪। পানি ঃ প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি।
দানাদার মিশ্রণগুলো এক সাথে মিশিয়ে দৈনিক ২-৩ কেজি খাওয়াতে হবে।

উৎসঃ
*উচ্চতর প্রাণি বিজ্ঞান - এস এম ইমাম হুসাইন

*গাভী পালন গাইড - এ. টি. এম. ফজলুল কাদের
*আধুনিক প্রাণিপালন ও ব্যবস্থাপনা ট্রেনিং ম্যানুয়েল - প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
*বাছুর, গাভী ও ছাগল পালন - বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

মডিউল-২১ ঃ
গাভীর খামার স্থাপন

বাংলাদেশের মত একটি কৃষিপ্রধান, দরিদ্র, উন্নয়নশীল দেশের জন্য গবাদিপ্রাণির অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় অর্থনীতিতে গবাদি প্রাণির অবদান অনস্বীকার্য। দুধ উৎপাদন ছাড়াও মাংস, চামড়া, প্রাণির উপজাত, হালচাষ, গ্রামীণ পরিবহন, ফসল মাড়াই ইত্যাদি কাজের জন্য গবাদি প্রাণি পালন করা হয় এবং যা থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হয়। গবাদি প্রাণির খামার স্থাপনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাবলম্বী হচ্ছে অনেক দুঃস্থ মহিলা, ভূমিহীন কৃষক, প্রান্তিক কৃষক ও তাদের পরিবার এবং লাভজনক ব্যবসা সম্ভব হচ্ছে পরিকল্পিত বড় খামার স্থাপনেও। কাজেই কিভাবে লাভজনক প্রাণিখামার স্থাপন করা যায় সে সম্পর্কে আমাদের জনা দরকার ।

২১.১ গাভীর খামার স্থাপনেরজন্য স্থান নির্বাচন ঃ

ক. উঁচু ও শুষ্ক ভূমি ঃ প্রাণির খামার স্থাপনের জন্য উঁচু ও শুষ্ক স্থান নির্বাচন করতে হবে যেন বৃষ্টির পানি এবং খামারের অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ সহজে নিষ্কাশন করা যায় এবং খামারটি শুষ্ক ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে।

খ. অবকাঠামো নির্মাণ ঃ ঘাস চাষের জন্য উর্বর জমি বাদ দিয়ে অনুর্বর জমিতে খামারের ভবনসমূহ নির্মাণ করতে হবে। প্রাণির ঘর এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন প্রয়োজনীয় আলো-বাতাস ও সূর্যের কিরণ পায়। ঘর সাধারণতঃ পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি হলে ভাল হয়। এতে ঘর সেঁতস্যাতে হয় না।

গ. সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ প্রাণিখামারটির জনবহুল এলাকা বা শহরাঞ্চলের সাথে সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থা থাকা ভাল। ফলে প্রাণির উৎপন্ন দ্রব্য সহজে এবং সুবিধাজনকভাবে স্থানান্তর করা যায়।

ঘ. জনবসতি ও রাস্তা হতে দূরে ঃ জনবসতি ও রাস্তা হতে দূরে খামার স্থাপন করতে হবে। এতে বিভিন্ন দূর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে। তবে প্রধান রাস্তা হতে ১০০ মিটারের বেশি দূরে হবে না এবং প্রধান রাস্তার সাথে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে।

ঙ. সম্প্রসারণ ঃ ভবিষ্যতে প্রাণিখামার সম্প্রসারণ করার জন্য আশেপাশে ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে। তাই খামারের জন্য সহজেই কম মূল্যে জমি পাওয়া যায় এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে।

চ.আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ঃ বিদ্যুৎ, গ্যাস, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ অন্যান্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা আছে এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে।

ছ. পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ঃ অতি সহজেই কম খরচে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যায় এমন স্থান প্রাণি খামারের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

জ. খাদ্যের প্রাপ্যতা ঃ প্রাণিখামার লাভজনক করার জন্য যে স্থানে সহজেই কম মূল্যে প্রাণিখাদ্য পাওয়া যায় এবং কাঁচা ঘাস উৎপাদন করা যায় এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে।

ঝ. শ্রম ঃ প্রাণিখামারের জন্য সৎ, কর্মঠ ও নিয়মানুবর্তী শ্রমিক সরবরাহ অত্যন্ত জরুরি।

ঞ. পণ্যের চাহিদা ও বাজার ব্যবস্থা ঃ যেখানে খামারে উৎপাদিত পণ্যের ও উপজাতসমূহের প্রচুর চাহিদা আছে এবং সহজেই বাজারজাত করা যায় এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে।

ট. পরিবেশ ঃ বন্য প্রাণী, দুষ্ট লোক বা চুরি-ডাকাতি দ্বারা খামার যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে। তাছাড়া খামারের পাশে জলাভূমি বা হাওড় না থাকাই উত্তম।

২১.২.১ খামার ব্যবস্থাপনা

খামার ব্যবস্থাপনা খামারের প্রাণ। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা খামারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রধান সহায়ক। ব্যবস্থাপনা যত সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যসম্মত হবে, খামারের উদেশ্য অর্জন তত সহজ ও সফল হবে। ব্যবস্থাপনা এক প্রকার কলাকৌশল যার মাধ্যমে খামারের সম্পদ, সুযোগ ও সময়ের সমন্বয় ঘটিয়ে লাভজনক করা যায়। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বলতে বুঝায়

১. সম্পদের মিতব্যয়িতা।
২. অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন।
৩. স্বল্প সময়ে অধিক লাভ।
৪. শক্তি ও শ্রমের অপচয় রোধ।
৫. উৎপাদনে গুনগত মান ও উৎকর্ষতা লাভ।
৬. সর্বাধিক পরিতৃপ্তি।

প্রাণিখামার ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যকে (প্রাণির উৎপাদন বাড়ানো, আমিষ খাদ্যের ঘাটতি পূরণ, খামারিদের আয় বাড়ানো, পারিবারিক শ্রমের সঠিক ব্যবহারের জন্য, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বাড়ানো, স্থানীয় প্রাণিখাদ্যের সঠিক ব্যবহারের জন্য, প্রাণিখামারকে লাভজনক ব্যবসায় রূপদান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদি) সামনে রেখে মার্কেটিং স্টাডি, বিজেনেস প্লান এবং কাঁচামাল পর্যক্ষেণ এর বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়। খামার ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয়গুলো নিচে আলোচনা করা হল।

* **খামারের নাম ও মালিকানা ঃ** প্রথমেই বিবেচনায় আনতে হবে খামারের নাম কী হবে এবং মালিকানা ব্যক্তিবর্গ নাকি যৌথ হবে।

* **খামারের ধরন ঃ** প্রথমে বিবেচনায় আনতে হবে আমরা দুধের, মাংসের না বাচ্চা উৎপাদনের জন্য খামার স্থাপন করব। উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে আমাদের প্রাণি নির্বাচন করতে হবে। যেমন দুধের খামার হলে দুধাল জাতের গাভী নিতে হবে। ছাগলের, ভেড়ার, গাভীর, মহিষের খামার ইত্যাদি হতে পারে।

* **মূলধন সংগ্রহ ঃ** মূলধনের উৎস ও বিনিয়োগের পরিমাণ, আবর্তক খরচের উৎস ও পরিমাণ বিবেচনায় আনতে হবে। উৎস ব্যক্তিগত হলে ভাল হয়। এছাড়া সমিতি, ব্যাংক, বেসরকারি সংস্থা, অনুদান ইত্যাদি হতে পারে।

* **খামারের আকার ঃ** পারিবারিক পর্যায়ে ২-৫টি প্রাণি সমন্বয়ে ক্ষুদ্র খামার না ৫টির বেশি প্রাণি নিয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খামার স্থাপন করা হবে তা বিবেচনায় আনতে হবে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রথমে অল্প কিছু প্রাণি নিয়ে খামার আরম্ভ করা উত্তম। এতে খামার স্থাপনে ব্যয় অর্থাৎ মূলধন কম লাগবে এবং অর্জিত আয়কে মূলধন করে আস্তে আস্তে খামার বড় করা যেতে পারে।

* **খামারের অবকাঠামো নির্মাণ ঃ** প্রাণির সংখ্যা, খাদ্যের উৎস ও উৎপাদন পদ্ধতি (যেমন- (ক) আবদ্ধ অবস্থায় (খ) আবদ্ধ ও চারণ ভূমিতে ছাড়া অবস্থায় (গ) চারণভূমিতে ছাড়া অবস্থায়।)
বিবেচনা করে খামারের জন্য বিভিন্ন ঘর ও ফডার চাষের জন্য ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে। কোন ধরনের ঘর করলে বেশি লাভবান হওয়া যাবে তা বিবেচনায় আনতে হবে। ঘর তৈরিতে বিভিন্ন বয়সের প্রাণির জন্য আলাদা আলাদা ঘর তৈরি করতে হবে। এছাড়া বাণিজ্যিক খামারের ক্ষেত্রে খাদ্য গুদামঘর, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম রাখার ঘর, উৎপন্ন দ্রব্য সংরক্ষণ ঘর, অফিস ও বিক্রয় কেন্দ্র, প্রহরীর ঘর, জেনারেটর ঘর, গ্যারেজ ঘর ইত্যাদি তৈরি করতে হবে।

২১.২.২ গাভীর খামারের দৈনন্দিন কর্মসূচি

একটি আদর্শ খামারের দৈনন্দিন কাজগুলো নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১) দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ ঃ যে কোন আকারের খামারে আদর্শ ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য। প্রত্যহ ভোরবেলা খামার ও প্রাণি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোন প্রাণি অসুস্থ হলে সঙ্গে সঙ্গে আলাদা করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। খামারে নিয়োজিত শ্রমিকের নিকট থেকেও খোঁজ-খবর নিতে হবে। শ্রমিকের কাজও পরিদর্শন করতে হবে।

২) নিয়মিত পরিচর্যা ঃ গাভীর পরিচর্যায় নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব রয়েছে। প্রাণির স্বভাবকে নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটানো যায়। যেমনঃ একই সময়ে প্রাণিকে খাদ্য প্রদান, একই সময়ে দুধ দোহন, শরীর চর্চা ইত্যাদি। নিয়মিত পরিচর্যার ব্যাঘাত ঘটলে বা অনিয়ম হলে স্বাস্থ্যের যেমন ক্ষতি হয় তেমনি উৎপাদনেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

প্রাণির পরিচর্যার সময় যতদূর সম্ভব নম্রতা প্রদর্শন করা উচিত। প্রাণি তার প্রতি ব্যবহার অনুভব করে। আদর করলে প্রাণি সাড়া দেয়। দৈনিক একই সময় ঘর ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। মাঝে মাঝে ঘরে স্যাভলন, ডেটল, ফিনাইল ও আয়োসান মিশ্রিত পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। একই সময়ে গাভীর শরীর ঘসে গোসল করাতে হবে। দৈনিক একই সময়ে খাদ্য দিতে হবে এবং গাভীর দুধ দোহন করতে হবে। হঠাৎ করে প্রাণির খাদ্যে পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তা সময় নিয়ে ধীরে ধীরে করতে হবে।

৩) দুধ দোহন ঃ প্রতিদিন একই সময় এবং একই দোহনকারী দ্বারা দুধ দোহন করতে হয়। হঠাৎ করে এগুলোর পরিবর্তন হলে দুধ উৎপাদন কমে যায়। দুধ দোহনের পূর্বে দোহনকারীর হাত এবং গাভীর ওলান কুসুম কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে নেওয়া উচিত। ভেজা হাতে দুধ দোহন করা উচিত নয়। দিনে দু'বার কমপক্ষে ১০ ঘন্টা ব্যবধানে দুধ দোহন করতে হয়।

৪) গর্ভবতী গাভীকে দুগ্ধহীন করা/গাভীর দুধ দোহন বন্ধ করা ঃ বাচ্চা প্রসবের ৪০ দিন পূর্বে গাভী দুধ দোহন একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়। দুধ দোহন বন্ধ করার উদ্দেশ্য হলো- দুধ উৎপাদনকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে বিশ্রাম দেওয়া। গাভীর দুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত খাদ্য গাভীর গর্ভস্থ বাচ্চার পুষ্টির কাজে লাগাতে পারে। গাভীর শরীরে খনিজ জাতীয় উপাদানের মজুদ গড়ে তোলা যা পরে দুধ উৎপাদনের কাজে লাগে। দুধ দোহন বন্ধ করলে বাচ্চা প্রসবের পূর্বে গাভী স্বাস্থ্যবতী হবে। গর্ভাবস্থার শেষ দিকে অর্থাৎ গাভী বাচ্চা প্রসবের পূর্বে গাভীর দুধ উৎপাদন সাধারণত এমনিতেই বন্ধ করা যেতে পারে। যেমনঃ

ক. সম্পূর্ণভাবে দুধ দোহন না করে ঃ গাভীর দুধ দোহন বন্ধ করার সময় হলে প্রথমত কয়েকদিন ওলানে সামান্য দুধ রেখে দোহন করতে হবে। তারপর দিনে একবার করে অসম্পূর্ণভাবে দোহন করতে করতে যখন বাঁট দিয়ে অতি সামান্য দুধ আসবে, তখন দোহন একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে।

খ. অবিরাম দোহন করে ঃ যে গাভীকে দুগ্ধহীনা করতে হবে, সে গাভীকে প্রথমত বাচ্চা প্রসবের ৬০ দিন পূর্ব হতে দিনে একবার ১ দিন পর পর দোহন করে অবশেষে ৪০ দিনে দোহন একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে।

৫) গাভীর গরম নির্ধারণ ও প্রজনন করানো ঃ দুগ্ধ খামারের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে খামারের কোন গাভীটি কখন গরম হয়েছে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সময় মত গাভীর গরম নির্ধারণ করতে না পারলে গাভীর নিয়মিত প্রজনন বিঘ্ন ঘটে ফলে গাভীকে পুনরায় গরম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এতে গর্ভধারণ পিছিয়ে যায়। গাভীর খামার লাভজনক করতে হলে সঠিক সময়ে গাভীর প্রজননের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) গর্ভাবস্থা পরীক্ষা ঃ গাভী প্রজনন করানোর তিন মাস পরেই গর্ভাবস্থা পরীক্ষা করতে হয়। প্রজনন করানোর তিন মাস পর পায়ু পথে হাত ঢুকিয়ে বাচ্চা অনুভব করে গর্ভধারণ নিশ্চিত হওয়া যায়। আবার গাভীকে প্রজনন করানোর পর পরবর্তী গরম হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ে গাভী আবার গরম হয় কি না, তা লক্ষ্য রাখতে হবে। গরম না হলে বুঝতে হবে গাভী গর্ভধারণ করেছে।

৭) স্বাস্থ্য পরিচর্যা ঃ স্বাস্থ্য পরিচর্যা বলতে টিকা প্রদান, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা প্রদান, নিয়মিত কৃমিনাশক প্রদান ইত্যাদি বুঝায়। যে সব সংক্রামক রোগের টিকা পাওয়া যায়, প্রাণিকে নিয়মিত সে সব রোগের টিকা দিতে হবে। বিভিন্ন সময়ে খামারের প্রাণিকে ডাক্তার দ্বারা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনে চিকিৎসা করাতে হবে। খামারে গরুর গোবর পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় কৃমিনাশক দ্বারা চিকিৎসা করাতে হবে। খামারে প্রতিটি গাভীর জন্য স্বাস্থ্য কার্ড থাকা উচিত। স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়গুলো কার্ডে লিপিবদ্ধ করতে হয়।

৮) গাভী বাছাই/ছাঁটাই ঃ দুগ্ধ খামার লাভজনক করতে হলে খামারে সুস্থ উৎপাদনশীল গাভী পালন করতে হবে। অলাভজনক বা অনুৎপাদনশীল গাভী খামার হতে ছাঁটাই করতে হবে। নিম্নোক্ত প্রাণিকে খামার হতে ছাঁটাই করতে হবে ঃ

ক. যে সমস্ত প্রাণি রোগে আক্রান্ত এবং চিকিৎসা করে ফল হবে না।

খ. যে সকল প্রাণির শারীরিক বৃদ্ধি সন্তোষজনক নয়।

গ. কম উৎপাদনশীল গাভী অর্থাৎ যে গাভী দুধ কম দেয়।

ঘ. যে সকল গাভী নিয়মিত গরম হয় না। আবার প্রজনন করানোর পরও ঠিকমত গর্ভধারণ করে না।

ঙ. যে সকল গাভী প্রতি বাচ্চা প্রদানে ২৭০ দিনের কম সময় দুধ দেয়।

চ. যে সকল গাভী মারাত্মক বদ অভ্যাস রয়েছে; যেমন- নিজের বা অন্যের বাঁট চুষা, অন্যের শরীর চাটা, লাথি মারা ইত্যাদি।

৯) খামারের গবাদি প্রাণি চিহ্নিত করা ঃ খামারের সকল গাভীকে এবং খামারের উৎপাদিত বাছুর বা ক্রয়কৃত সকল প্রাণিকে চেনা যায় এরূপ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করতে হয়। জন্মের পর পরই খামারের বাছুরকে চিহ্নিত করা উচিত। খামারে গরুর সংখ্যা কম হলে প্রাণির নামে বা জন্মগত কোন চিহ্ন দ্বারা প্রাণিকে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু বড় আকারের খামারে বেশি গরুর ক্ষেত্রে সাধারণত প্রাণিকে চিহ্নিত করা যায়। বিভিন্নভাবে গরুকে চিহ্নিত করা যায় যেমন ঃ

ক. ইয়ার ট্যাগ (কানের ট্যাগ)ঃ এক ধরনের ধাতব বা প্লাস্টিকের পাত দ্বারা ট্যাগ তৈরি করা হয় যা একটি যন্ত্রের সাহায্যে কানের গোড়া থেকে তিন ভাগের এক ভাগ দূরত্বে লাগাতে হয়। ট্যাগের নম্বার লেখা থাকে যা দ্বারা প্রাণিকে চিহ্নিত করা যায়। ট্যাগ লাগানোর পর সে স্থানে জীবাণুনাশক লাগিয়ে দিতে হবে।

খ. নাম্বার ট্যাগ ঃ নির্দিষ্ট নাম্বার সম্বলিত এক ধরনের ধাতব পাত যা গলায় রশি বা শিকলের সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এ ধরনের ট্যাগ হারানোর সম্ভাবনা বেশি থাকে।

গ. টাটুইং ঃ কানে ছিদ্র করে নম্বর লিখে তাতে রঙ দিলে স্পষ্ট প্রাণির নাম্বার দেওয়া যায়। এভাবে নাম্বারিং করে গরুকে চিহ্নিত করা যায়।

ঘ. ব্রান্ডিং বা পোড়ানো ঃ প্রাণির শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে সাধারণত উরুর নিচের অংশে গরম লোহার ফলক দিয়ে নাম্বার দেওয়া যায়। এটি বহু পুরাতন পদ্ধতি। এতে চামড়ার মূল্য কমে যায়।

১০. এঁড়ে বাছুর খোঁজা করা ঃ এঁড়ে বাছুর যেগুলো প্রজনন কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয় না, সেগুলোকে ১-৬ মাস বয়সে খোঁজা করানো উচিত। বার্ডিজো ক্যাসট্রেটর যন্ত্র দ্বারা বাছুরকে সহজেই খোঁজা করানো যায়। কোন বাছুরকে খোঁজা করানোর প্রয়োজন হলে স্থানীয় প্রাণি হাসপাতালের ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে তা করানো যায়।

১১. বাছুরের শিং বৃদ্ধি রহিত করা ঃ শিং দ্বারা গুতিয়ে খামারের প্রাণি অনেক সময় অন্য গবাদিপ্রাণি, মানুষ বা অন্য যে কোন কিছুর মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে। কোন প্রাণির শিং দিয়ে গুতানোর অভ্যাস হলে তার পরিচর্যা করা সম্ভব হয় না। তাই শিং যাতে বড় না হতে পারে, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। শিং বৃদ্ধি রহিত করার পদ্ধতিকে ডিহরনিং (dihorning) বলে। বাছুরের শিং যখন সামান্য বের হয় বা ৫-৮ দিন বয়সে এবং গোড়া অত্যন্ত নরম থাকে তখনই শিং-এর বৃদ্ধি রহিত করার উপযুক্ত সময়। দু'পদ্ধতিতে শিং-এর বৃদ্ধি রহিত করা যায়; যেমন

ক. কস্টিক সোডা ব্যবহার করে ঃ শিং-এর গোড়ার চারিদিকের চুল ফেলে কস্টিক সোডার একটি দন্ড বাছুরের শিং-এর গোড়ায় ঘসতে হবে। কস্টিক সোডার দন্ড যাতে হাতে বা প্রাণির শরীরের কোথাও না লাগে,

সে জন্য সাবধানে ঘসতে হয়। কস্টিক সোডা যাতে চর্মে না লাগে সেজন্য কস্টিক সোডার দন্ড ঘসার পূর্বে শিং-এর চারিদিকে ভেসেলিন মেখে নিতে হবে। সামান্য পরিমাণ রক্ত বের না হওয়া পর্যন্ত ঘসতে হবে। এতে ভবিষ্যতে শিং আর বৃদ্ধি পায় না। সাধারণতঃ বিকালের দিকে বাছুরের দুধ পান শেষ হলে কস্টিক সোডা ব্যবহার করতে হয়। অন্যথায় বাছুরের শিং-এর কস্টিক সোডা গাভীর ওলানে বা গায়ে লাগবে।

খ. গরম লোহা দ্বারা ঃ লোহার দন্ড আগুনে পুড়িয়ে লাল করে শিং-এর গোড়ায় ১০-২০ সেকেন্ড ধরলে শিং পুড়ে যায়। পরে শিং আর বাড়ে না। পোড়া জায়গাতে জেনশান ভায়োলেট লোশান লাগাতে হয়। যাতে ভবিষ্যতে কোন ক্ষত না হয়।

১২। নথি সংরক্ষণ ঃ খামারের দৈনন্দিন উৎপাদন, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় ও আয়-ব্যয়ের হিসাব নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

২১.৩.১ খামার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যা

বাংলাদেশে প্রাণিপাখির ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশি। বিশ্বে একর প্রতি গরুর ঘনত্ব ০.৯১ ও এশিয়ায় ০.৯৫ টির তুলনায় বাংলাদেশে ২.৯২টি। কিন্তু দেশে গবাদি প্রাণির ঘনত্ব বেশি হলেও এদের উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কম। এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। বিশ্বের গাভীপিছু বার্ষিক গড় দুধ উৎপাদন যেখানে ২১৯০ কেজি, এশিয়ায় ১২২০ কেজি, এমনকি ভারতে ১০১৪ কেজি, সেখানে বাংলাদেশে মাত্র ২০৬ কেজি। কম উৎপাদনের মূল কারণই হল ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা । এজন্য এ সমস্যা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিহ্নিত করা উচিত।

সমস্যাসমূহ

১। কৃষকের পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব ঃ আমাদের দেশে বেশির ভাগ কৃষক অশিক্ষিত। ফলে খামার ব্যবস্থাপনার জন্য যেসব জ্ঞান দরকার সেসব জ্ঞান কৃষকের নেই। বেশির ভাগ কৃষকই গাভী দিয়ে হাল চাষ করে এমনকি গর্ভাবস্থায়ও অনেক সময় একাজ করে থাকে। ফলে গাভীর বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায় এবং গাভীর উৎপাদনে মারাত্মক ক্ষতি হয়। যে গাভী থেকে আমরা তার আয়ু কালে ১০-১২টি বাচ্চা পেতাম সেখানে মাত্র ৪-৫টি বাচ্চা পাওয়া যাচ্ছে সুতরাং কৃষকের জ্ঞান খামার ব্যবস্থাপনার প্রধান সমস্যা।

২। উন্নত জাতের সমস্যা ঃ আমাদের দেশী গরু গড়ে মাত্র ২-৩ কেজি দুধ দিয়ে থাকে। সেখানে উন্নত জাতের গরু ২০ কেজি পর্যন্ত দুধ দেয়। খামারের জন্য দরকার উন্নত জাতের গরু যারা বেশি দুধ বা মাংস দিবে ও বেশি মুনাফা অর্জন করা যাবে। বর্তমানে সংকর জাতের কিছু প্রাণি উৎপন্ন হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

৩। পুঁজির অভাব ঃ বাংলাদেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। তাদের "নুন আনতে পানতা ফুরায়"। এমতাবস্থায় খামার ব্যবস্থাপনার জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করা তাদের জন্য একটি বড় সমস্যা।

৪। খাদ্য সমস্যা ঃ আমাদের দেশে জনসংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে কমে যাচ্ছে জমির পরিমাণ। প্রাণিখাদ্য উৎপাদনের জন্য এ স্বল্প পরিমাণ জমিও ব্যবহার হচ্ছে না, হচ্ছে মানুষের খাদ্য তৈরিতে। ফলে প্রাণিখাদ্য সমস্যা দিন দিন বিরাট আকার ধারণ করছে। অথচ খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানুষ অনায়াসে দুধ, মাংস ইত্যাদি পেতে পারে এবং রোজগারের ব্যবস্থাও করতে পারে।

৫। বাসস্থান সমস্যা ঃ প্রাণি-পালন এবং খামার ব্যবস্থাপনায় কৃষকের প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকায় প্রাণির জন্য কেমন বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যেটা প্রাণির জন্য আরামদায়ক ও পছন্দণীয় হবে সেটা তারা বোঝে না ও অপরিকল্পিতভাবে বাসস্থান তৈরি করে। আবার তাদের পর্যাপ্ত জায়গা না থাকার কারণে নিজের থাকার ঘরের পাশেই প্রাণিকে রাখে। ফলে সঠিক ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হয় না।

৬। প্রজনন সমস্যা ঃ খামার ব্যবস্থাপনার জন্য শর্ত হল অধিক উৎপাদনশীল প্রাণি। কিন্তু এ অধিক উৎপাদনশীল প্রাণির প্রাপ্যতা নির্ভর করে ভাল প্রজনন ব্যবস্থাপনার উপর। যেখান থেকে ভাল প্রাণি উৎপাদন হতে পারে। ভাল ষাঁড়ের অপর্যাপ্ততা এবং উন্নত ধরনের কৃত্রিম প্রজননের সমস্যার কারণে প্রাণিকে সময়মত

প্রজনন করানো খামারিদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রে সঠিক রেকর্ড না থাকার কারণে আন্তঃপ্রজনন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম প্রজনন করার কারণে সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে।

৭। আধুনিক সুযোগ-সুবিধার অভাব ঃ খামার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন হলো আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ। কিন্তু আমাদের দেশে বিদ্যুতের পর্যাপ্ত ঘাটতি থাকার কারণে খামারে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ব্যাহত হচ্ছে সঠিক ব্যবস্থাপনা।

৮। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ও যন্ত্রপাতির অভাব ঃ সঠিকভাবে খামার ব্যবস্থাপনার জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র দরকার সেগুলোর অভাব রয়েছে যথেষ্ট। আবার কৃষকরা পুঁজির অভাবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি কিনতে পারছে না।

৯। কারিগরি জ্ঞানের অভাব ঃ গ্রামে গঞ্জে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত দরিদ্র ও বেকার মানুষ প্রাণিপালন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, প্রজনন, কৌশল, সঠিক যত্ন ও ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই দমন ও অধিক লাভবান হওয়ার উপায় ও কৌশল সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী। এদের কোন প্রকার কারিগরি জ্ঞান নেই। ফলে তারা সঠিকভাবে খামার ব্যবস্থাপনা করতে পারছে না।

১০। অসম বাজার ব্যবস্থা ঃ আমাদের দেশের বাজার ব্যবস্থার উপর সরকারের বা কোন কর্তৃপক্ষের কারও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে একই পণ্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে । যেমন- দুধ কোন জায়গায় ২০ টাকা আবার কোথাও ৪০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার অভাবে কৃষকরা প্রাপ্য মুনাফা অর্জন করতে পারছে না, যা নতুন খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। এছাড়াও নিম্নমান সম্পন্ন গুঁড়া দুধের অবাধ আমদানি এবং দেশে উৎপাদিত দুধ অন্যান্য প্রাণিসম্পদ জাত পণ্যের সুপরিকল্পিত এবং উপযুক্ত বিপণন পরিবেশের অনুপস্থিতি ও ব্যবস্থাপনার সমস্যা সৃষ্টি করছে।

১১। প্রতিকূল আবহাওয়া ঃ বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল অবস্থা যেমন খরা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, অতিরিক্ত ঠান্ডা, ঝড়, বৃষ্টি ইত্যাদি খামার ব্যবস্থাপনায় সমস্যার সৃষ্টি করে। খামারিদের প্রতিকূল আবহাওয়ার সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তেমন জ্ঞান না থাকায় প্রতি বছর অনেক গবাদি প্রাণি মারা যাচ্ছে।

১২। রোগব্যাধিজনিত সমস্যা ঃ প্রতি বছর প্রাণি বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে ও মারা যাচ্ছে। ফলে কৃষক বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। রোগব্যাধি ও খামারের জৈব নিরাপত্তা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায় কৃষকদের ব্যবস্থাপনাগত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

১৩। প্রয়োজনীয় ঔষধের অভাব ঃ বিভিন্ন রোগব্যধির জন্য যে বিভিন্ন ঔষধের প্রয়োজন হয় তা গুণগত সম্পন্ন নয় এবং সহজেই সঠিক মূল্যে পাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে কৃষকরা বিভিন্ন রোগের জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না।

১৪। প্রতিষেধক টিকার অভাব ঃ চিকিৎসার চেয়ে প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়ায় বেশি উত্তম। কিন্তু রোগের প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত টিকা বীজের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এছাড়াও যে টিকা বীজ দেশে তৈরি হয় তা খামারিদের কাছে পৌঁছাতে অনেক সময় কার্যকারীতা হারিয়ে ফেলে। ফলে সে টিকা বীজ দিয়ে কোন কাজই হয় না। আবার বিদেশ থেকে যে সব টিকা বীজ বিভিন্ন কোম্পানি নিয়ে আসে সেসবের উচ্চ মূল্যে হওয়ার কারণে কৃষদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়।

১৫। পরামর্শকের অভাব ঃ কৃষকরা কোন সমস্যায় পড়লে সে সম্পর্কে পরামর্শ নেওয়ার জন্য তেমন পরামর্শক নেই। ফলে কৃষক তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারে না ও সঠিক ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখতে পারে না।

২১.৩.২ খামার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকার

খামার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান না করলে প্রাণির উন্নয়ন সম্ভব নয়।

১। কৃষকদের কারিগরি জনবল হিসাবে গড়ে তোলা ঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথা খামার ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট কারিগরি জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের দক্ষ করে তুলতে হবে। কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তাদের কাছে ভাল করে ব্যবস্থাপনার সমস্যাগুলো তুলে ধরে এর ক্ষতিকর দিকগুলো বুঝাতে হবে। যেন তারা সহজেই তা বুঝতে পারে এবং নিজেদের দক্ষ করে তুলতে পারে। এক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পাশাপাশি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বিভিন্ন এনজিও যেমন ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। উন্নত জাতের প্রাণি সৃষ্টি ঃ প্রাণি প্রজেনী টেস্টিং এর মাধ্যমে প্রোভেন বুলের বীর্য দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন করে ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তির ব্যবহার করে উন্নতমানের প্রাণি তৈরি করতে হবে।

৩। পুঁজির অভাব দূরীকরণ ঃ কৃষকদের খামার ব্যবস্থাপনার জন্য যে পুঁজি দরকার তা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। খামারিদের জন্য স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। খাদ্য সমস্যার সমাধান ঃ সবুজ ঘাসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পতিত জমি, দুই ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে নতুন জেগে উঠা চরে, পাহাড়ের ঢালু এলাকায়, উপকূলীয় বাঁধে, জমির আইলে, অলাভজনক শস্যক্ষেতে উন্নত জাতের ঘাস চাষ প্রবর্তন করতে হবে। ঘাস চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করে তুলতে হবে। কৃষি উপজাত ধান ও গমের খড়, আখের ছোবড়া ইত্যাদি ইউরিয়া ও চিটাগুড়ের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করে প্রাণিখাদ্য প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। দেশীয় লাগসই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্বল্প খরচে দেশীয় সম্পদ থেকে যে সহজে প্রাণির খাবার চাহিদা পূরণ করা যায় এবং প্রাণিকে বিভিন্ন খাবার খাওয়ানোর ফলে যে কৃষক বৃহৎ অর্থে উপকৃত হতে পারে সে সংক্রান্ত জ্ঞান দানের জন্য গণমাধ্যমে প্রচার করতে হবে। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার করতে হবে।

৫। বাসস্থান সমস্যার সমাধান ঃ খামারিরা যেন স্বল্প ব্যয়ে প্রাণির জন্য আরামদায়ক ও পছন্দনীয়, রোগমুক্ত বাসস্থান তৈরি করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বেসরকারি অন্য প্রতিষ্ঠান অংশ নিতে পারে।

৬। প্রজননজনিত সমস্যার সমাধান ঃ প্রাণির প্রজননের জন্য পর্যাপ্ত উন্নত জাতের ষাঁড় তৈরি করতে হবে ও সারা দেশে উন্নত কৃত্রিম প্রজননের সুব্যবস্থা করতে হবে। সঠিকভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৭। আধুনিক সুযোগ-সুবিধার নিশ্চিয়তা ঃ খামার এলাকায় যেন বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা থাকে সেদিকে সরকারের পাশাপাশি জনগণকে ভূমিকা রাখতে হবে।

৮। পর্যাপ্ত জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতির সরবরাহ ঃ খামারিদের জন্য আধুনিক জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি সহজেই স্বল্পমূল্যে কেনার নিশ্চয়তা বিধান করা। এক্ষেত্রে সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো ভূমিকা রাখতে পারে।

৯। সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা ঃ সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে খামারিদের ন্যায্য মুনাফা লাভের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার কর্তৃক "মার্কেট পলিসি" গঠন করতে হবে।

১০। দূর্যোগ ব্যবস্থা ঃ দূর্যোগ মুহুর্তে খামারিদের ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা হ্রাস করার লক্ষ্যে আশ্রয়কেন্দ্র, আপদকালীন ঔষধ, টিকাবীজ, প্রাণিখাদ্য মজুদের ব্যবস্থা গ্রহণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সমৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া এ সময় খামারি ও পরামর্শকের মাঝে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং করণীয় দিকগুলো ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে সঠিক ব্যবস্থাপনা নিতে হবে।

১১। শিক্ষা কার্যক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ নিম্নশ্রেণী থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা পাঠ্যক্রমে প্রাণি পালন এবং খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কৃষি শিক্ষা প্রণয়ন করতে হবে ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১২। রোগব্যাধিজনিত সমস্যার সমাধান ঃ রোগব্যাধিজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খামারিদের বিভিন্ন রোগের কারণ, বিস্তার, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করতে হবে। খামারের জৈব নিরাপত্তার সম্পর্কে ভাল জ্ঞান দান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। টিকা বীজ ও ঔষধের সরবরাহ ঃ খামারিদের প্রয়োজনানুসারে গুণগত মানসম্পন্ন টিকা বীজ, ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কিভাবে টিকা বীজের মান ঠিক রাখা যায়, প্রয়োগ বিধি, সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে হবে। সরকার কর্তৃক টিকা বীজ ও ঔষধের দাম নির্ধারণ করে দিতে হবে।

১৪। পরামর্শক ঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাণি সম্পদবিদ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

সর্বোপরি জনসাধারণকে প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের জন্য তথা দেশের উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসতে হবে এবং মনোবল গড়ে তুলতে হবে।

২১.৪ খামারে নথি সংরক্ষণ

সংক্ষিপ্ত, সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, পরিমার্জিত ও সুন্দরভাবে তথ্য লিপিবদ্ধ করাকে নথি সংরক্ষণ বলা হয়। প্রত্যেক ব্যবসায় নথি সংরক্ষণ করা হয় এবং দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদক খামারও ব্যতিক্রমধর্মী নয়। নথি সংরক্ষণ একটি হালকা বা টুকিটাকি বিষয় হতে পারে। কিন্তু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ব্যবস্থাপনায় কোথায় অসুবিধা বা গলদ, কোন খাতে অপব্যয় হচ্ছে, কোন পদ্ধতি ব্যয় সাপেক্ষ প্রভৃতি জানা সম্ভব হয় না, যদি সঠিক নথি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা না থাকে।

নিম্নলিখিত নথিগুলো খামারের সংরক্ষণ করা প্রয়োজন-

১। প্রাণিসম্পদ নথি ঃ ডেয়রী খামারে মোট গবাদি প্রাণির সংখ্যা, জাতের বিবরণ, বয়স এবং এদের পুরো ইতিহাস জানার জন্য নথি রাখা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এ নথি পুরোপুরি ও সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে খামার পরিচালনা করা ব্যবস্থাপকের পক্ষে সহজতর ও ভবিষ্যত প্রাক্কলন তৈরিতেও সহায়ক।

২। প্রজনন নথি ঃ গবাদি প্রাণির খামারের জন্য প্রজনন নথি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ একটি গাভীর সারা জীবনের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে এর বাচ্চা দানের সংখ্যার উপর, আর বাচ্চা প্রসবের সংখ্যা নির্ভর করে উপযুক্ত লালন পালন ও সঠিক প্রজনন তথ্যের উপর। এছাড়া প্রজনন নথিতে কোন জাতের ষাঁড় দিয়ে পাল দেওয়া হয়েছে, পাল দেওয়া ব্যক্তির নাম ও তারিখ উল্লেখ থাকে।

৩। বাচ্চা নথি ঃ বাচ্চার জন্ম তারিখ, শারিরীক অবস্থা, লিঙ্গ, জন্ম ওজন, গাভী ও ষাঁড়ের কানের নম্বর এবং চিহ্নিত করণ নম্বর সবকিছুই এ নথিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

৪। দুগ্ধ নথি ঃ গাভীর দৈনন্দিন দুধ উৎপাদন ক্ষমতা সঠিকভাবে জানার জন্য দুগ্ধ নথি সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ খামারের আয় ব্যয়, উন্নতি-অবনতি প্রধানত নির্ভর করে গাভী প্রতি দুধ উৎপাদনের উপর, গড় দুধ উৎপাদনের উপর নয়।

৫। দুধের বিতরণ নথি ঃ খামারে উৎপাদিত দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য গ্রাহকদের নিকট বিশ্বস্ততার সহিত পৌঁছিয়ে দেয়া ও দ্রব্যের আয়-ব্যয়ের সঠিক ইঙ্গিত এ নথি হতে পাওয়া যায়।

৬। অর্থনৈতিক নথি ঃ একটি গাভীর জন্য মাসিক খাদ্য খরচ কত এবং দুধ হতে কত পাওয়া যাবে তা এ নথিতে লিপিবদ্ধ থাকে।

৭। খাদ্য নথি ঃ বছরের বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহীত খাদ্য সামগ্রীর সঠিক পরিমাণ ও মূল্য এবং দৈনিক প্রাণি যে খাদ্য খায় তার প্রত্যেকটি খাদ্যের পরিমাণ খাদ্য নথিতে লিপিবদ্ধ থাকে। এছাড়া দানা খাদ্যের মিশ্রণ ও আঁশ যুক্ত খাদ্য গো-খাদ্যের পরিমাণ যা খাওয়ানো হয় তাও নথিতে রাখা হয়।

৮। স্বাস্থ্য নথি ঃ রোগে বা অন্য কোন কারণে খামারের প্রাণি মারা গেলে বা প্রাণি বিক্রয় করলে এই নথিতে লিপিবদ্ধ রাখা হয়।

১০। শ্রমিক হাজিরা নথি ঃ খামারের শ্রমিকদের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি ও ছুটির পূর্ণ বিবরণ এই নথিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

১১। গবাদি প্রাণি জবেহ নথি

১২। সার সংরক্ষণ নথি ঃ খামারে জমাকৃত মল মূত্রের পরিমাণ, মল মূত্রের বিক্রয়কৃত আয় এ নথিতে লিপিবদ্ধ থাকে।

১৩। আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি নথি

১৪। আনুষাঙ্গিক মজুদ বহি

১৫। কৃষি যন্ত্রপাতি নথি

১৬। বীজ মজুদ নথি

১৭। ওভারসিয়ার ডাইরী

১৮। চিঠিপত্র আদান প্রদান নথি

দুগ্ধ বিতরণ নথি

দুধ বিতরণ মাস ঃ

ক) কুপন খ) নগদ মূল্যে বিক্রয়

গ) গবেষণা ঘ) ব্যবহারিক ক্লাশ ঙ) বাচ্চা খাওয়ানো চ) দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরি ছ) বিতরণ ঘাটতি ।

১	২	৩				৪
ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	দুধ বিতরণ তারিখ ও সময়				মন্তব্য
		১-১২-০৩		২-১২-০৩		
		সকাল	বিকাল	সকাল	বিকাল	

প্রাণি সম্পদ নথি

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ক্রমিক সংখ্যা	প্রাপ্তির ধরণ	প্রাপ্তির তারিখ	জন্ম তারিখ	প্রাণি পালে প্রবেশের তারিখ	মায়ের নম্বর	কানের নম্বর	প্রাণি অপসারণের তারিখ	মৃত্যু তারিখ	কাহার নিকট বিক্রয়	কোথায় স্থানান্ত রিত	মন্ত ব্য

প্রজনন নথি

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ক্রমিক সংখ্যা	গাভীর কানের নম্বর	জাত	সময়সহ গরম হবার তারিখ	পাল দেয়ার নম্বর	ষাঁড়ের কানের নম্বর	প্রজনন কারীর নাম	গর্ভ নির্ণয়ের তারিখ	বিয়ানের প্রত্যাশিত তারিখ	বিয়ানের সঠিক তারিখ	লিঙ্গ পুঃ/স্ত্রী	বাচ্চার ওজন	মন্ত ব্য

বাচ্চার নথি

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ক্রমিক সংখ্যা	বাচ্চার কানের নম্বর	মায়ের কানের নম্বর	জাত	বাচ্চা প্রসবের তারিখ	লিঙ্গ পুঃ/স্ত্রী	বাচ্চার জন্মকালীন ওজন	মন্তব্য

দুগ্ধ নথি

১	২	৩	৪	৫
ক্রমিক	গাভীর	বাচ্চা	দুধ দোহনের তারিখ ও সময়	মোট দুধ

সংখ্যা	কানের নম্বর	প্রসবের তারিখ	১-১২-০৩		২-১২-০৪		
			সকাল	বিকাল	সকাল	বিকাল	

২৫.৫ খামারের আয় ব্যয়ের হিসাব ও ব্যাংক ঋণ পরিশোধের খতিয়ান

গাভীর খামার স্থাপনে খামারের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আয়-ব্যয়ের হিসাব ঠিকমত না করলে খামার লাভজনক কি অলাভজনক তা বুঝা যাবে না। তাই লাভজনকভাবে খামার করতে হলে আয়-ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে রাখতে হবে। খামারের আয় হতে ব্যয় বাদ দিলে যা থাকবে সেটা হবে লাভ।

ব্যয়কে দু'ভাবে ভাগ করা যায়; যথাঃ স্থায়ী ব্যয় ও আবর্তক ব্যয়

স্থায়ী ব্যয়ঃ খামার স্থাপনের জমি, ঘড়-বাড়ি নির্মাণ, বিদুৎ ও পানি সরবরাহ সংযোগ স্থাপন। যন্ত্রপাতি ও গাভী ক্রয় ইত্যাদি খাতে যে টাকা ব্যয় হয়, তাকে স্থায়ী ব্যয় বলে। স্থায়ী ব্যয়কে মূলধন ব্যয়ও বলা হয়। গরু ক্রয় বাবদ ব্যয়কে কেউ কেউ আবর্তক ব্যয়ের মধ্যে ধরে থাকেন। তবে এ ব্যয়কে স্থায়ী ব্যয় হিসাবে বা মূলধন বিনিয়োগ হিসাবে ধরাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

আবর্তক ব্যয় ঃ খামার পরিচালনায় দৈনিক যে ব্যয় হয় তাকে আর্বতক ব্যয় বলা হয়। একে দৈনন্দিন ব্যয়ও বলা হয়। গরুর খাদ্য, ঔষধ-পত্র টিকা, গরুর ব্যবহৃত সরঞ্জমাদি, খামারের প্রশাসনিক ব্যয়, বিদ্যুৎ, গ্যাস বিল ইত্যাদির জন্য যে ব্যয় হয়, সেগুলো আর্বতক ব্যয়ের হিসাব ধরা হয়।

খামার স্থাপনের পূর্বে খামারের প্রকল্প প্রণয়নের সময় খামারের আয়-ব্যয়ের একটি হিসাব তৈরী করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে খামারের লাভ লোকসান নির্ণয় করা যায়। খামারে গাভীর সংখ্যা, গাভীর জাত, দুধ উৎপাদন, খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির ওপর লাভ-লোকসান নির্ভর করে। খামারের জন্য উন্নত সংকর জাতের অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভী সংগ্রহ করতে হবে। খামারের ব্যবস্থাপনা উন্নত হতে হবে। গাভীর সংখ্যা ১০ ও তদূর্ধে হলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে খামার পরিচালনা করা যায়।

ব্যাংক ঋণ পরিশোধ খতিয়ান

বছর	মূল ঋণ	সূদ	মোট	নীট	পরিশোধ			উদ্বৃত্ত (নীট লাভ)
					মূল	সূদ	মোট	
১								
২								
৩								
৪								
৫								
৬								
৭								
৮								

২১.৬ ৫টি গাভী সম্বলিত খামারের পরিকল্পনা।

মূলধন বিনিয়োগঃ

ক) জমি নির্মাণ বাবদ	০.৫০ একর, নিজস্ব
১) ঘরবাড়ী নির্মান বাবদ	১৫ শতাংশ
২) ঘাস উৎপাদন বাবদ	সবুজ ঘাস উৎপাদনের জন্য অবশিষ্ট জমি রাখা হয়েছে।

খ) ঘরবাড়ী নির্মাণ

১। ৫ টি গাভীর ঘর-২০ বর্গমিটার। প্রতি বর্গমিটার @৪০০০/- টাকা (আর সিসি খুটি, সি, আই সিট, ঢালাই মেঝে, টিনের চালাঘর)	৮০,০০০/-
২। ৫টি(০-১) বছর বয়সের বাছুরের ঘর ১০ বর্গমিটার @ ৪০০০/- টাকা (আর সিসি খুটি, সি আই সিট, ঢালাই মেঝে, টিনের চালাঘর)	৪০,০০০/-
৩। খাদ্য গুদাম ২×৩ = ৬ বর্গমিটার। (টিনের চালা, মেঝে পাকা) প্রতি বর্গমিটার @ ৪০০০/- টাকা	২৪,০০০/-
৪। গোবর রাখার গর্ত তৈরী বাবদ	১০০০/-
সর্বমোট টাকা	১,৪৫,০০০/-

গ) গাভী ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ

১। প্রতিটি গাভী ৪০,০০০/- টাকা হিসাবে ৫টি গাভীর ক্রয় মূল্য প্রতিটি গাভী কমপক্ষে ৬ লিটার দুধ প্রদানে সক্ষম হতে হবে (বাছুরের চাহিদা বাদে)	২,০০,০০০/-
২। যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ঃ দুধের পাত্র, খাবার পাত্র, দুধ মাপার পাত্র, হুসপাইপ, টেবিল চেয়ার, ইত্যাদি বাবদ	১০,০০০/-
সর্বমোট টাকা	২,১০,০০০/-

মোট মূলধন বিনিয়োগঃ (১,৪৫,০০০/-+২,১০,০০০/-)=৩,৫৫,০০০/-

আবর্তক খরচ ঃ

ক) খাদ্য খরচঃ	
১। দানাজাতীয় খাদ্য ঃ ৫ টি গাভীর দানাজাতীয় খাবার গড়ে ৬ লিটার দুধালো গাভীর জন্য দৈনিক ৪ কেজি, ২৮৫ দিন, দুধ না দেওয়া অবস্থায় ৮০ দিন ২ কেজি দানাদার খাদ্য হিসাবে মোট (৫×২৮৫×৪ + ৫×৮০×২) ৬,৫০০ কেজি প্রয়োজন। প্রতি বাছুর প্রতিদিন ১ কেজি হিসাবে ৩৩০ দিনে(৫×১ ×৩৩০) = ১,৬৫০ কেজি প্রয়োজন। মোট (৬,৫০০+১,৬৫০)=৮১৫০ কেজি দানাদার খাদ্য প্রয়োজন। প্রতিকেজি ১৭ টাকা হিসাবে (৮১৫০×১৭)	১,৩৮,৫৫০/-
২। ছোবড়া বা আঁশ জাতীয় খাদ্য ঃ খড় প্রতি গাভীর জন্য দৈনিক ৩ কেজি হিসাবে ৫টি গাভীর ১ বছরের খাদ্য (৫×৩×৩৬৫)=৫,৪৭৫ কেজি। প্রতি বাছুরের জন্য দৈনিক ১ কেজি হিসাবে ৫টি বাছুরের ৩৩০ দিনের খাদ্য (৫×১×৩৩০) =১,৬৫০ কেজি। মোট(৫,৪৭৫+১,৬৫০)=৭,১২৫ কেজি খড় প্রয়োজন। প্রতিকেজি ২.০০ টাকা হিসাবে	১৪,২৫০/-
৩। কাঁচাঘাসঃ গাভী প্রতি দৈনিক ১২ কেজি হিসাবে ৫টি গাভীর ১ বছরের খাদ্য (৫×১২×৩৬৫)=২১,৯০০কেজি। প্রতি বাছুরের জন্য দৈনিক ৩ কেজি হিসাবে ৫ টি বাছুরের ৩৩০ দিনের খাদ্য (৫×৩×৩৩০)= ৪,৯৫০ কেজি। মোট (২১,৯০০ + ৪,৯৫০)=২৬,৮৫০ কেজি কাঁচা ঘাস। প্রতি কেজি ০.৮০ টাকা হিসাবে (২৬,৮৫০ × ০.৮)	২১,৪৮০/-
খ) আনুষাংগিক খরচ (ঔষধ, শেড মেরামত ও অন্যান্য)=	১০,০০০/-
গ) স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগ এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসাবে মোট ৩,৫৫,০০০/-ব্যাংক হতে বছরে ১০%হারে সুদ এবং প্রতি বছর কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করা হবে।	৩৫,৫০০/-
ঘ) অপচয় খরচঃ ১। ঘরবাড়ীর ২%	২৯০০/-
২। যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের ১০ %	১০০০/-
সর্বমোট টাকা=	২,২৩,৬৮০/-

খামারের উৎপাদন ও আয়

ক) প্রতি গাভী দৈনিক গড়ে ৬ লিটার দুধ দেয় ২৮৫ দিন (৫×৬×২৮৫)=৮,৫৫০ লিটার, প্রতি লিটার ৩২ টাকা হিসাবে (৮,৫৫০ × ৩২) =	২,৭৩,৬০০/-

খ) ৫ টি গাভী ও বাছুরের গোবর (সার) বিক্রয় বাবদ	২,০০০/-
১ম বছর আয় মোট টাকা =	২,৭৫,৬০০/-
গ) ১ বছর বয়সের ৫টি সংকর জাতের বাছুরের বিক্রয় মূল্য(১৫০০০×৫)	৭৫,০০০/-
২য় বছর আয় মোট টাকা=	৩,৫০,৬০০/-
ঘ) ৮ তম বছরে ৫টি গাভী ও ৫টি বাছুরের বিক্রয় মূল্য (প্রতিটি গাভী @৩০,০০০/- টাকা ও বাছুর @ ১৫,০০০/-)	২,২৫,০০০/-
সর্বমোট=	৫,৭৫,৬০০/-

আয় ব্যয়ের হিসাব

১) প্রথম বছর আয়	২,৭৫,৬০০/-
১ম বছর ব্যয়	২,২৩,৬৮০/-
প্রকৃত আয়	৫১,৯২০/-

২) ২য় বছর হতে ৭ম বছর পর্যন্ত প্রতি বছর আয়	৩,৫০,৬০০/-
২য় বছর হতে ৭ম বছর পর্যন্ত প্রতি বছর ব্যয়	২,২৩,৬৮০
প্রকৃত আয়	১,২৬,৯২০/-

৩) ৮ম বছর আয় (গাভী ও বাছুর বিক্রয় মূল্য সহ)	৫,৭৫,৬০০/-
৮ম বছর ব্যয়	২,২৩,৬৮০/-
প্রকৃত আয়	৩,৫১,৯২০/-

২১.৭ বাণিজ্যিক ভাবে ২০ টি গাভী সম্বলিত খামারের পরিকল্পনা।

মূলধন বিনিয়োগঃ

ক) জমি নির্মাণ বাবদ	২.০ একর, নিজস্ব
১) ঘরবাড়ী নির্মান বাবদ	৭৫ শতাংশ
২) ঘাস উৎপাদন বাবদ	সবুজ ঘাস উৎপাদনের জন্য অবশিষ্ট জমি রাখা হয়েছে।

খ) ঘরবাড়ী নির্মাণ

১। ২০ টি গাভীর ঘর-৮০ বর্গমিটার। প্রতি বর্গমিটার @৪,০০০/- টাকা (আর সিসি খুটি, সি আই সিট, ঢালাই মেঝে, টিনের চালাঘর)	৩,২০,০০০.০০
২। ২০টি(০-১) বছর বয়সের বাছুরের ঘর ৪০ বর্গমিটার @৪,০০০/- টাকা (আর সিসি খুটি, সি আই সিট, ঢালাই মেঝে, টিনের চালাঘর)	১৬,০০০.০০
৩। অফিস কক্ষ ৩ × ৪ =১২ বর্গমিটার (টিনের চালা, মেঝে পাকা) প্রতি বর্গমিটার @৪,০০০/- টাকা	৪৮,০০০.০০
৪। খাদ্য গুদাম ৩×৫ = ১৫ বর্গমিটার। (টিনের চালা, মেঝে পাকা) প্রতি বর্গমিটার @৪,০০০/- টাকা	৬০,০০০.০০
৫। মেটারনিটি হাউজ ২×৩ = ৬ বর্গমিটার। (টিনের চালা, মেঝে পাকা) প্রতি বর্গমিটার @৪,০০০/- টাকা	২৪,০০০.০০
৬। কোয়ারেন্টাইন হাউজ ২×৩ = ৬ বর্গমিটার। (টিনের চালা, মেঝে পাকা) প্রতি বর্গমিটার @৪,০০০/- টাকা	২৪,০০০.০০
৭। গোবর রাখার গর্ত তৈরী বাবদ	২,০০০.০০
সর্বমোট টাকা	৪,৯৪,০০০.০০

গ) গাভী ও যন্ত্রপাতি ক্রয়

১। প্রতিটি গাভী ৪০,০০০/- টাকা হিসাবে ২০টি গাভীর ক্রয় মূল্য প্রতিটি গাভী কমপক্ষে ৬ লিটার দুধ প্রদানে সক্ষম হতে হবে (বাছুরের চাহিদা বাদে)	৮,০০,০০০/-
২। যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় দুধের পাত্র, খাবার পাত্র, দুধ মাপার পাত্র, হুসপাইপ, টেবিল চেয়ার, ইত্যাদি বাবদ	২০,০০০/-
৩। স্যালো ডিপ টিউবওয়েল বসানো সহ খরচ বাবদ	১০,০০০/-
সর্বমোট টাকা	৮,৩০,০০০/-

মোট মূলধন বিনিয়োগঃ (৪,৯৪,০০০/-+৮,৩০,০০০/-)= ১৩,২৪,০০০/-

আবর্তক খরচ ঃ

ক) দৈনিক ১০০ টাকা হিসাবে ২ জন শ্রমিকের ১ বছরে খরচ (১০০×২×৩৬৫)	৭৩,০০০/-
খ) খাদ্য খরচঃ	
১। দানাজাতীয় খাদ্য ঃ ২০ টি গাভীর দানাজাতীয় খাবার গড়ে ৬ লিটার দুধালো গাভীর জন্য দৈনিক ৪ কেজি, ২৮৫ দিন, দুধ না দেওয়া অবস্থায় ৮০ দিন ২ কেজি দানাদার খাদ্য হিসাবে মোট (২০×২৮৫×৪ + ২০×৮০×২) ২৬,০০০ কেজি প্রয়োজন। প্রতি বাছুর প্রতিদিন ১ কেজি হিসাবে ৩৩০ দিনে (২০×১ ×৩৩০) = ৬,৬০০ কেজি প্রয়োজন। মোট (২৬০০০+৬৬০০) =৩২৬০০ কেজি দানাদার খাদ্য প্রয়োজন। প্রতিকেজি ১৭ টাকা হিসাবে (৩২৬০০×১৭)	৫,৫৪,২০০/-
২। ছোবড়া বা আঁশ জাতীয় খাদ্য ঃ খড় প্রতি গাভীর জন্য দৈনিক ৩ কেজি হিসাবে ২০টি গাভীর ১ বছরের খাদ্য (২০×৩×৩৬৫)=২১,৯০০ কেজি। প্রতি বাছুরের জন্য দৈনিক ১ কেজি হিসাবে ২০টি বাছুরের ৩৩০ দিনের খাদ্য (২০×১×৩৩০)=৬,৬০০ কেজি । মোট(২১,৯০০ +৬,৬০০)=২৮,৫০০ কেজি খড় প্রয়োজন। প্রতিকেজি ২.০০ টাকা হিসাবে	৫৭০০০/-
৩। কাঁচাঘাসঃ গাভী প্রতি দৈনিক ১২ কেজি হিসাবে ২০টি গাভীর ১ বছরের খাদ্য (২০×১২×৩৬৫)=৮৭,৬০০ কেজি। প্রতি বাছুরের জন্য দৈনিক ৩ কেজি হিসাবে ২০ টি বাছুরের ৩৩০ দিনের খাদ্য (২০×৩×৩৩০)= ১৯,৮০০ কেজি। মোট (৮৭,৬০০ + ১৯,৮০০)=১,০৭,৪০০ কেজি কাঁচা ঘাস। প্রতি কেজি ০.৮০ টাকা হিসাবে (২৬,৮৫০ × ০.৮)	৮৫,৯২০/-
খ) আনুষাংগিক খরচ (ঔষধ, শেড মেরামত ও অন্যান্য)=	২০,০০০/-

গ) স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগ এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসাবে মোট ১৩,২৪,০০০/-ব্যাংক হতে বছরে ১০%হারে সুদ এবং প্রতি বছর কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করা হবে।	১,৩২,৪০০/-
ঘ) অপচয় খরচঃ ১। ঘরবাড়ীর ২%	৯,৮৮০/-
২। যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের ১০ %	৩,০০০/-
সর্বমোট টাকা=	৯,৩৫,৪০০/-

খামারের উৎপাদন ও আয়ঃ

ক) প্রতি গাভী দৈনিক গড়ে ৬ লিটার দুধ দেয় ২৮৫ দিন (২০×৬×২৮৫)=৩৪,২০০/- লিটার, প্রতি লিটার ৩২ টাকা হিসাবে= (৩৪,২০০/- × ৩২) =	১০,৯৪,৪০০/-
খ) ২০ টি গাভী ও বাছুরের গোবর (সার) বিক্রয় বাবদ	৮,০০০/-
প্রথম বছর আয় মোট টাকা =	১১,০২,৪০০/-
গ) ১ বছর বয়সের ১৯টি সংকর জাতের বাছুর বিক্রয় মূল্য @১৫,০০০/-,(১টি বাছুর মৃত্যু ধরা হয়েছে)	২,৮৫,০০০/-
২য় বছর আয় মোট টাকা=	১৩,৮৭,৪০০/-
ঘ) ৮ তম বছরে ২০টি গাভী ও ১৯টি বাছুরের বিক্রয় মূল্য(প্রতিটি গাভী @ ৩০,০০০/- টাকা ও বাছুর @ ১৫,০০০/-)	৮,৮৫,০০০/-
সর্বমোট=	২২,৭২,৪০০/-

আয় ব্যয়ের হিসাব

১) প্রথম বছর আয়	১১,০২,৪০০/-
১ম বছর ব্যয়	৯,৩৫,৪০০/-
প্রকৃত আয়=	১,৬৭,০০০/-

২) ২য় বছর হতে ৭ম বছর পর্যন্ত প্রতি বছর আয়	১৩,৮৭,৪০০/-
২য় বছর হতে ৭ম বছর পর্যন্ত প্রতি বছর ব্যয়	৯,৩৫,৪০০/-
প্রকৃত আয়=	৪,৯২,০০০/-
৩) ৮ম বছর আয় (গাভী ও বাছুর বিক্রয় মূল্য সহ)	২২,৭২,৪০০/-
৮ম বছর ব্যয়	৯,৩৫,৪০০/-
প্রকৃত আয়=	১৩,৩৭,০০০/-

২১.৮ বাণিজ্যিক ভাবে ১০০ টি গাভী সম্বলিত খামারের পরিকল্পনা।

মূলধন বিনিয়োগঃ

ক) জমি নির্মাণ বাবদ	১০.০ একর, নিজস্ব
১) ঘরবাড়ী নির্মান বাবদ	১.৫ একর
২) ঘাস উৎপাদন বাবদ	সবুজ ঘাস উৎপাদনের জন্য অবশিষ্ট জমি রাখা হয়েছে।

খ) ঘরবাড়ী নির্মাণ

১। ১০০ টি গাভীর ঘর-৪০০ বর্গমিটার। প্রতি বর্গমিটার @৪,০০০/- টাকা (আর সিসি খুটি, সি আই সিট, ঢালাই মেঝে, টিনের চালাঘর)	১৬,০০,০০০/-
২। ১০০টি(০-১) বছর বয়সের বাছুরের ঘর ২০০ বর্গমিটার @৪,০০০/- টাকা (আর সিসি খুটি, সি আই সিট, ঢালাই মেঝে, টিনের চালাঘর)	৮,০০,০০০/-
৩। অফিস কক্ষ ১২ বর্গমিটার (টিনের চালা, মেঝে পাকা) প্রতি বর্গমিটার @৪,০০০/- টাকা	৪৮,০০০/-
৪। খাদ্য গুদাম ৩০ বর্গমিটার। (টিনের চালা, মেঝে পাকা) প্রতি বর্গমিটার @৪,০০০/- টাকা	১,২০,০০০/-
৫। মেটারনিটি হাউজ ৩০ বর্গমিটার। (টিনের চালা, মেঝে পাকা) প্রতি বর্গমিটার @৪,০০০/- টাকা	১,২০,০০০/-
৬। কোয়ারেন্টাইন হাউজ ৩০ বর্গমিটার। (টিনের চালা, মেঝে পাকা) প্রতি বর্গমিটার @৪,০০০/- টাকা	১,২০,০০০/-
৭। গোবর রাখার গর্ত তৈরী বাবদ	৫,০০০/-
সর্বমোট টাকা	২৮,১৩,০০০/-

গ) গাভী ও যন্ত্রপাতি ক্রয়

১। প্রতিটি গাভী ৪০,০০০/- টাকা হিসাবে ১০০টি গাভীর ক্রয় মূল্য প্রতিটি গাভী কমপক্ষে ৬ লিটার দুধ প্রদানে সক্ষম হতে হবে (বাছুরের চাহিদা বাদে)	৪০,০০,০০০/-
২। যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ঃ দুধের পাত্র, খাবার পাত্র, দুধ মাপার পাত্র, হুসপাইপ, টেবিল চেয়ার, ইত্যাদি বাবদ	৩০,০০০/-
৩। স্যালো ডিপ টিউবওয়েল বসানো সহ খরচ বাবদ	১০,০০০/-
সর্বমোট টাকা	৪০,৪০,০০০/-

মোট মূলধন বিনিয়োগঃ (২৮,১৩,০০০/-+৪০,৪০,০০০/-)= ৬৮,৫৩,০০০/-

আবর্তক খরচ ঃ

ক) দৈনিক ১০০ টাকা হিসাবে ৫ জন শ্রমিকের ১ বছরে খরচ (১০০×৫×৩৬৫)	১,৮২,৫০০/-
খ) খাদ্য খরচঃ	
১। দানাজাতীয় খাদ্য ঃ ১০০ টি গাভীর দানাজাতীয় খাবার গড়ে ৬ লিটার দুধালো গাভীর জন্য দৈনিক ৪ কেজি, ২৮৫ দিন, দুধ না দেওয়া অবস্থায় ৮০ দিন ২ কেজি দানাদার খাদ্য হিসাবে মোট (১০০×২৮৫×৪ + ১০০×৮০×২) ১৩০,০০০ কেজি প্রয়োজন। প্রতি বাছুর প্রতিদিন ১ কেজি হিসাবে ৩৩০ দিনে(১০০×১ ×৩৩০) = ৩৩,০০০ কেজি প্রয়োজন। মোট (১৩০,০০০ +৩৩,০০০) =১৬৩,০০০ কেজি দানাদার খাদ্য প্রয়োজন। প্রতিকেজি ১৭ টাকা হিসাবে (৩২৬০০×১৭)	২৭৭১০০০/-
২। ছোবড়া বা আঁশ জাতীয় খাদ্য ঃ খড় প্রতি গাভীর জন্য দৈনিক ৩ কেজি হিসাবে ১০০টি গাভীর ১ বছরের খাদ্য (১০০×৩×৩৬৫)= ১০৯,৫০০ কেজি। প্রতি বাছুরের জন্য দৈনিক ১ কেজি হিসাবে ১০০টি বাছুরের ৩৩০ দিনের খাদ্য (১০০×১×৩৩০) =৩৩,০০০ কেজি । মোট(১০৯৫০০ +৩৩০০০)=১৪২,৫০০ কেজি খড় প্রয়োজন। প্রতিকেজি ২.০০ টাকা হিসাবে	২৮৫০০০/-
৩। কাঁচা ঘাসঃ গাভী প্রতি দৈনিক ১২ কেজি হিসাবে ১০০টি গাভীর ১ বছরের খাদ্য (১০০×১২×৩৬৫)= ৪৩৮০০০ কেজি। প্রতি বাছুরের জন্য দৈনিক ৩ কেজি হিসাবে ১০০ টি বাছুরের ৩৩০ দিনের খাদ্য (১০০ ×৩×৩৩০) = ৯৯,০০০ কেজি। মোট (৪৩৮,০০০ + ৯৯,০০০)=৫৩৭০০০ কেজি কাঁচা ঘাস। প্রতি কেজি ০.৮০ টাকা হিসাবে (৫৩৭০০০× ০.৮)	৪২৯৬০০/-

খ) আনুষাংগিক খরচ (ঔষধ, শেড মেরামত ও অন্যান্য)=	৫০,০০০/-
গ) স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগ এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসাবে মোট ৬৮,৫৩,০০০/-ব্যাংক হতে বছরে ১০%হারে সুদ এবং প্রতি বছর কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করা হবে।	৬৮৫৩০০/-
ঘ) অপচয় খরচঃ ১। ঘরবাড়ীর ২%	৫৬২৬০/-
২। যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের ১০ %	৪,০০০/-
সর্বমোট টাকা=	৪৪,৬৩,৬৬০/-

খামারের উৎপাদন ও আয়ঃ

ক) প্রতি গাভী দৈনিক গড়ে ৬ লিটার দুধ দেয় ২৮৫ দিন (১০০×৬×২৮৫)=১৭১,০০০/- লিটার, প্রতি লিটার ৩২ টাকা হিসাবে= (১৭১,০০০/- × ৩২) =	৫৪,৭২,০০০/-
খ) ১০০ টি গাভী ও বাছুরের গোবর (সার) বিক্রয় বাবদ	৪০,০০০/-
প্রথম বছর আয় মোট টাকা =	৫৫,১২,০০০/-
গ) ১ বছর বয়সের ৯৬টি সংকর জাতের বাছুর বিক্রয় মূল্য @১৫,০০০/-,(৪টি বাছুর মৃত্যু ধরা হয়েছে)	১৪,৪০,০০০/-
২য় বছর আয় মোট টাকা=	৬৯,৫২,০০০/-
ঘ) ৮ তম বছরে ১০০টি গাভী ও ৯৬টি বাছুরের মূল্য(প্রতিটি গাভী @ ৩০,০০০/- টাকা ও বাছুর @ ১৫,০০০/-)	৪৪,৪০,০০০/-
সর্বমোট=	১১৩,৯২,০০০/-

আয় ব্যয়ের হিসাব

১) প্রথম বছর আয়	৫৫,১২,০০০/-
১ম বছর ব্যয়	৪৪,৬৩,৬৬০/-
প্রকৃত আয়=	১০,৪৮,৩৪০/-

২) ২য় বছর হতে ৭ম বছর পর্যন্ত প্রতি বছর আয়	৬৯,৫২,০০০/-
২য় বছর হতে ৭ম বছর পর্যন্ত প্রতি বছর ব্যয়	৪৪,৬৩,৬৬০/-
প্রকৃত আয়=	২৪,৮৮,৩৪০/-

৩) ৮ম বছর আয় (গাভী ও বাছুর বিক্রয় মূল্য সহ)	১১৩,৯২,০০০/-
৮ম বছর ব্যয়	৪৪,৬৩,৬৬০/-
প্রকৃত আয়=	৬৯,২৮,৩৪০/-

উৎসঃ

*গাভী পালন গাইড - এ. টি. এম. ফজলুল কাদের
*উচ্চতর প্রাণি বিজ্ঞান - এস এম ইমাম হুসাইন
*প্রাণি খামার ও চিকিৎসা - এস এম ইমাম হুসাইন
*আধুনিক প্রাণিপালন ও ব্যবস্থাপনা ট্রেনিং ম্যানুয়েল - প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মডিউল-২২ ঃ
গরু মোটাতাজাকরণ

আমাদের দেশের প্রায় ৭০ ভাগ গ্রামীণ পরিবারই প্রাণি প্রতিপালনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও গরু মোটাতাজাকরণ কলা কৌশল বা প্রযুক্তি ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা খুবই কম। তবে গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের গুরুত্ব না জানলেও অনেক পরিবার একটি বা দুটি বাড়ন্ত এড়ে গরু ক্রয় করে প্রযুক্তি ব্যতিরেকে সাধারণভাবে লালন পালন করে যখন স্বাস্থ্য ভাল হয় তখন বিক্রয় করে দেয়। সাধারণত বেশি বিক্রয়মূল্য পাওয়ার আশায় অধিকাংশ লোকই কোরবানীর সময় তাদের পালনকৃত গরু বিক্রয় করেন। বিষয়টি সর্ম্পকে স্পষ্ট ধারণা, ব্যাপক প্রচার ও প্রশিক্ষণের অভাবে প্রযুক্তিটি ব্যপকভাবে পরিচিতি পায়নি। তথাপি সরকারী, আধাসরকারী ও এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রোটিনের চাহিদা মেটানো, কর্মস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও বেকার যুবকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে গরু মোটাতাজাকরণের উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, আর্থিক অনুদান, সহজ উপায়ে লোন ইত্যাদি দিয়ে সহযোগিতা করছে। আশা করা যায় ভূমিহীন নর-নারী ও বেকার যুবকদের আয় ও কর্মস্থানের ক্ষেত্রে এ প্রযুক্তি ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

গরু মোটাতাজাকরণ বা বীফ ফ্যাটেনিং (Beef Fattening) বলতে কিছু সংখ্যক গরু বা বাড়ন্ত বাছুরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় এবং উন্নত সুষম খাবার সরবরাহ করে ঐ গরুর শরীরে অধিক পরিমাণ মাংস/চর্বি বৃদ্ধি করে বাজারজাত করাকেই বুঝায়।

২২.১ গরু মোটাতাজাকরণের উদ্দেশ্য

১. দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ
২. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য চামড়া শিল্পের সমৃদ্ধি
৩. জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা ও বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান করা
৪. জৈব সার সহজলভ্য করা
৫. পরিবেশ দূষণমুক্ত ও গবাদিপ্রাণিজাত শিল্প গড়ে তুলতে পারে।
৬.বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে গোবর থেকে গ্যাস আহরণ করে ব্যবহার করা যেতে পারে।
৭.কর্মসূচীর সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক জনগণকে এ কাজে উৎসাহিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করা যেতে পারে।

গরু মোটাতাজাকরণের সুবিধা সমূহ

১। কম মূলধণ ও কম জায়গার প্রয়োজন হয়।
২। অল্প সময়ের (৪-৬ মাসের) মধ্যে গরু মোটাতাজা করে অধিক মূল্যে বাজারে বিক্রয় করা যায় অর্থাৎ আর্থিক মুনাফা অর্জন করা যায়।
৩। খুব সল্প সময়ের মধ্যে লাভসহ মুনাফা ফেরত পাওয়া যায়।
৪। বেকার এবং মহিলাদের কর্মসংস্থানে সুযোগ বেশি।
৫। বসতভিটা আছে এমন সকল পরিবার স্বল্প বিনিয়োগকরে এ প্রকল্পের আওতায় আসার ব্যাপক সুযোগ লাভ করতে পারে।
৬। বাজারের মাংসের চাহিদা সব সময় বেশি থাকার কারণে বাজার দর নিম্নগতির সম্ভাবনা কম ও লোকসানের ঝুঁকি কম থাকে।
৭। বাড়ন্ত গরুর রোগ-ব্যাধির প্রকোপ খুব কম থাকে, ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভবনা খুব কম।
৮। স্থানীয় বাজার-হাট থেকে অনায়াসে প্রাণি ক্রয় করে প্রকল্প শুরু করা যায়।
৯। স্থানীয় ভাবে খাদ্যের সাথে বাড়ীর উচ্ছিষ্ঠ খাদ্যের সদ্ব্যাবহার হয়।

২২.২ খামার পরিকল্পনা

বীফ ফ্যাটেনিং প্রকল্পে খামার পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নিম্নে খামার পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হলো।

১। ব্যাক্তিগত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা

- গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে নিজস্ব চিন্তাভাবনা।
- খামার স্থাপন বিষয়ে আগ্রহ ও আন্তরিকতা।
- প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা।
- খামার পরিচালনা বিষয়ে নিজস্ব দক্ষতা।
- সম্পদের প্রাপ্যতা।
- খামার স্থাপনের জন্য নিজস্ব জমি।
- নিজস্ব মূলধন অথবা মূলধন প্রাপ্তির উৎস।
- খামার পরিচালনার জন্য সময় প্রদান।
- ব্যবস্থাপনা/পরিচালনার জন্য বিশ্বস্ত ও দক্ষ কর্মী।

২। উপকরণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

- গরু প্রাপ্তির উৎস
- খামারের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম
- খাদ্য সামগ্রীর উৎস ও প্রাপ্যতা।

৩। বাজারের নিশ্চয়তা

- উৎপাদিত গরুর জন্য স্থানীয় বাজার
- মাংসের স্থানীয় চাহিদা অথবা বিপননের বিকল্প ব্যবস্থা
- স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে গরুর মাংস ক্রয়ের পরিমাণ
- মাংসের বিক্রয় মূল্য।

৪। সুযোগ সুবিধা

- খামার স্থাপনের জন্য পরিবেশ
- আবর্জনা ও বর্জ্য অপসারণ সুবিধা
- সেনিটেশন সুবিধা
- বৃহদাকার খামার হলে খামারে নিয়োজিত ব্যক্তিদের আবাসিক সুবিধা ও যানবাহন।

৫। স্থান

- ছোট খামার হলে বসত বাড়ীর নিকট, অন্যথায় অন্যান্য খামার থেকে যথা সম্ভব দূরে
- লোকালয় থেকে সম্ভাব্য দূরে
- ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা
- বৈদ্যুতিক সুবিধা
- উঁচু স্থান যেখানে জলাবদ্ধতা সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই

৬। প্রকল্প প্রণয়ন

- খামার স্থাপনের জন্য স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও প্রয়োজনে ঋণদান সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্প করতে হবে।
- খামার স্থাপনের জন্য একটি নকশা প্রস্তুত করার প্রয়োজন হবে।
- নকশার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ঘরের অবস্থান, চারণভূমি, ঘাস উৎপাদনের জমি এবং ভবিষ্যত সম্প্রসারণ সুবিধা দেখাতে হবে।
- পরিবেশ দূষণ সম্ভবনা থাকলে কিভাবে নিবারণ করা যাবে, প্রকল্পের মধ্যে তার কথা উল্লেখ থাকতে হবে।

৭। খামার প্রকল্প গ্রহণ পূর্ব বিবেচনা

গরু মোটাতাজা করার পূর্বে নিম্নের আলোচিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে ঃ

মূলধনঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে কত টাকা লাগবে এবং এর কি উৎস হতে পারে, তা পূর্বেই ঠিক করতে হবে। কারণ মূলধন পুরোপুরি সংগ্রহ না করে কাজ শুরু করলে প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে।

গরু বিক্রয়ের হাট ঃ সাধারণত হাট-বাজার থাকলেই মোটাতাজা গরু বিক্রয়ের হাট আছে বুঝায় না। এলাকায় কতটি স্থানে কতটি গরু প্রতিদিন/প্রতি সপ্তাহে জবাই করা করা হয় তা একটি জরীপের মাধ্যমে জানতে হবে এবং ক্রেতারা কি পরিমাণ গরুর মাংস খায়, সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত দরে গরুর মাংস বিক্রয় হয় তাও জানতে হবে। গরুটি বিক্রয়ের জন্য হাটে যেতে হবে নাকি কসাই এসে নিয়ে যাবে সে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

গবাদিপ্রাণির খাদ্য সামগ্রীর প্রাপ্যতা ঃ গবাদিপ্রাণির যে সকল খাদ্য দ্রব্য দরকার তা সম্পর্কে যেমন পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে তেমনি খাদ্য দ্রব্যগুলি কোথায়, কতদূরে এবং কত দরে সংগ্রহ করা যাবে তা জানতে হবে। বছরের সব সময় পাওয়া যাবে কিনা এবং একবারে কিনে রাখার মত পরিমাণ পাওয়া যাবে কিনা তা জানতে হবে।

কর্মী ও কর্মী ব্যবস্থাপনা ঃ প্রকল্প সঠিক বাস্তবায়নের জন্য দুই বা দুই এর অধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি কর্মীব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির কাজের সাথে অপরের সমন্বয় থাকা জরুরি। কর্মীদের হতে হবে- সৎ, নিবেদিত, দায়িত্ববান, বুদ্ধিমান, সহানুভূতিশীল, পূর্বে এ কাজ বা অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।

২২.৩ গরু মোটাতাজাকরণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পদক্ষেপসমূহ

বাণিজ্যিকভাবে গরু মোটাতাজাকরণের জন্য কমপক্ষে **১২**টি অত্যাবশ্যকীয় পদক্ষেপসমূহের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে হয় ঃ

১. প্রকল্প চালুর উপযুক্ত সময়।
২. সঠিক জাতের গবাদি প্রাণি নির্বাচন ও ক্রয়।
৩. বিভিন্ন প্রাণির স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ।
৪. বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক প্রদান
৫. গবাদি প্রাণির স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের ব্যবস্থা করণ।
৬. সুষম ও পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ ও নিশ্চিত করণ।
৭. প্রাণির দৈহিক ওজন রেকর্ড করণ
৮. প্রাণির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা
৯. এঁড়ে গরু খোঁজা করণ
১০. মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের জন্য মেয়াদকাল।
১১. বাজারজাতকরণের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ।
১২. গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে বিনিয়োগ ও মুনাফার তথ্য রেকর্ডকরণ।

২২.৩.১ প্রকল্প চালুর উপযুক্ত সময়

আমাদের দেশের আবহাওয়ায় যে কোন সময় এ প্রকল্প শুরু করা যায়। তবে আমাদের দেশে ঈদুল আজহার সময় গবাদি প্রাণির ব্যাপক চাহিদা থাকে। এই উৎসবে যাতে প্রাণি বিক্রয় করা যায় সেই অনুপাতে প্রকল্প শুরু করতে হবে অর্থাৎ উৎসবের ৪/৫ মাস পূর্বে প্রকল্প চালু করা যেতে পারে। এছাড়া যে সময় গবাদি প্রাণির দাম কম থাকে এবং প্রাণি খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় সেই সময় প্রকল্প শুরু করা যায়। যে সময়ে প্রাণির দাম চড়া ও খাদ্যাভাব এবং রোগের প্রকোপ বেশি সেই সময় প্রকল্প হাতে নেওয়া যাবে না। তবে নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে আরম্ভ করলে ভাল হয়। কারণ, এ সময় একটু ঠান্ডা থাকে ফলে গবাদিপ্রাণিকে এক স্থান হতে ক্রয় করে অন্য স্থানে সহজেই পরিবহন করা সহজ হয় এবং প্রাণি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে। প্রকল্প চালুর উপযুক্ত সময় নির্ভর করবে যেখানে খামার করা হবে সেখানকার আবহাওয়া, গরু ও খাদ্যের বাজার দর ইত্যাদি।

২২.৩.২ প্রাণি নির্বাচন ও ক্রয়

উপযুক্ত জাত ও ধরন অনুসারে প্রাণি নির্বাচন এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অনুসরণ করতে হবে।

ক) প্রাণির বয়স ঃ মোটাতাজাকরণ বা বীফ ফ্যাটেনিং কর্মসূচীর জন্য ২.৫-৪ বৎসরের এঁড়ে/ষাড় গরু ক্রয় করা উচিত। যদিও এঁড়ে বাছুরের বয়স নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। কেউ কেউ এঁড়ে বাছুরের বয়স ১.৫-২ বছর হওয়া উচিত বলে মনে করেন। তবে এই বয়সের প্রাণি প্রচুর খেতে পারে না এবং খেলেও হজম করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এ বয়সের ষাঁড় গরুর শরীর ঠিকমত বাড়তে ৫/৬ মাস লেগে যায়। এজন্য ২ বছরের উর্দ্ধে এমন প্রাণি হলেই ভাল হয়। সাধারণত ২-৪ বছরের সংকর জাতের ষাঁড় গরুর বৃদ্ধির হার অন্যান্য বয়সের তুলনায় বেশী হওয়ায় মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে এ ধরনের বয়সের প্রাণি নির্বাচন করতে হয়।

প্রাণির বয়স নির্ণয় পদ্ধতি ঃ গবাদিপ্রাণির বয়স ফার্ম থেকে ক্রয় করলে ফার্মের রেজিষ্টার হতে পাওয়া যায়। এছাড়া প্রাণি মালিকের নিকট থেকে তথ্য নিয়ে জানা যায়। বাছুর গরুর জন্মগ্রহণের রেজিষ্টার সংরক্ষিত না থাকলে প্রাণির দাঁত ও শিং এর রিং দেখে বয়স নির্ণয় করা যায়। গবাদিপ্রাণির যখন দুটি স্থায়ী ইনসিজর দাঁত ওঠে তখন প্রাণিটির বয়স হবে ১৯-২৪ মাস অর্থাৎ গরুর বয়স ২ বছর। এর পর প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর এক জোড়া করে স্থায়ী দাঁত উঠে। একটি ৩.৫-৪.০ বছরের গরুর সামনের নিচের পাটিতে প্রতি পার্শ্বে ৪টি করে মোট ৮টি দাঁত উঠবে। গরুর বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার সময় অথবা বাছুরের ১ সপ্তাহ বয়সে সামনের অস্থায়ী দাঁত গজায় এবং ৫-৬ মাসের মধ্যে অস্থায়ী দাঁত সবগুলো উঠে যায়। অস্থায়ী ও স্থায়ী দাঁতের মধ্যে পার্থক্য হলো দাঁতগুলো কিছুটা সরু, দুই দাঁতের মাঝে ফাঁকা থাকবে এবং স্থায়ী দাঁত মোটা হয়ে ওঠবে এবং দুই দাঁতের গোড়ায় কোন ফাঁকা থাকবে না। এছাড়া শিং দেখে বয়স নির্ণয়ের বিষয়টি আরো সহজ। এ ক্ষেত্রে শিং এ গোলাকার রিং দেখে বয়স নিরুপন করা হয়। প্রতি রিংয়ের সংখ্যা +২ = প্রাণির প্রকৃত বয়স।

এছাড়া বলদ গরুকে মোটাতাজাকরণের প্রকল্পের জন্য ক্রয় করে দেখা গেছে বলদের স্বাস্থ্য তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি হয় এতে অনেক প্রকল্প গ্রহণকারীগণ এড়ে গরুর চেয়ে বেশি লাভবান হয়েছেন।

(খ) মোটাতাজাকরণের জন্য জাত বাছাই

প্রাণি নির্বাচনে গরুর জাত একটি গরুত্ব পূর্ণ বিষয়। Beef Fattening এর জন্য আমাদের দেশে মাংসল কোন পৃথক গরুর জাত নেই। গরু মোটাতাজাকরণের জন্য উন্নত দেশে মাংসল জাত ব্যবহার হয়। উন্নত দেশে বিভিন্ন ধরনের মাংসের জন্য পৃথক জাতগুলো হলোঃ এবারডিন, এ্যানগাস, বীফমাষ্টার ও হেরিফোর্ড ডেভন ইত্যাদি

যেহেতু আমাদের দেশে মাংসের জন্য পৃথক কোন জাত নাই সুতরাং দেশে প্রাপ্ত গরু-বাছুর বা সংকর জাতের প্রাণি বিশেষভাবে মুল্যায়ন (Individual Performences) করে যাচাই-বাছাই করা উচিত এবং যে সময় গরুর বাজার দর কম থাকে সে সময়ে ক্রয় করা উচিত। গরু মোটাতাজা করার জন্য দেশী জাতের ষাঁড়, শাহীওয়াল সংকর ও ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের ষাঁড় ক্রয় করা বাঞ্ছনীয়।

গবাদি প্রাণি ক্রয় করার সময় নিম্ন বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিচার করে সতর্কতার সহিত প্রাণি নির্বাচন করতে হবে।

বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ

১.প্রাণিটির পূর্ব বংশ ভাল কিনা তা ভাল করে জেনে নিন।
২. মাথা ও গলা খাটো এবং চওড়া হতে হবে।
৩. কপাল প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক।
৪. গায়ের চামড়া ঢিলে ঢালা হওয়া উচিৎ।
৫ .কাঁধ খুব পুরু ও মসৃন।
৬. পিঠ চ্যাপ্টা, অনেকটা সমতল।
৭. কোমরের দুই পার্শ্ব প্রশস্ত ও পুরু।
৮. বুক প্রশস্ত ও বিস্তৃত হতে হবে।
৯. শরীরে হাড়ের আকার মোটা হতে হবে।
১০. সামনে পা দুটো খাটো ও শক্ত সামর্থ হতে হবে।
১১. শিং খাটো ও মোটা হওয়া বাঞ্চনীয়।
১২. এঁড়ে/বলদ গরু হওয়া বাঞ্চনীয়।
১৩. লেজ খাটো হতে হবে।
১৪. স্বাভাবিক ভাবে প্রাণিটি শারিরীক রোগ ত্রুটি মুক্ত হতে হবে (খোড়া, গায়ে ঘা, অন্ধ, শরীরে টিউমার, রক্তশূন্যতা ইত্যাদি)।
১৫. স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রাণিটিকে এশটি আয়তক্ষেত্রের মত হতে হবে।
১৬. বদমেজাজী গরু ক্রয় করা উচিত নয়। (মানুষ দেখলে গুতো দেওয়া অভ্যাস)।

গরু ক্রয়ের উৎস ঃ গরু ক্রয়ের উৎস আগে থেকে ঠিক করতে হবে। যেমন-কোন ফার্ম থেকে সংকর জাতের শুধু ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ করা যেতে পারে। স্থানীয় কোন বাজার থেকেও দেশী বা সংকর জাতের ষাঁড় গরু ক্রয় করা যেতে পারে গরু ক্রয়ের পর পরিবহণ একটি সমস্যা হতে পারে দু তিন কিলোমিটার পথ হলে গরুকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসা যেতে পারে দূরের পথ হলে অবশ্যই পরিবহণ ব্যবহার করতে হবে এবং সে খরচ পোষাতে হলে গরুর সংখ্যা বেশি হতে হবে। গরুকে বেশি হাঁটিয়ে নিলে যে পরিশ্রম হবে তা কাটিয়ে উঠতে সময় নিবে এবং খরচও বেশি হবে।

২২.৩.৩ নির্বাচিত প্রাণির স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা

১. গরুগুলো কোন রোগে আক্রান্ত কিনা তা ভালোভাবে পরীক্ষা করে সুষ্ঠু চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলতে হবে।
২. প্রাণিকে ডি-ওয়ামিং এর মাধ্যমে কৃমিমুক্ত করতে হবে। কারণ আমাদের দেশের প্রায় ১০০% প্রাণি কৃমিতে আক্রান্ত হয় এ জন্য প্রাণি ক্রয় করার পর অবশ্যই কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। এর পর ঐ প্রাণিকে ৩/৪ মাস পর পর পুনরায় কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে। বাজারে বিভিন্ন ধরনের ব্রড স্প্রেকটাম কৃমিনাশক ঔষধ পাওয়া যায়।

বিভিন্নি রোগের বিরুদ্ধে টীকা/প্রতিষেধক

গরুকে কোন টিকা দেওয়া না থাকলে ক্রয় করার ৭ দিন পর থেকে বিভিন্ন ধরনের টিকা ১৫ দিন পর পর দিতে হবে। নিম্নে বর্ণিত টিকা প্রাণিকে প্রয়োগ করতে হয় যেমন- তড়কা, ক্ষুরা, বাদলা, গলাফুলা ইত্যাদি।
প্রকল্পের গরুকে কমপক্ষে ২টি ভ্যাকসিন অবশ্যই করা উচিত। একটি হল তড়কা রোগ ও অপরটি হলো ক্ষুরা বা F.M.D রোগের টিকা। কারণ তড়কা একটি মারাত্মক রোগ। তড়কা টিকা প্রদান না করলে যে কোন সময়

প্রাণি মারা যেতে পারে। এ রোগ হলে চিকিৎসার সুযোগ দেয় না। তড়কা রোগের ভ্যাকসিন ১ মিলি চামড়ার নীচে দিতে হবে বছরে একবার মাত্র।
এছাড়া ক্ষুরা (F.M.D) রোগ ও একটি মারাত্মক রোগ যদিও এ রোগে বড় প্রাণি মারা যায় না তথাপি এ রোগে প্রাণির ওজন এত কমে যায় অর্থাৎ দুর্বল হয়ে পড়ে যে ৬ মাসে সেই পূর্বের অবস্থায় প্রাণির স্বাস্থ্য ফিরে আসে না এবং শরীরে ৬ মাস পর্যন্ত এ রোগের জীবাণু বসবাস করে। তাই তড়কা ভ্যাকসিন দেয়ার ১০-১৬ দিন পর F.M.D ভ্যাকসিন দিতে হবে। F.M.D ভ্যাকসিন বিভিন্ন স্ট্রেন মিশ্রণে হয় তাই প্রস্তত কারকের নির্দেশ মোতাবেক যেমন সরকারী মহাখালী প্রাণি সম্পদ গবেষণাগার হতে তৈরি ভ্যাকসিন ১টি স্ট্রেন দ্বারা হলে ৩ সিসি ২টি স্ট্রেন দ্বারা তৈরি হলে ৬ সিসি চামড়ার নীচে দিতে হবে। এছাড়া F.M.D Vaccine বিদেশী হলে স্ট্রেন ও প্রস্তত কারকের নির্দেশ মোতাবেক এটি সাধারণত ৫ সিসি বা ২ সিসি চামড়ার নীচে দিতে হয়। F.M.D ভ্যাকসিন প্রতি ৪ মাস পর পর দেওয়ার নিয়ম।
উল্লেখিত ২টি ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে গরু মোটাতাজাকরণের প্রাণি সংক্রামক রোগের হাত হতে মোটামুটি রক্ষা পাবে। তবে সুযোগ থাকলে বাদলা ও গলাফুলা রোগের টিকা প্রয়োগ করতে হবে।

২২.৩.৪ স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান

গরুর বাসস্থানের উদ্দেশ্য

১. বিভিন্ন প্রতিকুল অবস্থা থেকে রক্ষা করা
২. বিভিন্ন বন্য প্রাণী এবং চোর ও দুস্কৃতিকারীদের উপদ্রব থেকে রক্ষা করা
৩. আরামদায়ক পরিবেশে বাসের সুযোগ প্রদান
৪. স্বাস্থ্য সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ
৫. সহজে পরিচর্যা করার সুবিধা
৬. সহজে খাদ্য প্রদানের সুবিধা

খামারে প্রয়োজনীয় ঘর

১. গরুর ঘর
২. রোগাক্রান্ত গরুর আলাদা ঘর
৩. কর্মচারী/পরিচর্যাকারীর ঘর।

ঘরের প্রকার

১. উম্মুক্ত ঘর এবং
২. প্রচলিত ঘর

উম্মুক্ত ঘরের বিবরণ

* এই ঘর চারিদিকে শক্ত কাঠ অথবা লোহার পাইপ দ্বারা ঘেরা থাকে
* ঘেরার মধ্যে গরু ছাড়া অবস্থায় থাকে
* ঘেরার বাইরে পাত্রে খাবার দেওয়া হয়
* ঘেরার ভিতর দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে তারা খাদ্য খেতে পারে এবং পাত্রে দেওয়া পানি পান করতে পারে।
* ঘেরার মধ্যে তাদের স্বতন্ত্র বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকে
* ঘেরার মধ্যে প্রাণি স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে
* সকালে-বিকালে ঘেরার ভিতরের গোবর পরিষ্কার করে হোস পাইপের সাহায্যে ধুয়ে দেওয়া হয়।
* কখনও একই ঘরের মধ্যে বিপরীত লিংঙ্গের গবাদি প্রাণি একত্রে রাখা হয় না
* এই প্রকারের ঘরের শুধু ছাউনি থাকে এবং চারিদিকে খোলামেলা থাকে। ঝড়-বৃষ্টি ও শীতের সময় চারিদিকে চটের পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে
* উন্মুক্ত ঘরে গরু প্রতি ৮-৯ বর্গমিটার স্থান বা ৮৫-৯৫ বর্গফুট স্থান প্রয়োজন

* ষাঁড় গরু এই জাতীয় ঘরে রাখা কিছুটা সমস্যা হয়।

চিত্র ২২.১ ঃ গরুর বাসস্থান

প্রচলিত ঘরের বিবরণ

* এই প্রকার ঘরে গরু বাঁধা অবস্থায় পালন করা হয়
* ঘরের মধ্যে গরু ১ বা ২ সারিতে অবস্থান করে
* প্রতি গরুর জন্য স্বতন্ত্র থাকার ব্যবস্থা কাঠ অথবা লোহার রড দ্বারা পৃথক করা থাকে
* সম্মুখে লম্বা ম্যানজার বা খাদ্যপাত্রে খাদ্য প্রদান করা হয়
* খাদ্য পাত্রের পাশে বালতিতে অথবা স্বতন্ত্র স্বয়ংক্রিয় অবস্থায় পানি প্রদানের ব্যবস্থা থাকে
* ম্যানজার সিমেন্ট, সুরকী, বালি দ্বারা ঢালাই করে প্রস্তুত করা হয়
* গরু প্রবেশ পথের (এবং পরিচর্যাকারীর চলাচল পথের) উভয় দিকে ড্রেন থাকে
* প্রতিদিন সকালে বিকালে ড্রেনের গোবর ও চনা পরিষ্কার করতে হয়
* দুই সারিতে অবস্থানকারী গরুর ঘর আবার ২ প্রকৃতির অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী সারি বিশিষ্ট।

অন্তর্মুখী সারি বিশিষ্ট ঘর

* এই ঘরে গরু মুখোমুখি অবস্থায় অবস্থান করে
* উভয় সারির সম্মুখ খাদ্য দেওয়ার জন্য ম্যানজার থাকে
* উভয় সারির ম্যানজারের মধ্য বরাবর পরিচর্যা ও খাদ্য প্রদানের জন্য পরিচর্যাকারী চলাচলের রাস্তা থাকে
* পরিচর্যাকারীর একই সাথে উভয় সারিতে খাদ্য পরিবেশন করতে পারে
* গরুর পিছন দিক বহির্মুখী থাকে
* গরুর পিছন বরাবর ড্রেন থাকে।
* প্রতিদিন ড্রেনের মধ্য থেকে গোবর ও চনা পরিষ্কার করতে হয়।

বহির্মুখী সারি বিশিষ্ট ঘর

* এই ঘরে গরু বিপরীত মুখী অবস্থায় অবস্থান করে।
* এই পদ্ধতিকে Tail to tail পদ্ধতি বলে
* উভয় সারির মাঝখানে চলাচল পথ থাকে এবং রাস্তার ও দুই পার্শ্বে ড্রেন থাকে।
* দুই সারি গরুর সামনে খাবার পাত্র ও চলার পথ থাকে
* এই পদ্ধতিতে গরু মুক্ত বাতাস পায়।
* গরুর পিছন দিক অন্তর্মুখী থাকে।
* এই রাস্তায় যাতায়াত করে গোবর সহজে পরিষ্কার করা যায়।

গরু মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়ায় গবাদি প্রাণিকে আবদ্ধ অবস্থায় পালন করতে হয়। তাই এদের বাসস্থান উত্তম ও সঠিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেখানে পালন করা হয় সেই সমস্ত জায়গায় ও আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পানি ও বৃষ্টির পানি যাতে গড়িয়ে চলে যায় সেই জন্য বাসস্থান সামান্য ঢালু প্রকৃতির হলে ভাল হয়। প্রতি গরুর জন্য ২০ বর্গফুট (৫´×৪´) জায়গা প্রয়োজন।
৪টি গরুর জন্য সর্বমোট ৮০ বর্গফুট (৫´×৪´×৪´) জায়গার প্রয়োজন হয়। গোয়াল ঘরে গরু গুলোকে এক সারি বা ২ সারিতে রাখা যেতে পারে। গরু দাঁড়ানোর সম্মুখে খাবার চাড়ি/মেঞ্জার রাখতে হবে এরং খাবার দেওয়ার পথ থাকতে হবে এবং মেঝে পিছনের দিকে ঢালু রাখতে হবে যাতে প্রস্রাব-পায়খানা গড়ে পিছনের দিকে ড্রেনের মাধ্যমে সহজেই চলে যেতে পারে। এতে ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। ঘরের উপরের চালা অল্প খরচে করাই ভাল যেমন ছাউনিতে খড়/ছন (ঘর ঠান্ডা থাকবে) অথবা ঢেউটিন দেওয়া যেতে পারে। টিন দিলে টিনের নীচে চাটাই দিতে হবে এতে ঘর ঠান্ডা থাকবে এবং শীতকালে কুয়াশার হাত থেকে রক্ষা করবে। ঘরের উচ্চতা ৭-১০ ফিট হতে হবে। উক্ত উচ্চতা বিশিষ্ট ঘরের দেওয়াল ৩ অংশ খোলা থাকবে । যাতে ঘরে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো-বাতাস পায়। ফলে রোগ জীবাণুর প্রকোপ কম হবে। ঘর উত্তর-দক্ষিণ মুখী হলে ভাল হয়। ঘরের দেওয়ালের বেড়া ইটের হতে হবে। বাকী ফাঁকা অংশ খুপড়ী বেড়ার মত করা যেতে পারে। তবে অত্যাধিক শীতের/বৃষ্টির সময় ফাঁকা অংশ চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে প্রাণি শীতে/পানিতে ভিজে কষ্ট না পায়। ঘরের মেঝে পাকা বা ইট বিছানো হতে হবে।

২৩.৩.৫ খাদ্য ব্যবস্থাপনা

বীফ ফ্যাটেনিং প্রকল্পে গবাদি প্রাণির জন্য পরিমাণমত সুষম খাদ্য সরবরাহ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। খাবারের তালিকায় শর্করা, আমিষ, চর্বি ও ভিটামিন এর পরিমাণ সাধারণতঃ খাদ্যের চেয়ে বেশি থাকতে হবে। প্রচুর পরিমাণ টিউবলের টাটকা পানি সরবরাহ করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে গবাদি প্রাণির সবচেয়ে সহজলভ্য ও সাধারণ খাদ্য হল খড় যার ভিতর আমিষ, শর্করা ও খনিজের ব্যাপক অভাব রয়েছে। বর্তমানে আধুনিক যুগে খড়কে ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করলে তার খাদ্যমান বহুগুনে বেড়ে যায়। তাই অতি অল্প খরচে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে ইউরিয়া ও চিটাগুড় মিশ্রিত খড় (ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র) খাইয়ে গরুকে মোটাতাজা করা যায়। গরু মোটাতাজা করণের জন্য খাদ্যে ইউরিয়ার ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার ও আধুনিক পন্থা। গরুকে মোটাতাজা করণের জন্য ইউরিয়া দ্বারা তৈরি যেমন ইউ.এম.এস বা ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র, ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড়, মোলাসেস ব্লক, সরাসরি ইউরিয়া যে কোন একটি খাওয়ালেই চলবে।

গরু মোটাতাজাকরণে কেন ইউরিয়া খাওয়াবেন?

ইউরিয়া এক ধরনের রাসায়নিক সার। আমাদের দেশের প্রাণি খাদ্যে আমিষের পরিমাণ খুব কম, কিন্তু দ্রুত বৃদ্ধিতে আমিষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রাণিকে যে খড় আমরা খাওয়াই তাতে খুব সামান্য পরিমাণ আমিষ জাতীয় খাদ্য আছে। পক্ষান্তরে ইউরিয়া সারে ২৪৫% ক্রুড আমিষ আছে। স্বল্পমূল্যে খড়ে উচ্চ ক্ষমতাপূর্ণ আমিষের সঙ্গে মিশিয়ে খড়ে আমিষের পরিমাণ অনেকাংশে বাড়ানো যায়। এ ধরনের ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় প্রাণি খেলে হঠাৎ করে শরীর বৃদ্ধি হয় এবং প্রাণির শরীর বাড়তে থাকে। এই জন্য প্রাণির স্বাস্থ্য গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প বৃদ্ধির জন্য ইউরিয়া ব্যবহার অত্যাবশ্যক, কারণ ইউরিয়া দ্রুত মাংস বাড়ায়।

প্রাণি মোটাতাজাকরণের জন্য সরাসরি ইউরিয়া খাওয়ার পদ্ধতি

ইউ.এম.এম. ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় ও মোলাসেস ব্লক ইত্যাদি যে কোন একটি খাওয়ানো গরু মোটাতাজাকরণের জন্য অত্যাবশ্যক। তবে সরাসরি ইউরিয়া খাওয়ালেও প্রাণিকে মোটাতাজাকরণে সুফল পাওয়া যায়। এই জন্য প্রাণিকে প্রথম ১৫ দিন ১ চা চামচ বা ৫ গ্রাম ইউরিয়া ২০০ মিলি গ্রাম চিটাগুড়ের সংগে মিশিয়ে তা ১.৫-২ লিটার পানির সংগে মিশিয়ে টুকরা টুকরা করে কাটা খড়ের সংগে মিশিয়ে খাওয়ানো যায়। ১৫ দিন পর শুধু ইউরিয়ার পরিমাণ ৫ গ্রাম বৃদ্ধি করে মোট ১০ গ্রাম বা ২ চা চামচ একই পরিমাণ

চিটাগুড়ের সংগে পরিমাণ মত কাটা খড়ের/ঘাসের সংগে মিশিয়ে এবং পরবর্তী ১৫ দিন পরও আরও ৫ গ্রাম বৃদ্ধি করে অর্থাৎ ১৫ গ্রাম বা ৩ চা চামচ একই নিয়মে খাওয়ানো যায়। পরবর্তী ১৫ দিন পরও আর ৫ গ্রাম মোট ২০ গ্রাম বা ৪ চা চামচ ইউরিয়া খাওয়াতে হবে। প্রতিদিন ২০ গ্রাম বা ৪ চা চামচের বেশি ইউরিয়া খাওয়ানো যাবে না। এইভাবে সরাসরি ইউরিয়া খাওয়ানোর ৩-৪ মাসের মধ্যে প্রাণির শরীরের মাংস বেড়ে যাবে।

সাবধানতা

১। কোনক্রমেই ২০ গ্রাম/৪ চা চামচ এর বেশি ইউরিয়া প্রাণিকে দেওয়া যাবে না।
২। ছয় মাসের নিচের প্রাণিকে খাওয়ানো যাবে না।
৩। অবশ্য চিটাগুড় ২০০-২৫০ মিলি গ্রাম ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
৪। শুকনা খড়ের সংগে খাওয়াতে হবে।
৫। প্রথম বার বা হঠাৎ করে ২০ গ্রাম ইউরিয়া খাওয়ানো যাবে না। কারণ, এতে প্রাণির বদহজম হতে পারে এমনকি বিষ ক্রিয়ায় প্রাণি মারা যেতে পারে। তাই ৫ গ্রাম থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ২০ গ্রাম খাওয়ানো যায়।

প্রাণি খাদ্য প্রস্তুতের শর্তাবলী

১। খাদ্য সুষম হতে হবে
২। সহজপাচ্য হতে হবে
৩। গরুর জন্য পছন্দনীয় হতে হবে
৪। দাম তুলনামূলক কম হতে হবে
৫। ভেজাল বা ধুলাবালিমুক্ত হতে হবে ।

প্রাণি খাদ্য মজুদ প্রণালী

কিছু খাদ্য আছে যা সারা বছর পাওয়া যায় না, যা মৌসুমে মজুদ করলে কম দামে পাওয়া যায়। যেমন ঘাস, খড়, খৈল, ডালের ভূষি ইত্যাদি।
খাদ্য যত কম দামে ক্রয় করা যাবে গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে লাভ তত বেশি হবে।
কিকি খাদ্য মজুদ করতে হবে ঃ মৌসুম ভিত্তিক, খড়, কাঁচা ঘাস, শস্যদানা যেমন গম , ভুট্টা বা যে কোন ডাল , খৈল

খাদ্য মজুদ করার ক্ষেত্রে কিছু সাবধানতা

- মজুদের ঘর অবশ্যই মাঁচাযুক্ত হতে হবে।
- গমের ভূষি অবশ্যই শুকনা হতে হবে
- কুড়া ২ মাসের বেশি মজুদ করলে ছত্রাক পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে ২ মাস পর পর মজুদ করা যেতে পারে।
- ডাল/কলাইর ভূষি ৪ মাস পর্যন্ত মুজদ করা যায়
- খৈল মজুদের ক্ষেত্রে খৈলকে ভাংগিয়ে না রেখে আস্ত রাখতে হবে এতে খৈল বৎসরকাল সংরক্ষণ করা যায়।
- ঝিনুকের গুঁড়া বৎসরকাল সংরক্ষণ করা যায়
- ইউরিয়া যখন প্রয়োজন বস্তা ধরে কিনলেই চলবে।
- মোলাসেস এর ক্ষেত্রে চিনিকল থেকে সারা বছরের প্রয়োজনীয় পরিমাণ মজুদ করা যেতে পারে অথবা সময়ে সময়ে ক্রয় করা যেতে পারে।

- সকল ক্ষেত্রেই খাদ্য অবশ্যই বৃষ্টির পানিতে যেন না ভিজে সে দিকে নজর দিতে হবে। গুঁড়া জাতীয় খাদ্যের ক্ষেত্রে শুকনা নিমের পাতা বস্তার ভেতর মাঝে মাঝে কিছু দিয়ে রাখলে পোকা ধরবে না।

সুষম দানাদার খাদ্য

কুড়া, গমের ভূষি, চাউলের খুদী, খৈল, কলাই, মটর, খেশারী, শুকনা রক্ত কুড়া ইত্যাদি গরুর দানাদার খাদ্য। প্রাণি মোটাতাজাকরণের জন্য খাদ্যে দানাদার জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বেশি। বাংলাদেশে যে সমস্ত খাদ্য সচারচর পাওয়া যায় তা দ্বারা স্বল্প খরচে সুষম দানাদার খাদ্য তৈরির মডেল দেওয়া হলো। সুষম খাদ্যের মডেল অনুসরণ করে মোটাতাজাকরণের গরুকে নিয়মিত খাওয়ালে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে।

গরু মোটাতাজাকরণের জন্য সুষম খাদ্যের তালিকা

সারণী ২২.১ ঃ ১ কেজি খাদ্যে কত পরিমাণ কি কি খাদ্য উপাদান থাকে তা নিম্নে দেওয়া হইল

খাদ্য উপাদান	**পরিমাণ**
গমের ভূষি	১৭০ গ্রাম
চাউলের কুড়া (তুষ ছাড়া)	১৫০ গ্রাম
তিলের/সরিষার খৈল	২৫০ গ্রাম
চাউলের খুদ (জাউ রান্না)	১০০ গ্রাম
কলাই বা ছোলা ভাংগা (খেশারী/মাটি/কাউপি)	২০০ গ্রাম
ডিসিপি	২০ গ্রাম
লবণ	২৫ গ্রাম
ভিটামিন প্রিমিক্স	৫ গ্রাম
মোট	১০০০ গ্রাম বা ১ কেজি

খাদ্য সরবরাহের নিয়ম

বীফ ফ্যাটেনিং বা গরু মোটাতাজাকরণের জন্য গবাদি প্রাণিকে প্রতিদিন নিম্নবর্ণিত হারে খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন।

সারণী ২২.২ঃ বিভিন্ন ওজনের প্রাণির জন্য খাদ্য সরবরাহ

প্রাণির বিবরণ	খাদ্যের নাম		
	ইউএমএস বা ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় বা শুধু খড়	দানাদার খাদ্য সুষম	সবুজ ঘাস
১০০ কেজির কম ওজনের জন্য	২ কেজি	২.৫-৩ কেজি	৪-৫ কেজি
১০০-১৫০ কেজি ওজনের প্রাণির জন্য	৩ কেজি	৩.০-৩.৫ কেজি	৭-৮ কেজি
১৫০-২০০ কেজি এবং ততউর্দ্ধ ওজনের প্রাণির জন্য	৪ কেজি	৪.০-৪.৫ কেজি	৮-১২ কেজি
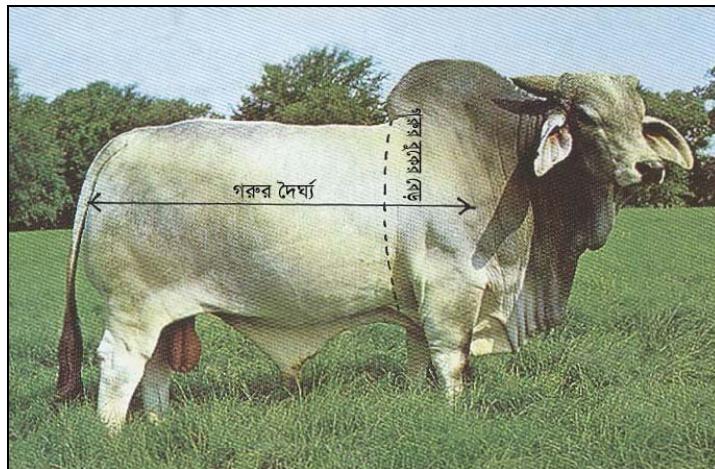
চিত্র ২২.২ ঃ গরুকে কাঁচা ঘাস খাওয়ানো হচ্ছে

বীফ ফ্যাটেনিং বা গরু মোটাতাজাকরণের জন্য গবাদী প্রাণিকে খাদ্য খাওয়ানোর নির্দেশাবলী

- পরিষ্কার ও সুষম খাদ্য খাওয়াতে হবে।
- আশঁযুক্ত খাবার ২-৩ ইঞ্চি টুকরা করে খাওয়াতে হবে।
- দানাদার খাবার চূর্ণবিচূর্ণ করে খাওয়াতে হবে।
- দানাদার খাবারে ৪-৬ ভাগ চর্বি থাকতে হবে।
- দৈহিক ওজন অনুসারে প্রয়োজনীয় খাবার একবারে না দিয়ে ২৪ ঘন্টায় ৫-৬ বারে দিলে প্রাণির হজম ক্রিয়া ভাল হয়।
- খাদ্যে দানাদার, খড়, কাঁচাঘাস ও পানির অনুপাত ১ঃ৩ঃ৫ঃ১০/১৫ হতে হবে।
- খড় খাওয়ানোর পূর্বে ২-৩ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখলে খাদ্যের মান বাড়ে।
- প্রাণিদেহে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ পানি তাই ১০-১৫ ভাগ পানি সরবরাহ করতে হবে।
- প্রাণিদেহ যেহেতু ১৬ ভাগ আমিষ দ্বারা গঠিত সুতরাং খাদ্যে শতকরা ১৬ ভাগের বেশি আমিষ থাকতে হবে।
- শুধুমাত্র খড় না দিয়ে এর সাথে দানাদার খাবার, ইউরিয়া, মোলাসেস, পানি কাঁচাঘাস মিশিয়ে খাওয়ালে খাদ্যের মান বৃদ্ধি হয়।
- গরু মোটাতাজাকরণের জন্য সরিষার খৈল বেশি উপকারী।
- প্রাণির বদ-হজম, পেট-ফাপা ও পাতলা পায়খানা হলে দানাদার খাদ্য খাবার দেওয়া যাবে না।

২২.৩.৬ প্রাণির দৈহিক ওজন রেকর্ড করণ

এই প্রকল্পে প্রাণির ওজন নিয়মিত রেকর্ড করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকল্প চালুর শুরুতে ক্রয়কৃত সবগুলো প্রাণির ওজন পৃথক পৃথক ভাবে রেকর্ড করতে হবে এবং ১৫ দিন পর পর প্রতিটি প্রাণির ওজন খাবার সরবরাহের সংগে বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা যায়। তাতে পালনের অগ্রগতি বুঝা যায়। প্রকৃত প্রাণির ওজন নির্ণয় করার জন্য ব্যাল্যান্স ব্যবহার করাই উত্তম । তবে সহজ ১টি ফরমুলাতে প্রাণির ওজন বের করা যায়। তবে প্রাণির সঠিক ওজনের কাছাকাছি ফলাফল পাওয়া যায়। ক্লথ টেপের সাহায্যে প্রাণির দৈর্ঘ্য ও বুকের মাপ নেওয়া হয়।

চিত্র ২২.৪ ঃ গরুর ওজন নির্ণয়ের জন্য দৈর্ঘ্য ও বুকের বেড় মাপার পদ্ধতি

প্রাণির দৈর্ঘ্য= প্রাণির লেজের উপরের পিন পয়েন্ট থেকে অথবা পাছার উঁচু হাড় হতে সোল্ডর পয়েন্ট বা গলার মাঝ বরাবর পর্যন্ত।

বুকের বেড়= সামনের ২ পায়ের ঠিক পিছনের দিক বরাবর

এছাড়াও গবাদিপ্রাণির বুকের বেড় থেকে তাদের দৈহিক ওজন নির্ণয় করা যায়।

নিচে তালিকা দেয়া হল

সারণী ২২.৩ ঃ গবাদিপ্রাণির বুকের বেড় থেকে তাদের দৈহিক ওজন নির্ণয়

বুকের বেড় (ইঞ্চি)	দৈহিক ওজন (কেজি)	বুকের বেড় (ইঞ্চি)	দৈহিক ওজন (কেজি)	বুকের বেড় (ইঞ্চি)	দৈহিক ওজন (কেজি)
২৫	১৯	৩৯	৬৪	৫৩	১৬২
২৬	২০	৪০	৬৯	৫৪	১৭১
২৭	২১	৪১	৭৩	৫৫	১৮১
২৮	২৩	৪২	৭৮	৫৬	১৯১
২৯	২৫	৪৩	৮৩	৫৭	২০০
৩০	২৭	৪৪	৮৭	৫৮	২১০
৩১	৩০	৪৫	৯২	৫৯	২১৯
৩২	৩২	৪৬	৯৬	৬০	২২৯
৩৩	৩৫	৪৭	১০১	৬১	২৩৪
৩৪	৩৯	৪৮	১১৩	৬২	২৪৭
৩৫	৪৩	৪৯	১২৩	৬৩	২৫৬
৩৬	৪৯	৫০	১৩৩	৬৪	২৬৫
৩৭	৫৪	৫১	১৪৩	৬৫	২৭৫
৩৮	৫৯	৫২	১৫২	৬৬	২৮৬

প্রাণির ওজন রেকর্ড এর মাধ্যমে ঐ প্রাণির দৈনিক মাংস বৃদ্ধিও পরিমাণ জানা যায়। এটি নির্ণয় করার জন্য নিম্নের ফরমূলা ব্যবহার করা হয়।

$$\text{প্রাণির দৈনিক মাংস বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াল} = \frac{\text{প্রকল্পের গরুর বিক্রয় করার সময় ওজন - প্রকল্প শুরুর সময় প্রাণির ওজন}}{\text{সময়ের ব্যবধান (দিন)}}$$

২২.৩.৭ প্রাণির অন্যান্য যত্ন ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা

প্রাণির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের উন্নতির আর একটি বাস্তব পদক্ষেপ। গরু মোটাতাজাকরণের জন্য কিকি করণীয় তা নিম্নে আলোচিত হলো।

১। প্রতিদিন প্রাণিকে শরীর মেজে গোসল করাতে হবে এবং সংগে ব্রাস করলে ভাল হয়। এতে শরীরের পশম উজ্জ্বল ও চকচক করবে।

২। খাদ্য পরিবেশনার উপরও গরুর খাদ্য গ্রহণের তারতম্য হয়। যেমন ঃ

- নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন খাদ্য সরবরাহ করা।
- গরুর সম্মুখে সর্বদা খাদ্য রাখা।
- খাদ্য সরবরাহের আগে অবশ্যই পাত্র পরিষ্কার করা।
- দানাদার খাদ্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মেপে ২ বারে (সকালে ও বিকালে) পরিবেশন করা।
- দানাদার খাদ্য আধা ভাঙ্গা অবস্থায় ভিজিয়ে খেতে অভ্যস্ত হলে সেভাবে দেয়া।
- শুকনা দানাদার খাদ্য দিলে খাদ্য গ্রহণের পরপরই পানি দেয়া।
- খড় কেটে ভিজিয়ে পরিবেশন করলে কম নষ্ট হয় এবং খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতাও বাড়ে ।
- খাদ্যে অবশ্যই মাটি/বালি থাকা খাদ্য পচা, বাসি, অতি পুরাতন না হওয়া।

৩। গরু যদি নিজ ইচ্ছায় নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবার না খায় তবে বাঁশের চোঙা বা পাষ্টিকের বোতলে করে জোর করে পেট ভর্তি করে খাওয়াতে হবে। কারণ প্রাণি যত খাবে তত তাড়াতাড়ি শরীরের মাংস বাড়বে।

৪। প্রয়োজনের অতিরিক্ত নড়াচড়া করতে দেওয়া যাবে না।

৫। কোন প্রকার কাজে খাটানো যাবে না।

৬। উত্তেজিত বা বিরক্তত করা যাবে না।

৭। মশা-মাছি, আটালী থেকে প্রাণিকে রক্ষা করতে হবে।

৮। প্রাণির কাছে সব সময় টিউবয়েলের টাটকা পানি থাকবে।

৯। বাসস্থান সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

১০। সপ্তাহে একদিন বাসস্থান, খাবার পাত্র জীবাণুনাশক ঔষধ যেমন আয়োসান (Iosan), সোডা, ডেটল/ স্যাভলন দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।

১১। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আলো বাতাস ঘরে রাখতে হবে।

১২। খাদ্য সংরক্ষণের জায়গা পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে ইঁদুর বা কুকুর নষ্ট না করে।

১৩। দৈহিক ওজনের উপর ভিত্তি করে দানাদার খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪। নিয়মিত কৃমিনাশক ঔষধ দিতে হবে।

১৫। প্রতিদিন পরিমাণমত কাঁচা ঘাস ও খড় দিতে হবে।

১৬। খাদ্যে ইউরিয়া দিতে হবে।

১৭। প্রতিনিয়ত বি- ভিটামিন দিতে হবে।

১৮। সময়মত সংক্রামক রোগ সমূহের টিকা দিতে হবে।

১৯। বাহিরের লোকজনকে গরুর কাছে যেতে দেওয়া যাবে না।

২০। সপ্তাহে একবার গরুর ওজন নিতে হবে।

২১। প্রাণি অসুস্থ হলে সঙ্গে সঙ্গে নিটস্থ প্রাণি হাসপাতালে নিতে হবে।

২২.৩.৮ এড়ে্ঁ গরুকে খোঁজাকরণ

এড়েঁ গরুকে খোঁজাকরণের উদ্দেশ্য হলো প্রাণি যাতে শান্ত হয় এবং দ্রুত শরীরে মাংস বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া খোঁজাকৃত প্রাণিকে সহজেই নিয়ন্ত্রন করা যায়। এ জাতীয় গরুকে শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ সবাই পরিচর্যা করতে পারে। তবে বাজারে এড়েঁ গরুর চাহিদা বলদ গরুর চেয়ে বেশী। আর যে সব প্রাণি অস্থির, খাবারের প্রতি রুচি তেমন থাকে না এবং ধাতু রোগে ভোগে ঐ সব গরুকে খোঁজা করা উচিত। এঁড়ে গরুকে খোঁজা করতে হবে তবে মুচি দ্বারা কখনো খোঁজা করানো যাবে না। নিকটস্থ সরকারী প্রাণি হাসপাতালে যোগাযোগ করে বার্ডিজো ক্যাস্টেট্রেটর মেশিনের দ্বারা এঁড়ে গরুকে খোঁজা করতে হবে। খুব সহজ উপায়ে বার্ডিজো ক্যাসট্রেটর দ্বারা এঁড়ে গরুকে খোঁজা করা যায়। বার্ডিজো দ্বারা গরুর শুক্রনালীতে চাপ দিলে শুক্রনালী ছিড়ে যায় ও রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ফলে শুক্র তৈরী হতে পারে না। দুই শুক্রনালীতে দুইবার চাপ দিতে হয়। বার্ডিজো ব্যবহারের পর ক্ষতস্থানে আয়োডিন বা বেনজিন দিতে হবে। বয়স্ক গরু বা মহিষ খোঁজা করতে হলে অপারেশন করতে হয়। এতে উক্ত গরুর উত্তেজিত ভাব কমে আসবে এবং খাওয়ার প্রতি মনোযোগী হবে।

২২.৩.৯ ক মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের জন্য মেয়াদ

গরু মোটাতাজাকরণের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ কাল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ গরু দ্রুত মোটাতাজা হওয়ার নির্দিষ্ট সময় থাকে এবং এটি বিভিন্ন ফ্যাক্টরসমূহ যেমন- গরুর জাত, বয়স, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, আবহাওয়া, মালিকের ব্যবস্থাপনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। উল্লেখিত ফ্যাক্টরসমূহ বিবেচনা করে গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের মেয়াদকাল কম পক্ষে ৪ মাস হওয়া বাঞ্জনীয়। তবে সময়কাল নির্ভর করবে গরুর শারীরিক বৃদ্ধির হার ও বর্তমান বাজার দর। এ জন্য প্রতি সপ্তাহে গরুর ওজন নিতে হবে এবং শারীরিক বৃদ্ধির হার হিসাব করতে হবে যে প্রতিদিন কত গ্রাম বা কেজি মাংস শরীরে বৃদ্ধি হচ্ছে। যদি গরুর খাদ্য খাওয়া খরচের তুলনায় দ্রুত বাড়তে থাকে সে সময় গরু বিক্রয় না করা ভাল। তবে গরুর বাজার মূল্য যখন বেশী পাওয়া যাবে তখনই বিক্রয় বিবেচনা করা যায়। গরু মোটাতাজাকরণের মেয়াদকাল সাধারণতঃ ৪ মাস, ৬ মাস, ৮ মাস ও ১ বছর ব্যাপী করা যায়। আমাদের দেশের গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের মেয়াদকাল ৪ মাস ও ৬ মাস হয়ে থাকে। অধিকন্ত গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের মেয়াদকাল সম্পূর্ণরুপে নির্ভর করবে প্রকল্প গ্রহনকারীর উপর।

২২.৩.৯ খ গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে বিনিয়োগ ও মুনাফার তথ্য রেকর্ডকরণ

গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে বিনিয়োগ ও মুনাফার তথ্য রেকর্ডকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ প্রকল্পে কত টাকা কি কি বিষয়ে খরচ হচ্ছে, কোন জাতের ও কোন বয়সের গরুও মাংসবৃদ্ধির হার কেমন, প্রতিটি গরু থেকে কত আয় হচ্ছে এবং বিক্রয় মূল্য অবশ্যই লিখিত ভাবে না থাকলে প্রকল্পটি লাভজনক কিনা তা বলা যাবে না। কারণ, ব্যানিজিকভাবে গরু মোটাতাজাকরণ খামার হতে হলে অবশ্যই গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে বিনিয়োগ ও মুনাফা তথ্য রেকর্ডকরণ করতে হবে। নিম্নে গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে বিনিয়োগ ও মুনাফার তথ্য সংক্রান্ত প্র -ফোরমা দেওয়া হলো সেই অনুযায়ী প্রকল্পের অর্থনৈতিক সমীক্ষা রেকর্ড করা যাবে। যে ফরমেট দেওয়া হলো তা প্রকল্প গ্রহণকারী এর সঙ্গে সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবে।

সারণী ২২.৪ ঃ গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে বিনিয়োগ ও আয় ব্যয়ের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্যএকটি প্রো-ফরমা

ক্রঃ নং	গরু ক্রয়ের তাং	গরুর জাত	গরুর বয়স	ক্রয়ের সময় গরুর ওজন (কেজি)	ক্রয় মূল্য	খাদ্য গ্রহন			খাদ্য বাবদ মোট খরচ	চিকিৎসা বাবদ খরচ	সর্বমোট খরচ	বিক্রয় কালিন গরুর ওজন	গরু বিক্রয়ের তাং	কত দিন মোটাতাজা করা হয়েছে	আয়		নীট মুনাফা
						দানা দার	খড়	কাঁচা ঘাস							গরু	গবর	

২২.৩.৯গ গরু বাজারজাতকরণ

অধিক লাভে গরু বিক্রয় গরু মোটাতাজাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে নচেৎ প্রাণির প্রকৃত মূল্য পাওয়া যাবে না। ফলে প্রকল্প ফলপ্রসূ হবে না। তাই যে অঞ্চলে হাট বাজারে বেশী দাম পাওয়া যায় সেই সব হাটে এ গরু গুলোকে বিক্রয় করতে হবে। এছাড়া আমাদের দেশের ঈদুল আজহার মৌসুমে বিক্রয় করলে এসব গরুর দাম বেশী পাওয়া যায়। এছাড়া মাংসের জন্য এসব গরুর চাহিদা আমাদের দেশে সব অঞ্চলে আছে তবে ঢাকা ও চট্টগ্রামে এড়েঁ বা হেভী বলদ গরুর চাহিদা ব্যাপক। তাই ঢাকা বা চট্টগ্রামে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে অথবা ঐ অঞ্চলের গরুর ব্যবসায়ী বা কসাইদের সাথে যোগাযোগ করে+ প্রকল্পে তাদেরকে ডেকে এনে বিক্রয় করলে অধিক মুনাফা পাওয়া যাবে।

চিত্র ২২.৪ ঃ বাজারজাতকরণের উপযুক্ত ষাঁড়

গরু মোটাতাজাকরণ (৫ টি গরু) প্রকল্পের আয় ব্যয়ের হিসাব

১।	স্থায়ী বিনিয়োগ		
	জমির উন্নয়ন		২৫,০০০/-
	গরুর ঘর ২০ বর্গমিটার @ ২০০০/-		৪০,০০০/-
	যন্ত্রপাতি		৫,০০০/-
	অন্যান্য খরচ		৫,০০০/-
	মোট		৭৫,০০০/-
২।	উৎপাদন খরচ (প্রতি ব্যাচে)		
	গরু ৫টি @ ১২০০০/-		৬০,০০০/-
	খাদ্য খরচ- প্রতি গরু ৫০/- টাকা হারে ১২০ দিনের জন্য		৩০,০০০/-
	ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা		৫,০০০/-
	অন্যান্য ব্যয় - অপচয় (যন্ত্রপাতি ও ঘরের ১০%)		৪,৫০০/-
	প্রতি ব্যাচে উৎপাদন ব্যয়		৯৯,৫০০/-
৩।	বার্ষিক উৎপাদন ব্যয়		২,৯৮,৫০০/-
৪।	সম্ভাব্য আয়		
	গরু ১৫ টি @ ২৫,০০০/-		৩,৭৫,০০০/-
	গোবর		৪,০০০/-
	মোট আয়		৩,৭৯,০০০/-
৫।	বিনিয়োগ ব্যয় - ১%		৩,৭৫০/-
৬।	নীট আয়		৩,৭৫,২৫০/-
৭।	**নীট মুনাফা** (৩,৭৫,২৫০/- - ২,৯৮,৫০০/-)		**৭৬,৭৫০/-**

গরু মোটাতাজাকরণ (২০ টি গরু) প্রকল্পের আয় ব্যয়ের হিসাব

১।	স্থায়ী বিনিয়োগ		
	জমির উন্নয়ন		৫০,০০০/-
	গরুর ঘর-৮০ বর্গমিটার @ ২০০০/-		১,৬০,০০০/-
	যন্ত্রপাতি		১০,০০০/-
	অন্যান্য খরচ		১০,০০০/-
	মোট		২,৩০,০০০/-
২।	উৎপাদন খরচ (প্রতি ব্যাচে)		
	গরু ২০টি @ ১২০০০/-		২,৪০,০০০/-
	খাদ্য খরচ- প্রতি গরু ৫০/- টাকা হারে ১২০ দিনের জন্য		১,২০,০০০/-
	ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা		২০,০০০/-
	মজুরী (শ্রমিক ১ জন, মাসিক বেতন ৩,০০০/- টাকা হিসাবে)		৩৬,০০০/-
	অন্যান্য ব্যয় - অপচয় (যন্ত্রপাতি ও ঘরের ১০%)		১৭,০০০/-
	মূলধনের সুদ ১০%		২৩,০০০/-
	প্রতি ব্যাচে উৎপাদন ব্যয়		৪,৫৬,০০০/-
৩।	বার্ষিক উৎপাদন ব্যয়		১৩,৬৮,০০০/-
৪।	সম্ভাব্য আয়		
	গরু ৬০ টি @ ২৫,০০০/-		১৫,০০,০০০/-
	গোবর		১৫,০০০/-
	মোট আয়		১৫,১৫,০০০/-
৫।	বিনিয়োগ ব্যয় - ১%		১৫,০০০/-
৬।	নীট আয়		১৫,০০,০০০/-
৭।	**নীট মুনাফা** (১৫,০০,০০০/- - ১৩,৬৮,০০০/-)		**১,৩২,০০০/-**

উৎসঃগৃহপালিত প্রাণি-পাখির চিকিৎসা ও গরু মোটাতাজাকরণের আধুনিক পদ্ধতি - ডঃ মোঃ জালাল উদ্দিন সরদার

মডিউল-২৩ ঃ মহিষ পালন

২৩.১ মহিষ পালনের গুরুত্ব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গরু-ছাগলের ন্যায় মহিষেরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এশিয়ার প্রায় দেশেই মহিষ মূলত ভারবাহী প্রাণি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। গ্রামীণ পরিবেশে এখনো মহিষ দ্বারা ভূমি কর্ষণ করা হয়। তাছাড়া পণ্য পরিবহন, আখ ও ধান মাড়াই প্রভৃতি কাজে মহিষ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে মহিষের সুনির্দিষ্টি কোন জাত নেই, তবে এদেরকে মূলত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা- নদীর মহিষ (রিভারটাইপ) ও জলাভূমির মহিষ (সোয়াম্প টাইপ)। স্বভাবগত কারণে মহিষ খাল-বিল, নদী-নালা ও পুকুর-ডোবার পানিতে ডুবে থাকতে পছন্দ করে। আমাদের দেশে চর বা উপকূলবর্তী এলাকায় মহিষ পালন সহজ। সারাদিন এরা চরের বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করে এবং রাতে এদেরকে বেড়াহীন ঘরে আটকে রাখা হয়। এ সময় এদেরকে কিছু দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয়। যদিও গরু থেকে মহিষের রোগবালাই কম তবুও বাচ্চা মহিষ সহজে রোগাক্রান্ত হতে পারে ও সেক্ষেত্রে মৃত্যুহার বেশি হয়ে থাকে।

উন্নয়নশীল বিশ্বে গ্রামীণ এলাকায় চাষাবাদ এখনো প্রাণিশক্তির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। গ্রামাঞ্চলে নানাবিধ কাজে মহিষ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গবাদিপ্রাণির তুলনায় এরা বেশি শক্তিশালী, কর্মঠ ও মালামাল পরিবহনে সক্ষম। তাছাড়া গৃহপালিত অন্যান্য প্রাণির তুলনায় মহিষ থেকে অনেক বেশি মাংস পাওয়া যায়। মহিষের দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের চাহিদা এবং মূল্যও বেশি।

মহিষ পালনের সুবিধাদি

১. নিম্নমানের আঁশজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করেও এরা উৎপাদনক্ষম থাকে।
২. গরুর তুলনায় মহিষের খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা বেশি।
৩. মহিষ প্রতিকূল পরিবেশ যেমন বন্যা, ঝড় ও বৃষ্টিতে এমনকি কোনো বাসস্থান ছাড়াও বাস করতে পারে।
৪. গরুর তুলনায় মহিষ বেশি দিন বাঁচে বলে দীর্ঘদিন বাচ্চা ও দুধ প্রদান করে।
৫. মহিষ চাষাবাদ ও ভারী মালামাল পরিবহনে অত্যন্ত কার্যকর।
৬. মহিষের রোগবালাই তুলনামূলকভাবে কম।
৭. মহিষের দুধে দুগ্ধচর্বি বেশি থাকায় উৎকৃষ্টমানের দুগ্ধজাত পণ্য যেমন দই, ঘি, পনির, মাখন ইত্যাদি উৎপাদিত হয়।
৮. মহিষের বাছুর দ্রুত বর্ধনশীল বিধায় বাণিজ্যিকভিত্তিতে মাংস উৎপাদনের জন্য মহিষ ব্যবহার অত্যন্ত উপযোগী। দুই বছরের কম বয়স্ক মহিষের মাংস খুব সুস্বাদু।
৯. মহিষ প্রধানত বিচরণ করে খাদ্য সংগ্রহ করে। এদের জন্য উন্নতমানের বাসস্থানের প্রয়োজন হয় না বিধায় মহিষ পালনে শ্রম ও খরচ দু-ই কম হয়।
১০. মহিষের চামড়া মোটা ও শক্ত যা জুতা, জুতার সোল, বেল্ট ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এদের চামড়ার বাণিজ্যিক মূল্যও যথেষ্ট।
১১. গরুর পশমের চেয়ে মহিষের পশমের দৃঢ়তা ও নমনীয়তা অনেক বেশি। তাই মহিষের পশম দিয়ে ব্রাশ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।
১২. মহিষের হাড়, শিং ও ক্ষুর দিয়ে মূল্যবান পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়।
১৩. জবাইকৃত মহিষের রক্তের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হয় বলে তা প্রক্রিয়াজাত করে হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করলে অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়।
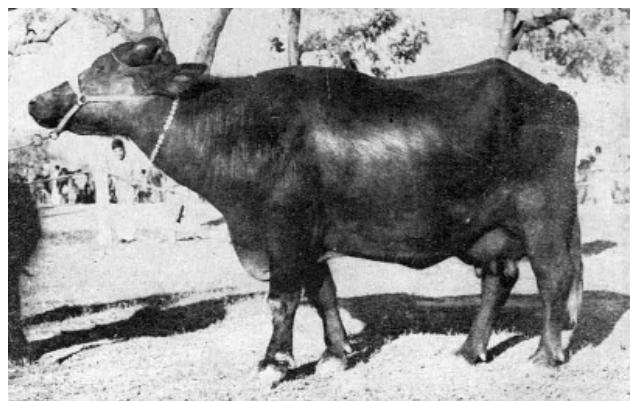
২৩.২ মহিষের জাত ও এদের বৈশিষ্ট্য

বর্তমানে যেসব মহিষ প্রতিপালিত হয় তা এশিয়ার বন্য প্রজাতির মহিষের বংশধর বলে জানা যায়। এদেরকে মূলত ২টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা-

১। নদীর মহিষ (রিভার টাইপ) ও

২। জলাভূমির মহিষ (সোয়াম্প টাইপ)

নদীর মহিষ (রিভার টাইপ)

নদীর মহিষ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মধ্য এশিয়া, দূর প্রাচ্য, রাশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পালিত হয়। এরা স্রোতযুক্ত পরিষ্কার পানিতে শরীর ডুবিয়ে রাখতে পছন্দ করে। এদের গায়ের রং কালো, শিং ছোট ও বাঁকানো এবং আকারে জলাভূমির মহিষ অপেক্ষা বড় (চিত্র-২৩.১)। প্রধানত দুধ উৎপাদনের জন্য এদের পালন করা হয়। এদের ক্রমোজোম সংখ্যা ৫০ । উন্নত জাতের নদীর মহিষের মধ্যে মুররাহ, নাগপুরী, জাফরাবাদী ও নিলি-রাভি উল্লেখযোগ্য।

চিত্র-২৩.১ নদীর মহিষ (রিভার টাইপ)

জলাভূমির মহিষ (সোয়াম্প টাইপ)

জলাভূমির মহিষ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চীন, ফিলিপাইন, মায়ানমার ইত্যাদি দেশে দেখা যায়। এরা কাদাপানি বা স্রোতহীন জলাভূমিতে শরীর ডুবিয়ে রাখতে পছন্দ করে। এ ধরনের মহিষের গায়ের রং কালচে বা গাঢ় ধূসর থেকে সাদা হয়ে থাকে। এদের শিং বেশি লম্বা হয় (চিত্র-২৩.২)। এরা পরিশ্রমী কিন্তু এদের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা কম। এরা সাধারণতঃ হালচাষ ও পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। এদের ক্রমোজোম সংখ্যা ৪৮। জলাভূমির মহিষ হিসাবে কোয়াইপ্রো, ম্যারিড ও লাল মহিষ প্রসিদ্ধ।

চিত্র-২৩.২ জলাভূমির মহিষ (সোয়াম্প টাইপ)

২৩.৩ মহিষের বাসস্থান ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

মহিষ স্বভাবগত কারণে পানি পছন্দ করে। তাই এদের বাসস্থানের আশেপাশে নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা থাকলে ভাল হয়। গরুর গোয়াল ঘরের মত মহিষের গোয়াল ঘর পরিষ্কার রাখতে হয় এবং খোলা বা বদ্ধ পদ্ধতিতে মহিষ পালন করা যায়। তবে গরুর ঘরের তুলনায় মহিষের ঘর আয়তনে বড় হয়। মহিষের ঘর গাছের নিচে ছায়াযুক্ত স্থানে হলে ভাল হয় এবং এমন জায়গায় ঘর নির্মাণ করা উচিত যেখানে পর্যাপ্ত আলো বাতাস রয়েছে। ঘরের মেঝে পাকা হওয়া উচিত যেন সহজে পরিষ্কার করা যায়। বাণিজ্যিক আকারে বড় খামারের জন্য বিভিন্ন বয়স বা ধরনের মহিষের ঘরের ব্যবস্থাপনা নিচে আলোচনা করা হলো।

বাছুরের ঘর

জন্মের প্রথম কয়েক মাস বিশেষ করে প্রথম মাসে অনেক বাছুর একত্রে এক ঘরে না রাখাই ভাল। প্রত্যেক বাছুরের জন্য ১মি. × ১.৫ মি. আকারের পৃথক খাঁচা থাকা উত্তম। এতে নাভিতে রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। তাছাড়া পৃথকভাবে বাছুরের যত্ন নেয়াও সহজ হবে। বাছুরের বয়স ১ মাসের বেশি হলে অন্যান্য বাছুরের সাথে একত্রে বড় ঘরে রাখা যেতে পারে। এসব ঘরের সামনে কিছুটা উন্মুক্ত স্থান থাকা প্রয়োজন যাতে সেখানে এরা সাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা ও দৌড়াদৌড়ি করতে পারে। গ্রামীণ পরিবেশে মহিষের বাছুরকে প্রথম কয়েক সপ্তাহ গোয়াল ঘরের এক জায়গায় মা-মহিষ থেকে সামান্য দূরে বেঁধে রাখা হয়।

বকনা মহিষের ঘর

গ্রামীণ পরিবেশে বকনা মহিষকে অন্যান্য মহিষের সাথে একই গোয়াল ঘরে রাখা হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক খামারের বকনা মহিষকে অন্য মহিষ থেকে আলাদা রাখা হয়। বকনা মহিষকে সাধারণত খোলা ঘরে রাখা হয়। এই ঘরে বিশ্রাম ও খাওয়ার জন্য পৃথক স্থান থাকে। বিশ্রামের স্থান ছাদযুক্ত আর খাওয়ার স্থান ছাদমুক্ত হয়ে থাকে। তবে পাকা স্থানে পৃথকভাবে খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

গর্ভবতী মহিষের ঘর

গর্ভবতী মহিষকে প্রসবের কমপক্ষে এক সপ্তাহ পূর্বে অন্যান্য দুগ্ধবতী মহিষ থেকে আলাদা করে প্রসূতি ঘরে রাখতে হবে। প্রসূতি ঘর সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আলো-বাতাসযুক্ত হতে হবে। প্রসূতি ঘর ৯-১০ বর্গমিটারের ছোট হওয়া ঠিক নয়।

ষাঁড় মহিষের ঘর

একটি পূর্ণবয়স্ক মহিষ ষাঁড়ের জন্য ১০-১২ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ছাদযুক্ত ঘর প্রয়োজন। এই ঘরের দুই পার্শ্ব উন্মুক্ত থাকবে। খোলা দিকে ১৫-২০ বর্গমিটার স্থান উঠান বা প্যাডক থাকা জরুরি। উঠানের চারিদিকে লোহার বেষ্টনী বা ইটের দেয়াল থাকতে হবে। ষাঁড়ের ঘরে খাবার দেবার জন্য চাড়ি ও পানি ছিটানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সারণী ২৩.১ ঃ মহিষের ঘরের মেঝের পরিমাণ

মহিষের প্রকৃতি	ছাদযুক্ত এলাকা (বর্গমিটার)	ছাদহীন এলাকা (বর্গমিটার)
বকনা মহিষ	১-১.৫	৫-৬
গর্ভবতী মহিষ	৩-৪	৮-১০
ষাঁড় মহিষ	১০-১২	১৫-২০

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের উপকূলবর্তী বেশির ভাগ এলাকায় মহিষকে বাথানে লালন-পালন করা হয়। এরা সারা বছর এখানে থাকে এবং বিচরণ করে বিভিন্ন ধরনের ঘাস (এ্যালি, উরি, দূর্বা, চেইচা) খায়। এদেরকে সাধারণতঃ দানাদার খাদ্য দেয়া হয় না। যে সমস্ত মহিষকে সেমি-ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে পালন করা হয় সেগুলিকে কাঁচা ঘাস, ধানের খড় ও সামান্য পরিমাণে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয় । এদেশের বেশির ভাগ মহিষই রাস্তার

পাশের ঘাস, ধানের খড় এবং কখনও কখনও খৈল ভূষি খেয়ে জীবন ধারণ করে। মহিষ থেকে পর্যাপ্ত দুধ ও মাংস পেতে হলে এদেরকে পুষ্টিকর সুষম খাদ্য দিতে হবে।

মহিষের খাদ্য

মহিষের ক্ষুধা নিবৃত্তি ও শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য খাদ্যমানের সঙ্গে খাদ্যের সঠিক আয়তনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য মহিষের খাদ্য আঁশযুক্ত হলে তা আয়তনসম্পন্ন হওয়া উচিত। খাদ্য তালিকাভুক্ত উপাদানগুলো যেন সহজলভ্য ও সস্তা হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। মহিষের দৈহিক ওজন ও উৎপাদন ভেদে খাদ্য সরবরাহের মাঝে পার্থক্য হয়ে থাকে। সাধারণত ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের মহিষের জন্য ২.৫-৩.০ কেজি শুষ্ক পদার্থের প্রয়োজন হয় যা আঁশযুক্ত ও দানাদার খাদ্য থেকে পেতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শুষ্ক পদার্থের ২/৩ অংশ আঁশযুক্ত এবং ১/৩ অংশ দানাদার খাদ্য থেকে সরবরাহ করা উচিত। আবার আঁশযুক্ত খাদ্যের ১/৩ অংশ সবুজ ঘাস হলে ভাল হয়।

বাছুরের খাদ্য তালিকা

জন্মের পর মহিষের বাচ্চার রুমেন সুদৃঢ় থাকে না। তাই এ সময় বিশেষভাবে তৈরি খাদ্য খাওয়াতে হবে। বাছুরকে শালদুধ, দুধ, ননীবিহীন দুধ, কাফ স্টার্টার (calf starter) প্রভৃতি খাওয়ানো উচিত। তবে কিছু কিছু উন্নতমানের তাজা বা শুষ্ক ঘাস খাওয়ানো উচিত যাতে রুমেনের গঠন ত্বরান্বিত হয়। সারণী-২৩.২ এ ৩ মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরের খাদ্যতালিকা প্রদত্ত হলো।

সারণী ২৩.২ ঃ জন্মের দিন থেকে ৩ মাস পর্যন্ত বাছুরের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা

বয়স	ননীযুক্ত দুধ (মিলি)	ননীবিহীন দুধ (মিলি)	কাফ স্টার্টার (গ্রাম)	উন্নতমানের শুকনো ঘাস (গ্রাম)
জন্মের পর প্রথম ৩ দিন	২৫৮০ (শালদুধ)			
৪র্থ-৭ম দিন	২৫০০			
২য় সপ্তাহ	৩০০০		৫০	২৫০
৩য় সপ্তাহ	৩২৫০		১০০	৩৫০
৪র্থ সপ্তাহ	৩০০০		৩০০	৫০০
৫ম সপ্তাহ	১৫০০	১০০০	৪০০	৫৫০
৬ষ্ঠ সপ্তাহ		২৫০০	৬০০	৬০০
৭ম সপ্তাহ		২০০০	৭০০	৭০০
৮ম সপ্তাহ		১৭৫০	৮০০	৮০০
৯ম সপ্তাহ		১২৫০	১০০০	১০০০
১০ সপ্তাহ			১২০০	১১০০
১১শ সপ্তাহ			১৩০০	১২০০
১২ সপ্তাহ			১৪০০	১৪০০
১৩শ সপ্তাহ			১৭০০	১৯০০

কাফ স্টার্টার

কাফ স্টার্টার ধরনের দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ। এতে ২০-২৩% পরিপাচ্য আমিষ ও ৭০-৭৩% সামগ্রিক পরিপাচ্য পুষ্টি (TDN) বিদ্যমান।

সারণী ২৩.৩ ঃ কাফ স্টার্টার খাদ্যের মিশ্রণ

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ (%)
ভুট্টা চূর্ণ	১০
যবে চূর্ণ	১০
গমের ভূষি	১০

বাদাম খৈল	৩৪
গম চূর্ণ	১৫
ছোলা চূর্ণ	১০
লাইমস্টোন পাউডার/হাড়ের গুঁড়া	৩
চিটাগুড়	৫
খনিজ পদার্থ	৩

বয়স্ক মহিষের খাদ্য তালিকা

মহিষের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পূর্বশর্ত হল উপযুক্ত সুষম খাদ্য প্রদান। এজন্য এদেরকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস ও দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

সারণী ২৩.৪ ঃ লিঙ্গ ও বয়সভেদে দৈনিক খাদ্য প্রদানের পরিমাণ

মহিষের প্রকৃতি	সবুজ ঘাস	খড়/শুষ্ক ঘাস	দানাদার খাদ্য
দুগ্ধবতী মহিষ	১০ কেজি	৬ কেজি	১.৫ কেজি
বকনা মহিষ	৫.৭২ কেজি	৫.০৮ কেজি	৪১০ গ্রাম
বাড়ন্ত মহিষ (৩ বছরের কম)	১.৫৯ কেজি	১.৬৪ কেজি	১০ গ্রাম
বলদ বা ষাঁড় মহিষ	৬.৫১ কেজি	৫.৪৩ কেজি	১০৯ গ্রাম

দানাদার খাদ্যের মোট পরিমাণের ২-৩ ভাগ গমের ভূষি/চাউলের কুঁড়া বা ভুট্টাচূর্ণ, ১ ভাগ ছোলা বা খেসারীর ভূষি এবং ১ ভাগ খৈল থাকতে হবে। তাছাড়া লবণ ও অন্যান্য খনিজ বা ভিটামিন প্রিমিক্স মোট দানাদার খাদ্যের ১% হিসাবে প্রদান করতে হয়। খড় ছোট করে কেটে পানিতে ভিজিয়ে সামান্য চিটাগুড় মিশিয়ে খাওয়ালে খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও পুষ্টিমান অনেক বেড়ে যায়। এই সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিষ্কার পানি সরবরাহ করতে হবে।

২৩.৪ মহিষের পরিচর্যা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

মহিষকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখা এবং এদের থেকে পর্যাপ্ত উৎপাদন পেতে হলে সঠিক ব্যবস্থাপনা বা পরিচর্যা প্রয়োজন। পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন বলতে সময়মতো খাবার পরিবেশন, গর্ভবতী মহিষের যত্ন, পরিচর্যা, অসুস্থদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, সময়মতো টিকা প্রদান, কৃমিনাশক ঔষধ প্রদান, ঘর ও আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ ইত্যাদিকে বোঝায়।

বাছুরের পরিচর্যা

সদ্যপ্রসূত বাছুর যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে শালদুধ বা কলস্ট্রাম পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বাছুরের নাভিতে জীবাণুনাশক ঔষধ লাগাতে হবে ও নিয়মিত যত্ন করতে হবে যেন তাতে কোনো রোগজীবাণুর সংক্রমণ না ঘটে। বাছুরের বয়স ২ সপ্তাহ হওয়ার পূর্বেই কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করাতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে টিকা প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনবোধে পুরুষ বাছুরকে নির্দিষ্ট সময়ে খোঁজা করে নিতে হবে।

গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিষের পরিচর্যা

গর্ভবতী মহিষকে বাচ্চা প্রসবের অন্তত এক সপ্তাহ পূর্বে অন্যান্য মহিষ থেকে পৃথক করে প্রসূতি ঘরে পালন করতে হবে। স্থানান্তরের পূর্বে প্রসূতি ঘর উত্তমরূপে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। গর্ভবতী মহিষকে প্রসবের ৬-৮ সপ্তাহ পূর্ব থেকে দানাদার খাদ্যসহ প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করতে হবে। প্রসবের এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা ঘাস সরবরাহ করা উচিত। এতে কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

প্রসবের সময় কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা তা খেয়াল রাখতে হবে। প্রসববিঘ্ন হলে বা প্রসবের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গর্ভফুল নিষ্ক্রান্ত না হলে প্রাণি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। প্রসবের পর প্রসূতির দেহ কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। এরপর এদেরকে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করতে হবে।

ষাঁড় মহিষের পরিচর্যা

সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখার জন্য ষাঁড় মহিষকে নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আলো-বাতাসপূর্ণ ঘরে রাখা এবং নিয়মিত ব্যায়াম করানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যায়ামের জন্য জনশূন্য রাস্তা বা খোলা মাঠে এক ঘন্টা দৌড়ঝাঁপ করানোই যথেষ্ট। ২-৩ বছর বয়স্ক ষাঁড় সপ্তাহে দুবারের বেশি পাল দেয়ার কাজে ব্যবহার করা ঠিক নয়। ৩ বছরের বেশি বয়স্ক ষাঁড়কে সপ্তাহে একবার পাল দেয়ার জন্য ব্যবহার করা যায়। তবে ১ সপ্তাহের মধ্যে পাল দেয়ার কাজে ব্যবহৃত না হলে পাল দেয়ার সময় ষাঁড়কে ২য় বার সুযোগ দেওয়া উচিত। কেননা ১ম বারে মৃত শুক্রাণুর সংখ্যা বেশি থাকে।

অন্যান্য পরিচর্যাসমূহ

* মহিষের সংখ্যা বেশি হলে চেনার জন্য কানে ট্যাগ নম্বর লাগাতে হবে।
* ভারবাহী মহিষের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে ক্ষুরের নীচে লৌহনির্মিত সু বা জুতো লাগাতে হবে।
* মহিষের দেহে প্রয়োজনের তুলনায় ঘর্মগ্রন্থির সংখ্যা খুবই কম। তাই নদীর মহিষ পরিষ্কার পানি এবং জলাশয়ের মহিষ ডোবা-নালার কর্দমাক্ত পানি গায়ে মেখে দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। মহিষের এ ধরনের গোসল বা গড়াগড়িকে 'Wallowing' বলে (চিত্র-২৩.৩)। যেখানে 'Wallowing' এর ব্যবস্থা নেই সেখানে ছায়াযুক্ত স্থানে পানির পাইপের সাহায্যে দিনে অন্তত দুবার মহিষকে গোসল করানো উচিত। এদের শরীর ভালোভাবে ডলে পরিষ্কার করতে হবে।

চিত্র-২৩.৩ মহিষের গোসল

* প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে দুধ দোহন করতে হবে। দুধ দোহনের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।
* কোনো মহিষ অসুস্থ হলে সঙ্গে সঙ্গে পৃথক করে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।

মহিষের রোগ-বালাই

মহিষের বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়ে থাকে। এরা অন্যান্য গবাদি প্রাণির ন্যায় জীবাণুঘটিত, পরজীবীঘটিত, অপুষ্টিজনিত, বিপাকীয় ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর মধ্যে তড়কা, বাদলা, গলাফুলা, ক্ষুরারোগ ও কৃমিজনিত রোগ অন্যতম। যেহেতু কৃষকরা নিয়মিত ভ্যাকসিন দেয় না ও কৃমিনাশক ঔষধ ব্যবহার করে না সেহেতু এসব রোগে প্রতি বছর অনেক মহিষ মারা যায়। বিশেষ করে মহিষের বাচ্চার মৃত্যুর হার প্রায়শ: ১৫-৩০% হয়ে থাকে। এদের বিভিন্ন সংক্রামক রোগের জন্য সঠিক সময়ে ঠিক মত টিকা প্রয়োগ করতে হবে এবং বছরে অন্তত দুবার কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে। মহিষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা অন্যান্য গবাদি প্রাণির মতই যা মড্যুল- ২৫ এ আলোচনা করা হবে।

উৎসঃ
*মহিষ পালন ও পরিচর্যা - মোঃ ওমর ফারুক, এম.এ. হাসনাত, খন্দকার গোলাম মোস্তফা
*গৃহপালিত প্রাণিপালন - বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

মডিউল-২৪ ঃ
দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য

২৪.১ দুধের মান ও পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার কারণ

দুধ উৎপাদন হল একটি বড় ধরনের প্রক্রিয়া যেখানে অনেক বিষয় জড়িত। এখানে প্রাণির নিজেস্ব বৈশিষ্ট্য ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুধের মান ও পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হল।

২৪.১.১ প্রাণির নিজেস্ব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে দুধের মান ও পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার কারণ

১। প্রাণির জাত ঃ গাভীর দুগ্ধমান ও পরিমাণ উভয়ই জাতের উপর নির্ভর করে। গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ এবং দুধের উপাদান যেমন- চর্বি, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের প্রাণিতে কম বেশী হয়। উচ্চ উৎপাদনশীল প্রাণি থেকে দুধ উৎপাদন বেশী পাওয়া যায় । যেমন- হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, জার্সি, ব্রাউন সুইস,গুয়েরেন্সি, শাহীওয়াল, সিন্ধি । অন্যদিকে দেশী জাতের প্রাণির দুধ উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কম। দুধের মান ও পরিমাণ দুটো বিপরীত জিনিস। দুধের পরিমাণ বেশী হলে চর্বির পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই কম হয়ে যায়। এজন্য আমাদের দেশী প্রাণিতে চর্বির পরিমাণ বেশী।

২। বংশ ও বয়স ঃ একই জাতের প্রাণির বংশ ও বয়স ভেদে দুধের মান ও পরিমাণ কমবেশী হয়। গাভী **১**ম বিয়ানে কম দুধ দেয় । ধীরে ধীরে ৫ম বিয়ানের সময় পর্যন্ত গাভী বেশী দুধ দেয় ও চর্বির পরিমাণ বাড়তে থাকে। তারপর থেকে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও দুধে চর্বির পারমাণ কমতে থাকে।

৩। প্রাণির উৎপাদন ক্ষমতা ও সংখ্যা ঃ নির্বাচিত প্রাণির উৎপাদন ক্ষমতা বেশী হলে ও প্রাণির সংখ্যা বেশী হলে বেশী পরিমাণ দুধ পাওয়া যাবে।

৪। প্রাণির শারীরিক অবস্থা ঃ গাভীর শারীরিক অবস্থা বিশেষ করে গর্ভকালে ও প্রসবকালে সুস্বাস্থ্য আশানুরূপ দুধ উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাভী হতে বেশী দুধ পেতে হলে গর্ভকালে সুষ্ঠু পরিচর্যা ও সুষম খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন।

৫। প্রাণির আকার ঃ একই জাতের ছোট আকারের গাভী থেকে বড় আকারের গাভী হতে বেশী দুধ পাওয়া যায়।

৬। প্রাণির ওলান ও বাঁটের অবস্থা ঃ দুগ্ধজাত প্রাণির ওলান ও বাঁটের অবস্থা যত ভাল হবে দুধ উৎপাদন তত বেশী হবে। সাধারণতঃ গাভীর মোট দুধ উৎপাদনের ৪০% ওলানের সম্মুখের অংশের বাঁট এবং ৬০% পিছনের অংশের বাঁট থেকে পাওয়া যায়। এজন্য রোগমুক্ত ওলান ও বাঁটের আকারের উপর দুধের মান ও পরিমাণ নির্ভর করে।

৭। প্রাণির অভ্যন্তরীণ অবস্থা ঃ প্রাণির শরীরে অভ্যন্তরীণ কোন সমস্যা যাতে না থাকে। বিশেষ করে হরমোন জাতীয়, প্রাণির গরম না হওয়া বা অন্য কোন সমস্যা ইত্যাদি। গাভী সমস্যামুক্ত না হলে ভাল দুধ উৎপাদন সম্ভব নয়।

৮। গর্ভবস্থা ঃ পাঁচ মাস গর্ভবতী গাভী দুগ্ধ প্রদানে উলেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। এ সময় দুধের পরিমাণ কমে যায়।

৯। প্রাণির রোগ ঃ সব রোগই দুধের মান ও পরিমাণ কমায়। তবে ম্যাসটাইটিস বা ওলান প্রদাহ সবচেয়ে বেশী দুধ উৎপাদন কমায় ও গুণগত মান নষ্ট করে দেয়। এজন্য ওলান প্রদাহযুক্ত গাভীও দুধ উৎপাদনের সাথে জড়িত।
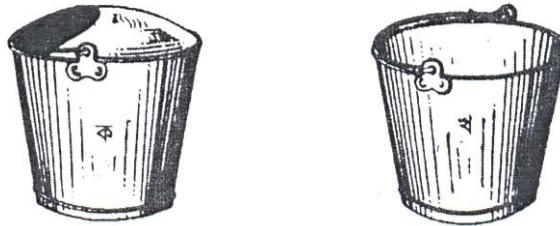
২৪.১.২ সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুধের মান ও পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার কারণ

১। প্রাণিখাদ্য ঃ খাদ্য দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও মানের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ যত ভাল খাবে তত বেশী উৎপাদন দিবে। গাভীকে সুষম খাদ্য না দিলে দুধ উৎপাদন কমে যায় আবার অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য, বড়ি জাতীয় খাদ্য, বেশী রসালো খাদ্য ও ঘাস, মিহিভাবে গুঁড়া হে ইত্যাদি দুধের চর্বির পরিমাণ কমিয়ে দেয়। দুধে খনিজ পদার্থ ও ভিটামিনের পরিমাণ গাভীর খাদ্য দ্বারা বাড়ানো যায়। গাভীকে সুষম খাদ্য না দিলে আমিষ ও শর্করা জাতীয় উপাদান ও দুধ উৎপাদন কমে যায়।

২। ব্যবস্থাপনা ঃ দুধ উৎপাদনের সাফল্য নির্ভর করে প্রাণির সার্বিক ব্যবস্থাপনার উপর। কারণ ভাল জাতের প্রাণি হলেও ভাল বাসস্থান ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, ক্রটিপূর্ণ দুধ দোহন, রোগ ইত্যাদি উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

৩। দুধ দোহন পদ্ধতি ঃ দুধের মান ও পরিমাণ দুধ দোহন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। কম উৎপাদনশীল বা দেশী প্রাণি থেকে সহজেই হাতের সাহায্যে দুধ দোহন করা যায়। কিন্তু অধিক উৎপাদনশীল প্রাণির জন্য মেশিনের সাহায্যে দুধ দোহনের প্রয়োজন পড়ে এবং দোহনের সময় দুধ যেন দূষিত না হয় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

৪। দোহন কাল ঃ দোহন কালের ১ম ৫০ দিন দুধ উৎপাদন বেশী থাকে ও পরে আস্তে আস্তে কমে যায়। ৯০ দিন পর দুধে চর্বির হার বৃদ্ধি পায় এবং আমিষের হার আংশিক বৃদ্ধি পায়।

৫। দুধ ছাড়ান কাল ঃ প্রসবের পূর্বে কমপক্ষে ২ মাস ওলানের ক্ষত পূরণের জন্য প্রয়োজন। গাভী **১২-১৩** মাস দুগ্ধহীন অবস্থায় থাকলে উৎপাদন বেশী হয়।

৬। দোহনের হার ও সময় ঃ দিনে ২-৩ বার দুধ দোহন করলে দুধ উৎপাদন বেশী পাওয়া যায়। কারণ ওলানের দুগ্ধ ধারণ ক্ষমতা সীমিত। দোহনের পরেই সর্বাধিক দুগ্ধক্ষরণ হয়। ওলানের দুধের চাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে দুগ্ধক্ষরণ কমতে থাকে। দোহনের মধ্যবর্তী সময় বেশী হলে দুধের পরিমাণ বেড়ে যায় কিন্তু চর্বির পরিমাণ কমে যায়। সময় হিসাব করে দুধ দোহন করলে দুধ উৎপাদন বেশী হয়। প্রতিদিন একই সময়ে একইভাবে দোহন করা উচিত। সাধারণতঃ সকালে দুধের উৎপাদন বেশী হয় ও বিকালে চর্বির পরিমাণ বেশি থাকে।

৭। দুধ পূর্ণ দোহন ও দোহনকারী ঃ দুধ সব সময় পূর্ণভাবে দোহন করতে হবে। নতুবা উৎপাদন কম হবে এবং চর্বির পরিমাণও কম হবে। কারণ চর্বি দোহনের শেষের দিকে বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। একই ব্যক্তি দুধ দোহন করলে গাভী ভদ্র আচরণ করে ও দুধ উৎপাদন বেশি হয়।

৮। এস্ট্রাস সাইকেল ঃ যেহেতু দুধ উৎপাদনের জন্য দায়ী ল্যাকটোজেনিক হরমোন গাভীর এস্ট্রাস সাইকেলে অংশ নেয়। যেহেতু এ সময় গাভীর উৎপাদন উলেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

৯। বাচ্চা প্রদানের ব্যবধান ঃ দীর্ঘবিরতী দিয়ে গাভী বাচ্চা দিলে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

১০। পানির প্রভাব ঃ গাভীকে দিনে একবার পানি খাওয়ালে যে পরিমাণ দুধ পাওয়া যায়,ইচ্ছা মত পানি ক্ষেতে দিলে ৩.৫% বেশি দুধ পাওয়া যায়।

১১। প্রাণির প্রজনন ও ছাটাই ঃ দেশী জাতের প্রাণি থেকে যেহেতু দুধ উৎপাদন কম পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে আপগ্রেডিং প্রজনন পদ্ধতিতে প্রাণির প্রজনন ঘটাতে হবে। তাহলে দুধ উৎপাদন বেশি হবে। কম উৎপাদনশীল ও অসুস্থ গাভী বাদ দিয়ে নতুন ভাল গাভী প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বাড়ানো যায়।

১২। ঋতু ও আবহাওয়া ঃ শীত মৌসুমে দুধের পরিমাণ ও চর্বির অংশ বেশী হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় দুধের পরিমাণ ও মান হ্রাস পায় । ৮৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ও ৬০% আর্দ্রতা গাভীর জন্য সংকটময় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বলা হয়।

২৪.২.১ বিশুদ্ধ দুধ দোহনের নিয়ামাবলী

প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ 'আদর্শ খাদ্য' দুধ। কিন্তু এ দুধ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে অতি সহজে দূষিত হয়ে পড়ে। দুধ দোহন পদ্ধতিই এর প্রধান কারণ এবং দোহনের সময়ই অসংখ্য ক্ষতিকর জীবাণু দুধে ঢুকে পড়ে। দুধে জীবাণু এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে দুধের পুষ্টিমান অতি সহজেই নষ্ট করে ফেলে। তাই দুধ দোহনের সময় যত বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা যায় তত ভাল দুধ পাওয়া যায়।

১. দোহনের পূর্বে গাভীকে ভাল করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। গাভীর পশ্চাৎভাগ, ওলান, বাঁট, লেজ, মলদ্বারের চারপাশে ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং শুকনো পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতে হবে। শীতকালে সামান্য গরম পানি ব্যবহার করতে হবে।
২. দুধ দোহনের পূর্বেই গাভীর শরীরকে ব্রাশ করে আলগা পশম সরিয়ে ফেলতে হবে।
৩. গোয়ালা বা দুধ দাহনকারীকে অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। গোয়ালার হাত বা শরীরের অন্যস্থানে যেন কোন চর্মরোগ না থাকে এবং হাতের নখ ও আঙ্গুল সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে।
৪. দোহনের পাত্র অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত হতে হবে। এ জন্য আগে থেকেই ফুটন্ত পানি দিয়ে দুগ্ধ পাত্র পরিষ্কার করে শুকিয়ে রাখতে হবে।
৫. যেখানে অনেক গাভী দোহন করতে হবে, সেক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের (stainless Steel) স্টেইনলেস্ স্টীলের তৈরি দুধ দোহন পাত্র করা বাঞ্ছনীয়। ঐ দুধ দোহন-পাত্রের (Milking pail) ভিতর মসৃণ হওয়া উচিত এবং তার মুখ উপরিভাগের এক পার্শ্বে ঢাকা থাকতে হবে।

চিত্র ২৪.১ ঃ ক আংশিক খোল আদর্শ বালতি
খ সম্পূর্ণ খোলা দুধ দোহাবার বালতি।

৬. বিকল্প হিসেবে ভিন্ন ধরনের দুধ দোহন পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে, যা গরম পানি দিয়ে সহজে পরিষ্কার করা যায়।
৭. দুধ দোহনের স্থান সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে।
৮. গাভী দোহনের সময় গাভীকে যেন কুকুর বা অন্য কোন প্রাণী বা মানুষ উত্যক্ত করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট লোক দিয়ে নির্দিষ্ট পাত্রে দুধ দোহন করতে হবে। এ ব্যবস্থায় গাভী খুব সহজে তাড়াতাড়ি দুধ ছেড়ে দেবে; সময়, পাত্র, স্থান ও লোকের আগমন সম্বন্ধে পরিচিত থাকবে তার ফলে দুধ দোহন সহজ ও পরিপূর্ণ হবে।
১০. দোহনকারী দুধ দোহনের সময় যেন হাঁচি, কাশি না দেয় সে ব্যাপারে পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ রোগাক্রান্ত কোন লোক দিয়ে দুধ দোহন না করানো উচিত।
১১. দুধ দোহন শুরু হওয়ার পূর্ব মূহুর্তে বাছুর গাভীর প্রতিটা বাঁটে মুখ দিয়ে সামান্য কিছু দুধ যেন চেটে নেয়। এর ফলে বাঁটে যদি কোন জীবাণু থেকে থাকে তা অপসারিত হবে।
১২. যখন বাছুর থাকবে না তখন বাঁট হতে সামান্য পরিমাণ দুধ অন্য একটা পাত্রে বা কাপে সরিয়ে রাখা ভাল। এতে দুধ জীবাণুমুক্ত হতে পারে।

১৩. অনেকেই দুধ দিয়ে হাত ভিজিয়ে বাঁট পিচ্ছিল করার অভ্যাস আছে। এর ফলে প্রচুর জীবাণু দুধে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই এ অভ্যাস অবশ্যই ত্যাগ করা উচিত।
১৪. বাঁটকে মৃদুভাবে আঙ্গুল দিয়ে মর্দন করে নরম করে নিলে বাঁট শুকনো থাকলেও দুধ দোহন করা যায়। এর ফলে দুধে জীবাণু প্রবেশের সম্ভাবনা কম থাকে।
১৫. যদি বাঁট বড় হয় তবে বাঁটকে মুঠে করে বার বার সংকোচন করলেও দুধ দোহন সহজ হয়।
১৬. দুধ যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি দোহন শেষ করাই উত্তম। নতুবা বেশি সময় নিলে সম্পূর্ণ দুধ দোহনের পূর্বেই ওলানে কিছু দুধ আটকে থাকতে পারে। অথবা গাভী দুধ উঠিয়ে নিবে। দোহনের শেষ পর্যায়ে দুধে ননীর ভাগ বেশি থাকে। সুতরাং এভাবে সর্বোকৃষ্ট দুধের অংশ বিশেষ ওলানে থেকে যাবার সম্ভাবনা থাকে।
১৭. দুধ দোহনের পরপরই দুধকে ঠান্ডা করে নিতে হবে। হিমায়িত করার ব্যবস্থা থাকলে হিমায়িত করা উত্তম। তবে দুধকে পাস্তুরিত করতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়।

২৪.২.২ দুধ দোহন পদ্ধতি

দুধ দোহন হল দুধ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্পূর্ণ বিষয়। দুধ দোহন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দুগ্ধগ্রন্থি হতে দুধ নিঃসরণ করা হয়, যা হাত দ্বারা অথবা মেশিনের সাহায্যে করা যায়। হাত দ্বারা দুধ দোহন তিনভাবে হতে পারে- (ক) পূর্ণ হস্ত দোহন (খ) নোড দ্বারা দোহন (গ) দুই আঙ্গুল দ্বারা দোহন

পদ্ধতিসমূহের বর্ণনা

(১) হাত দ্বারা দুধ দোহন (Hand milking)

মূলনীতি ঃ হাতের সাহায্যে দুধের বাঁটের উপর চাপ প্রয়োগ করলে ওলানের ভিতরের দুধের উপর চাপ পড়ে। যখন চাপ অপসারণ করা হয় তখন ওলানের দুধ বাঁটে চলে আসে। আবার যখন বাঁটে চাপ দেয়া হয় তখন একই সাথে দুধ নিচের পাত্রে জমা হয় এবং ওলানের ভিতরও চাপ পড়ে। এভাবে দুধ দোহন প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

(ক) পূর্ণ হস্ত দোহন ঃ যে সমস্ত গাভীর ওলানের গঠন ভাল এবং এবং বাঁটগুলি পরিমিত আকারের ধরা হয় যাতে ছোট আঙ্গুলের অগ্রভাগ মুক্ত থাকে। এভাবে বাঁট ধরে বার বার মুঠো খোলা এবং বন্ধের মাধ্যমে দুধ দোহন করতে হয়।

(খ) নোড দ্বারা দোহন ঃ যে সমস্ত গাভীর বাঁট মোটা ও মাংসল, সে সমস্ত গাভী দোহনের জন্য এ পদ্ধতি উপযুক্ত। এ পদ্ধতিতে বৃদ্ধাঙ্গুলির অর্ধভাগ এবং প্রথম আঙ্গুল দ্বারা বাঁটকে এমনভাবে ধরা হয় যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়ে বাঁটে চাপ প্রয়োগ করা যায়। এভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বার বার চাপ প্রয়োগ করার মাধ্যমে দুধ দোহন করতে হয়।

(গ) দুই অঙ্গুল দ্বারা দোহন ঃ যে সমস্ত গাভীর বাঁট ছোট, সে সমস্ত গাভী এ পদ্ধতিতে দোহনের জন্য উপযুক্ত। এ পদ্ধতিতে বৃদ্ধাঙ্গুল এবং প্রথম আঙ্গুল এর অগ্রভাগ দিয়ে বাঁট ধরা হয়। দু আঙ্গুল দিয়ে চাপ প্রয়োগসহ উপরে-নিচে করে দুধ দোহন করতে হয়।

২৪.৩.১ তরল দুধ সংরক্ষণ

দুধ একটি অতি সংবেদনশীল খাদ্য। সাধারণতঃ দুধ দোহনের অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবহার না করলে দুধ সহজে নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য দুধ সংরক্ষণের প্রয়োজন পড়ে।

দুধ সংরক্ষণ হল একটি প্রক্রিয়া যেখানে দুধকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত পচনমুক্ত রেখে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার উপযোগী রাখা হয়।

দুধ সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃদুধকে বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা যায়। তবে দুধ সংরক্ষণ ব্যবস্থা তেমন সহজ নয়। কারণ দুধের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন খুব সহজেই ঘটে। সেজন্য দুধ দোহনের পরপরই দুধকে ছাঁকতে ও ঠান্ডা করতে হয়।

(১) ঠান্ডা প্রক্রিয়া

(ক) ডিপফ্রিজ ঃ দুধকে ডিপফ্রিজে রাখলে জমে যায় এবং সংরক্ষণ করা যায়। তবে এক্ষেত্রে দুধে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি না ঘটলেও রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন হয় এবং গুণগতমান কমে যায়।

(খ) হিমশীতল ট্যাংক ঃ দুধকে হিমশীতল ট্যাংকে রেখে কয়েক ঘন্টা সংরক্ষণ করা যায়। এক্ষেত্রে ধীরে ধীরে দুধের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন হতে থাকে।

(২) গরম প্রক্রিয়া

সাধারণ তাপমাত্রায় বিভিন্ন জীবাণু দুধে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্নের মাধ্যমে দুধকে টক স্বাদযুক্ত করে ফেলে। স্ট্রেপটোকক্কাই (Streptococci) নামক ব্যাকটেরিয়া জীবাণু প্রধানত দুধে অ্যাসিড তৈরি করে। ব্যাকটেরিয়া জীবাণু সাধারণ তাপমাত্রায় দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। তাই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে দীর্ঘ সময় দুধ সংরক্ষণ করা যায়।

(ক) দুধ ফুটানো ঃ দুধকে ফুটালে ৭-৮ ঘন্টা সংরক্ষণ করা যায়।

(খ) দুধকে ৪ ঘন্টা পরপর ২০ মিনিট করে ফুটানো এভাবে দুধ ফুটালে দুধ জীবাণুমুক্ত হয় এবং সংরক্ষণ করা যায়।
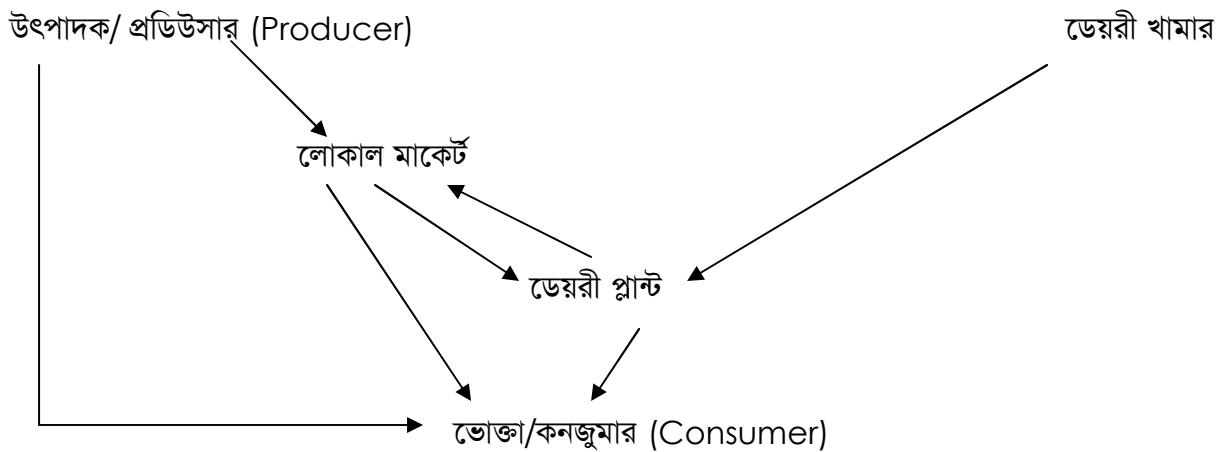
(গ) উচ্চ তাপমাত্রায় প্রক্রিয়াজাতকরণ (পাস্তুরাইজেশন, স্টেরিলাইজেশন)।

(৩) গুঁড়াদুধ ঃ দুধকে মেশিনের সাহায্যে শুকিয়ে গুঁড়া দুধ তৈরি করে অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে দুধের গুণাগুণ কিছুটা নষ্ট হয়ে যায়।

(৪) দুধ থেকে বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য বানানো ঃ দুধের সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে দুধকে সংরক্ষণ করা যায়। যেমন হাইড্রোজেন পার অক্সাইড, সোডিয়াম বাই কার্বনেট, ল্যাকটো পার অক্সিডেজ ইত্যাদি। ০.০৫% হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দুধে মিশিয়ে দিলে দুধ ১৫-১৬ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়, দুধ ফুটালে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড নষ্ট হয়ে যায়।

২৪.৩.২ দুধ পরিবহন ও বিপণন

দুধের চাহিদা মিটাতে এবং দুধকে প্রক্রিয়াতাজকরণের উদ্দেশ্যে দুধের পরিবহন করার প্রয়োজন পড়ে। দুধ পরিবহন হল দুধকে উৎপাদনের জায়গা থেকে সরাসরি ভোগের জায়গা বা প্রক্রিয়াজাতকরণের জায়গায় নেওয়ার পর ভোগের জায়গায় পৌঁছানো। দুইভাবে দুধকে পরিবহন করা যেতে পারে। মিল্ক ক্যানের সাহায্যে ও ট্রাক ট্যাংকের সাহায্যে ।যেহেতু দুধ একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ খাদ্য সেহেতু তার চাহিদাও অনেক। তাই তার সুষ্ঠু বিপণনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুধ বিপণনের চ্যানেল দেখানো হল ঃ

চিত্রঃ ২৪.২.দুধ বিপণন চ্যানেল

দুধ বিপণনের সমস্যা

১. স্বাস্থ্যসম্মত দুধ সম্পর্কে জনসাধারণের জ্ঞানের অভাব।
২. স্বাস্থ্যসম্মত দুধের অপ্রতুলতা।
৩. দুধের অসম সরবরাহ।
৪. দুধের অধিক পচনশীল স্বভাব।
৫. দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণে সমস্যা।
৬. দুধ বিপণন নীতি না থাকা।
৭. কারিগরি জ্ঞানের অভাব।

দুধ বিপণন সমস্যার সমাধান

১. যুগোপযোগী দুধ বিপণন নীতি প্রণয়ন।
২. বহুল প্রচারের ব্যবস্থাকরণ।
৩. দেশীয় লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন।
৪. শিক্ষা পাঠ্যক্রমে বিষয়ের অন্তর্ভুক্তিকরণ।
৫. জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।
৬. কারিগরি দক্ষতা বাড়ানো।
৭. উদ্যোক্তাদের বিনাসুদে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও পুরস্কারের ব্যবস্থাকরণ।

২৪.৪.১ বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ
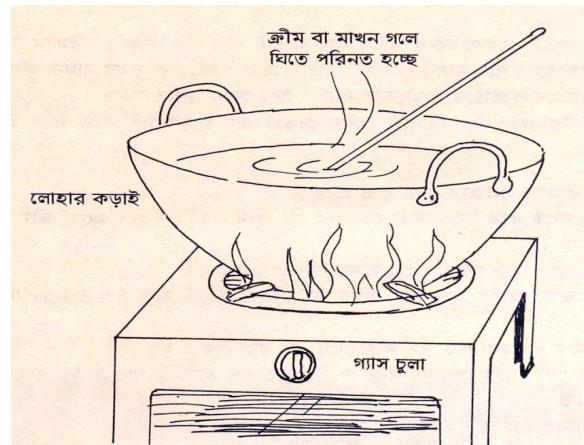
দুগ্ধ শিল্পে জীবাণু উপকার ও অপকার দু'ই করে থাকে। ব্যাকটেরিয়া যেমন দুধের পচন ধরায় তেমনি ব্যাকটেরিয়া সময়মত বিশেষক্ষেত্রে ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন পুষ্টিকর , সুস্বাদু ও মানুষের স্বাস্থের জন্য উপকারী দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। যেমন দই ও পনির তৈরীতে নির্দিষ্ট জীবাণুই মূখ্য ভুমিকা পালন করে থাকে।
দুধ তাপ দিয়ে খাওয়া ছাড়াও দুধ দ্বারা আরও বহুবিধ পুষ্টিকর সুস্বাদু খাবার বানানো যায় যেমন -ননী, মাখন , আইসক্রিম, ঘি, পনির, দই ইত্যাদি।

দই ঃ আমাদের দেশে দই অত্যন্ত জনপ্রিয় দুগ্ধজাত খাদ্য। দই তৈরী করতে দুধকে অনেকক্ষন জ্বাল দিয়ে ঘন করতে হয়, ১০ কেজি পরিমাণ দুধকে জ্বাল দিয়ে ৬.৫-৭ কেজি করে তার সংগে পূর্বের দই এর বীজ মিশিয়ে

দিয়ে পরিষ্কার পাত্রে ঢেলে রেখে দিলেই দই তৈরীর প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ অবস্থায় রেখে দিলে দুধের উপর ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া শুরু হয় এবং দই তৈরী হয়। ব্যাকটেরিয়া ল্যাকটিক এসিড, এসিটিক এসিড ও ডাইএসিটাইল এবং অন্যান্য গ্যাস উৎপন্ন করে। দই তৈরী হলে এক প্রকার সুগন্ধ পাওয়া যায় যা সাধারনতঃ ডাইএসিটাইলের জন্য সৃষ্টি হয়।

ঘিঃ ঘি অত্যধিক চর্বিযুক্ত এক প্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্য । ঘি নানা ভাবে তৈরী করা যায়। সাধারনত ক্রীম, দুধের সর ও মাখন তাপ দিয়ে ফুটিয়ে ঘি তৈরী করা হয়।

চিত্র ২৪.৩ ঃ ঘি তৈরী হচ্ছে

আইসক্রীমঃ ঠান্ডায় জমানো এক প্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্য। আইসক্রীম বিভিন্ন রকমের হতে পারে। আইসক্রীম তৈরীর জন্য খাঁটি দুধ/ কনডেন্সড বা গুড়ো দুধ পানিতে গুলে ব্যবহার করা যায়। প্রথমে বিভিন্ন উপাদান মেপে নিতে হবে। দুধের সাথে ১৬% হারে চিনি মিশিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। তারপর নির্দিষ্ট অনুপাতে অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে ফ্রিজারে দিতে হবে। আইসক্রীম অনেক সময় সমানভাবে জমে না ফলে খেতে ভাল লাগে না। ০.৫% হারে কর্ন-ফ্লাওয়ার দিলে ভালভাবে জমাট বাঁধবে। আইসক্রীমে ইচ্ছামত সুগন্ধ ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ ভ্যানিলা, স্ট্রবেরী, চকোলেট, মাংগো এসেন্স ব্যবহার করা হয়। প্রতি লিটার দুধ অনুপাতে ৩ মিঃ লিঃ সেন্ট দিলেই যথেষ্ট।

আইসক্রীম তৈরীর কয়েকটি ফর্মূলা

১। ক) ঘন দুধ ৪ লিটার
খ) ক্রিম ১ লিটার
গ) চিনি ১ কেজি
ঘ) কর্ন-ফ্লাওয়ার ১৮০ গ্রাম
ঙ) এসেন্স ৪ চা চামচ।

দুধ ও চিনি একসঙ্গে জ্বাল দিয়ে ঠান্ডা হলে অন্যান্য করে
দব্য মিশিয়ে ফ্রিজারে দিতে হবে।

২। ক) দুধ ৪ লিটার
খ) কনডেন্স দুধ ২৫০ গ্রাম
গ) চিনি ১ কেজি
ঘ) চকোলেট ৫০ গ্রাম
ঙ) এসেন্স ৪ চা চামচ।

দুধ, চিনি ও চকোলেট একসঙ্গে জ্বাল দিয়ে ঠান্ডা
অন্যান্য দ্রব্য মিশিয়ে ফ্রিজারে রাখতে হবে।

৩। ক) ঘন দুধ ৫ লিটার
খ) চিনি ১ কেজি
গ) কমলালেবু/ আনারসের রস ১ কেজি

দুধ ও চিনি জ্বাল দিয়ে ঠান্ডা করে ফলের রস মিশিয়ে ফ্রিজারে দিতে হবে।

দুগ্ধ প্যাকেটজাত করা

প্রতিযোগীতামূলক বাজারে বিভিন্নভাবে গ্রাহকের নিকট আরও আকর্ষণীয় ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে উপস্থাপন করার একটি উলেখযোগ্য পদ্ধতি হল দুধ প্যাকেটজাত করা। দুধ প্যাকেট করার জন্য প্রধানতঃ কাঁচ, কাগজ, কার্ডবোর্ড এবং প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। এ সমস্ত প্যাকেট একবার বা বহুবার ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরী করা যায়।

কাঁচের বোতল ঃ বিভিন্ন আকারের কাঁচের বোতলে দুধ ভরে ক্রেতার নিকট সরবরাহ করা যায়। কাঁচের বোতল অনেকদিন যাবৎ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিবার ব্যবহারের পর গুড়া সাবান দিয়ে পরিস্কার করে পানিতে ফুটিয়ে শুকিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। হাতে বা স্বয়ংক্রিয় মেশিনে দুধ কাঁচের বোতলে ভরা যেতে পারে। এ বোতল যানবাহনে কাঠের বক্সে করে দূর দূরান্তে পরিবহন করা যায়।

কাগজ বা কার্ডবোর্ডের প্যাকেট ঃ কাগজ বা কার্ডবোর্ডকে একবার ব্যবহারযোগ্য প্যাকেট হিসাবে তৈরী করা যায়। আজ পলিথিনের আবরণযুক্ত কাগজের প্যাকেট ব্যবহার হচ্ছে। কাগজের প্যাকেট সাধারণতঃ কাপ, ত্রিভূজাকৃতি, গোলাকার আয়তাকার ইত্যাদি নানা আকারের করা যায়। কাগজের প্যাকেটে দুধ প্যাকেটজাত করতে বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। জীবাণুমুক্ত দুধকে কাগজের প্যাকেটে রেফ্রিজারেশন ছাড়াই বেশকিছু সময় সংরক্ষণ করা যায় এবং দুরদুরান্তে পরিবহন করা যায়।

প্লাষ্টিক প্যাকেট ঃ বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় নানা আকৃতির প্লাষ্টিক বোতল বা প্যাকেট দুগ্ধ শিল্পে ব্যবহার করা হয়। দুধ প্যাকেট করার কাজে সফলভাবে পলিথিনের প্যাকেট ব্যবহার করা যায়। এ জাতীয় প্যাকেটে জীবাণুমুক্ত দুধ ভরে মুখ বন্ধ করে লাভজনকভাবে ব্যবসা করা যায়। দুধ প্যাকেটে ভরার সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব ঠান্ডা স্থানে বা রেফ্রিজারেটরে রাখতে হয়। প্যাকেটকে বিভিন্ন রংয়ের ও আকর্ষণীয় করে তৈরী করা যায়।

বর্তমানে আমাদের দেশে বেশ কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকারী প্রতিষ্ঠান দুধ প্যাকেট করে বাজারজাত করছে। খুব অল্প খরচ ও অতি সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করেই ছোট কিংবা বড় যে কোন খামারের উৎপাদিত দুধ এ পদ্ধতিতে প্যাকেট করে বাজারজাত করা যেতে পারে।

২৪.৫ পনির উৎপাদন ও বাজারজাতকরন

"পনির দুগ্ধজাত পণ্যের মধ্যে একটি অন্যতম পণ্য যা দুগ্ধ জমাট এনজাইম রেনিন দুধে যোগ করে তৈরী করা হয়"। আমাদের দেশীয় পনির মূলতঃ কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যা আন্তার্জাতিক ভাবে ঢাকা পনির নামে পরিচিত। অষ্টগ্রাম বাসীরা জানান যে ৩০০-৩৫০ বছর আগে থেকে অষ্টগ্রামে পনির উৎপন্ন হয়।

পনিরের সুবিধা

১. দুধ উত্তম পানীয় ও পুষ্টিকর খাদ্য হলেও অতি অল্প সময়ে নষ্ট হয়ে যায়।
২. পনির সংরক্ষণ সমস্যা কম এবং একটি লাভজনক পণ্য।
৩. পনিরকে সাধারণ তাপমাত্রায় ১০-২০ দিন রাখা যায়।
৪. অনুন্নত স্থানে সহজ উপায়ে এবং কম খরচে দুগ্ধ সংরক্ষণের অন্যতম ও প্রধান উপায় হচ্ছে পনির উৎপাদন।
৫. প্রাকৃতিক তাপমাত্রায় এর সংরক্ষণকাল অধিক হওয়ায় পনিরকে সুবিধাজনক সময়ে বাজারজাত করা যায় যা দুধের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।
৬. অধিক সংরক্ষণকাল থাকায় পনিরকে দূর দূরান্তে বাজারজাত করাও সম্ভব।

৭. পনির দুগ্ধ অমিষ জাতীয় খাদ্যের অতি উত্তম উৎস যা বাচ্চা ও বৃদ্ধদের আমিষ পুষ্টি চাহিদা মেটাতে উলেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম।

পনির তৈরির উপকরণ

গরু, মহিষ বা ছাগলের দুধ, মাওয়া (প্রক্রিয়াজাত পাকস্থলী), মাওয়ার পানি, এ্যালুমিনিয়াম পাত্র (৫০ লিটার), ষ্টেইনলেস ষ্টীলের ধারালো ছুরি, বাঁশের তৈরী ছুরি, বাঁশের তৈরী ঝুড়ি বা টুকরি, খাদ্য লবণ এবং পনির ছিদ্র করার জন্য চোখা কাঠি (পরিধি প্রায় ২.৫-৩সেমি.)।

মাওয়া তৈরী

সাধারণ ভাবে মাওয়া হলো লবণ দ্বারা বিশেষভাবে প্রাক্রিয়াকৃত গরু বা ছাগলের পাকস্থলী যা রোদে শুকিয়ে তৈরী করা হয়। গরু বা ছাগলের পাকস্থলী চারটি অংশে বিভক্ত যথাঃ রুমেন, রেটিকুলাম, ওমসাম ও অ্যাবোমেসাম বা প্রকৃত পাকস্থলী (পাকস্থলীর শেষাংশ)। এই অ্যাবোমেসাম দিয়েই মাওয়া তৈরী করা হয়। বাহ্যিক ভাবে যা দেখতে অনেকটা বাংলা অক্ষর ৫ এর মত। কসাই খানা হতে বাড়ন্ত গরুর এই পাকস্থলী ১০-১৫ টাকা দরে ক্রয় করা হয়। পাকস্থলীর ভিতরের বর্জ্য অপসারণের জন্য ধারালো চাকু দিয়ে কেটে টিউব ওয়েলের পানি দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ধুতে হবে যাতে পাকস্থলীর ভিতরের পিচ্ছিল(মিউকাস) অংশ পানির সাথে ধুয়ে না যায়। এবার বাঁশের চাটাই এর উপর পাকস্থলী এমন ভাবে বিছানো হয় যাতে পাকস্থলীর ভিতরের অংশ উপরে থাকে।

অতঃপর ২৫০-৫০০ গ্রাম পরিমাণ খাদ্য লবণ পাকস্থলীতে সমভাবে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে পাকস্থলী ৩-৪ দিন রোধে শুকায়ে টুকরা টুকরা করে কেটে মাওয়া তৈরী করা হয়। মাওয়া সাধারণতঃ ঠান্ডা জায়গায় যে কোন পাত্রে রেখে প্রায় ৩০ দিন পর্যন্ত ভালভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

মাওয়ার পানি প্রস্তুতকরণ (৪০ কেজি দুধের হিসাব)

গ্রীষ্মকালে একটি গরুর প্রক্রিয়াকৃত প্রকৃত পাকস্থলী বা মাওয়ার ১/৪ অংশ বা ২৫ শতাংশ এবং শীতকালে ১/৩ অংশ বা ৩৩ শতাংশ পরিমাণ মাওয়া একটি পাত্রে নিয়ে তাতে ২-৩ কেজি পরিমাণ পানি ও ১ কেজি পরিমাণ কাঁচা দুধ মিশায়ে ২৪ ঘন্টা ভিজায়ে রাখতে হবে। ব্যবহারের পূর্বে মাওয়ার টুকরো গুলো দুধ ও পানির দ্রবণে ভালভাবে মিশ্রিত করতে হবে। পনির তৈরির পূর্বে মাওয়ার পানি অবশ্যই পাতলা পরিস্কার কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। স্থানীয় ভাষায় এই পানিই ”মাওয়ার পানি” নামে পরিচিত।

দুধ থেকে পনির তৈরী

দুগ্ধ দহনের ৩-4 ঘন্টা পর ৪০ কেজি কাঁচা দুধ ছেকে একটি এলুমিনিয়ামের পাত্রে নিতে হবে। ২-৩ কেজি পরিমাণ মাওয়ার পানি ধীরে ধীরে দুধে যোগ করতে হবে এবং ভাল ভাবে নাড়তে হবে। দুধ জমাট বাঁধার জন্য ১০-৩০ মিনিট সময় স্থির রেখে দিতে হবে। দুধ জমাট হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য বাঁশের তৈরী পাতলা ছুরি দুধে প্রবেশ করায়ে দেখতে হবে। যদি ছুরিটি সোজা দন্ডায়মান থাকে তবে বুঝতে হবে দুধ জমাট সঠিক হয়েছে।

- জমাট বাঁধার ১০ মিনিট পর বাঁশের তৈরী ছুরি দ্বারা জমাট দুধকে আড়াআড়ি ভাবে কেটে দিতে হবে।
- কাটার ফলে কর্তিত জায়গা থেকে নীলাভ বর্ণের পানি বের হয়ে আসলে এর ১০ মিনিট পর কর্তিত জমাট দুধকে হাত দিয়ে আলতো ভাবে ভেঙ্গে দিতে হবে।
- ছানাকে উত্তম রূপে থিতানোর জন্য ৫-১০ মি. সময় রেখে দুই হাত দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে খুব ধীরে ধীরে পাত্রের একপাশে জমা করতে হবে। এমন ভাবে চাপ প্রয়োগ করতে হবে যেন ছানার ভিতর খুব বেশী পানি না থাকে এবং চাপা অবস্থায় থাকে।
- এবার ছানাকে ষ্টেইনলেস ষ্টীলের ধারালো ছুরি দ্বারা টুকরো টুকরো করে কাটতে হবে।

- অতঃপর ছানার টুকরাকে বাঁশের তৈরী ঝুড়িতে (প্রতিটি ঝুড়ির ব্যাস হবে প্রায় ১৬ সেমি. এবং উচ্চতা হবে প্রায় ৬-৭ সেমি.) হাত দ্বারা ঠেসে ভরতে হবে। ৪০ কেজি দুধের ছানা দিয়ে ৫ টি ঝুড়ি(প্রতিটি ঝুড়িতে পনিরের ওজন হবে ১ কেজি) পূর্ণ করা সম্ভব।
- নির্দিষ্ট আকার আকৃতির(ঝুড়ির ছাপ) জন্য ১৫ মিনিট পর ছানা পিন্ডকে প্রথমে উল্টিয়ে দিতে হবে।
- পানি নিষ্কশনের জন্য ছানার পিন্ডসহ ঝুড়ি একটি পাত্রে প্রায় ১৫ ঘন্টা রাখতে হবে এবং সেই সাথে ঝুড়িটি অন্য একটি পাত্র দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে, যাতে বাইরের ময়লা বা পোকামাকড় না পড়ে।
- ১৫ ঘন্টা পর ঝুড়ির পনির পিন্ডকে ২য় বার উল্টিয়ে চোখা কাঠি দ্বারা (ব্যাস প্রায় ২.৫-৩সেমি.) কেন্দ্র বা মাঝ বরাবর তিনটি ছিদ্র করে (ত্রিভুজাকৃতির) তাতে ৫০ গ্রাম খাবার লবণ ঢুকিয়ে দিতে হবে।
- বাড়তি লবণ পনির পিন্ডের চারপাশে মেখে দিতে হবে। এতে লবণ ধীরে ধীরে গলে সমস্ত পনির পিন্ডে বিস্তার লাভ করবে। এভাবে ৩ দিন পর্যন্ত রাখতে হবে।

পনির উৎপাদন

শীতকালে প্রতি ৮ কেজি গরুর দুধ হতে ১ কেজি পনির এবং গ্রীষ্মকালে ৯ কেজি দুধ থেকে ১ কেজি পনির উৎপাদিত হয়ে থাকে। মহিষের দুধ হতে গড়ে প্রতি ৭ কেজি দুধ থেকে ১ কেজি পনির উৎপাদিত হয়।

পনির সংরক্ষণ

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে স্বাভাবিক পরিবেশ/তাপমাত্রায় অষ্টগ্রাম পনিরকে ৭-১০ দিন এবং শীতকালে ১৫-২০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। পনির বেশী দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হলে ২ দিন পর পর লবণ পানি দিয়ে ঘষে দিতে হবে। তবে কোন কোন প্রস্তুতকারক পনিরের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি এবং বিশেষ আস্বাদের জন্য উন্মুক্ত আগুনের চুলার ধোঁয়ায় রেখে ধোঁয়ায়িত করে থাকেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পনিরকে ১ মাস থেকে ২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

বাজারজাত করন

অষ্টগ্রামের পনির প্রস্তুতকারক সাধারণতঃ বিভিন্ন এলাকায় খুরচা বাজারে এবং ঢাকাতে পাইকারী বিক্রি করে থাকেন। খুরচা বাজারে পনিরকে অনেক সময় ভোক্তার চাহিদা অনুসারে কেটে কেটে বিক্রি করা হয়। এছাড়াও কিছু প্রস্তুতকারক নিজ বাড়ীতে বসে পনির বিক্রি করে থাকেন।

ছানার পানির ব্যবহার

প্রতি ৪০ কেজি দুধ থেকে পনির তৈরির সময় উপজাত হিসাবে প্রায় ৩৫-৩৬ লিটার ছানার পানি পাওয়া যায়। এই পানির ২-৩ লিটারে প্রথম দিনের ভিজানো মাওয়া যোগ করে মাওয়ার পানি তৈরী করা যায়। এভাবে ভিজানো মাওয়া ৩ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও ছানার পানি মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

যে সকল অঞ্চলে দুধের দাম বেশী সেখানে পনির তৈরী না করাই ভাল। কারন এতে করে পনিরের উৎপাদন খরচ বেশী পড়বে।

উৎসঃ

*গাভী পালন গাইড - এ. টি. এম. ফজলুল কাদের

*উচ্চতর প্রাণি বিজ্ঞান - এস এম ইমাম হুসাইন

*প্রাণি খামার ও চিকিৎসা - এস এম ইমাম হুসাইন

*প্রাণি পালন - কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

* প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা - বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

মডিউল-২৫ ঃ
গবাদি প্রাণির রোগ ও স্বাস্থ্যবিধি

২৫.১.১ গবাদি প্রাণি সুস্থ থাকার লক্ষণ

- প্রাণি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি সর্তক থাকবে ও স্বাভাবিক ভাবে নড়াচড়া করবে।
- নাক, মুখ, চোখ পরিষ্কার ও উজ্জল থাকবে।
- শরীরের লোম মসৃণ ও চকচকে থাকবে।
- নাকের অগ্রভাগ ভেজা ভেজা ও বিন্দু বিন্দু ঘাম থাকবে।
- কান ও ওলান নড়াচড়া করে মশা-মাছি তাড়াবে।
- স্বাভাবিকভাবে খাওয়া দাওয়া করবে।
- জাবর কাটবে।
- পিপাসা স্বাভাবিক থাকবে।
- মল-মূত্র স্বাভাবিক থাকবে।
- শরীরের তাপ স্বাভাবিক থাকবে।

প্রাণি অসুস্থ হলে উপরোক্ত অবস্থার ব্যাতিক্রম দেখা যাবে এবং যে রোগে আক্রান্ত হবে সেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবে।

২৫.১.২ রোগ জীবাণু ছড়ানোর মাধ্যম

প্রাণির দেহে বিভিন্ন ভাবে জীবাণু প্রবেশ করতে পারে। সাধারণতঃ মুখ-গহ্বর, নাসারন্ধ্র, চামড়ার ক্ষত, যোনি পথ, মল-মূত্র ত্যাগের রাস্তা, বাঁটের ছিদ্র, চোখ ইত্যাদির মাধ্যমে রোগের জীবাণু দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। গবাদি প্রাণির রোগ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ জীবাণু ছড়ানোর উপায় সর্ম্পকে ধারণা থাকা দরকার। সাধারণতঃ নিম্নোক্তভাবে রোগ জীবাণু ছড়িয়ে থাকে।

১। **বাতাসের মাধ্যমে ঃ** অনেক মারাত্মক রোগের জীবাণু বাতাসের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন- ক্ষুরা রোগের জীবাণু ।

২। **জীব জন্তু ও কীট পতঙ্গের মাধ্যমে ঃ** কুকুর, বিড়াল, শৃগাল, বেজী, ইঁদুর, মশা, মাছি, বিভিন্ন কীট পতঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা রোগ জীবাণু ছড়াতে পারে।

৩। **বিভিন্ন ধরনের পাখীর মাধ্যমে ঃ** কাক, চিল, শকুন ইত্যাদি নানা রকমের পাখীর মাধ্যমে রোগ জীবাণু ছড়াতে পারে।

৪। **নদী, জলাশয়, বৃষ্টির পানি দ্বারা ঃ** প্রাণীর মৃতদেহ বা সংস্পর্শযুক্ত দ্রব্যাদি নদী, জলাশয় বা মাটিতে ফেলে রাখলে মৃতদেহ থেকে নিঃসৃত পদার্থ বা অন্যান্য দ্রব্যাদিতে লেগে থাকা রোগ জীবাণু পানির স্রোতে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

৫। **হাট বাজারের প্রাণি পাখী বা প্রাণিজাত দ্রব্যাদির মাধ্যমেঃ** অনেক সময় রোগাক্রান্ত বা সংস্পর্শযুক্ত প্রাণিপাখি বিক্রয়ের জন্য হাট বাজারে নেওয়া হয়। এ সকল প্রাণি পাখী পরিবহনের রাস্তা এবং বিক্রয় স্থলে রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। হাটে বাজারের অন্যান্য সুস্থ প্রাণি পাখী রোগাক্রান্তদের সংস্পর্শে এসে সংক্রামিত হয় এবং এইভাবে রোগ বিস্তার লাভ করে। তাছাড়াও আমাদের দেশের লোকজনের অজ্ঞতার কারণে হাট বাজার ও অন্যান্য স্থানে রোগাক্রান্ত প্রাণি পাখীর মাংশ বিক্রি হয়, এসবের মাধ্যমেও রোগ জীবাণু ছড়ায়।

৬। **প্রাণি পাখী বহনকারী যানবাহনের মাধ্যমে ঃ** বাস, ট্রেন,লঞ্চ , ষ্টীমার, নৌকা, প্রভৃতি যোগে প্রাণি পাখী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করার সময় রোগাক্রান্ত বা রোগের বাহক থেকে ঐ সব যান বাহনে রোগের জীবাণু লেগে যায় পরে অন্যান্য মালামাল, প্রাণি পাখী বা মানুষের মাধ্যমে তা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

৭। **প্রাণির চামড়া বা অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা ঃ** আমাদের দেশে রোগে মৃত প্রাণি পাখী সাধারণতঃ মাঠে ঘাটে ফেলে দেওয়া হয় যা কোন ক্রমেই উচিত নয়। এ সব প্রাণির চামড়া, হাড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি মুচি বা অন্য লোকজন বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যায়, মৃত প্রাণি যে রোগে মারা গাছে সে রোগের জীবাণু চামড়া, হাড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করে।

৮। **প্রাণি পাখীর পরিচর্যাকারী দ্বারা ঃ** রোগাক্রান্ত প্রাণির পরিচর্যাকারী তার দেহ, পোষাক পরিচ্ছদ ও আনুসংগিক সরঞ্জামাদি দ্বারা রোগের জীবাণু অন্যত্র ছড়াতে পারে।

৯। **পরিদর্শক দ্বারা ঃ** খামার দেখতে বা বেড়াতে আসা লোকজনের মাধ্যমেও রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে। যেখান থেকে তারা এসেছেন সেখানে সংক্রমক রোগের প্রাদুর্ভাব থাকলে সে সকল রোগের জীবাণু বিভিন্নভাবে তাদের সাথে আসে।

২৫.২.১ সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা

সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১। নতুন ক্রয় করা বা অন্য কোন ভাবে সংগৃহীত প্রাণিকে এনেই খামারের অন্যান্য প্রাণির সঙ্গে রাখা যাবে না। তিন সপ্তাহ সময় সেগুলোকে পৃথকভাবে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে যদি নতুন প্রাণির কোন রোগ লক্ষণ প্রকাশ না পায় তবেই খামারের পুরানো প্রাণির সঙ্গে রাখা যাবে।

২। বহিরাগত দর্শকদের খামারে প্রবেশের সময় পা জুতার তলা জীবাণুনাশক পদার্থ গুলানো পানিতে ডুবিয়ে নিতে হবে।

৩। যে সকল সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা পাওয়া যায় সে সকল রোগের টিকা সঠিক সময়ে নিয়ম মত দিতে হবে। নিজের খামারে টিকা প্রদানের সাথে সাথে পার্শ্ববতী খামার বা প্রাণি সমূহকেও একই টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪। প্রাণির খাদ্য টাটকা, নির্ভেজাল হতে হবে ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে নিজ খামারেই মিশ্রিত করতে হবে।
৫। কোন এলাকাতে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে সে এলাকার প্রাণি পাখী বা প্রাণি পাখী জাত দ্রব্যাদি হাটে বাজারে বা ঐ এলাকার বাইরে যাতে যেতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৬। খামারে বন্য জন্তু প্রবেশ ও চলাচল বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া মশা-মাছি ইঁদুর ও অন্যান্য কীট পতঙ্গ ধ্বংস করতে হবে।
৭। খামারের রোগাক্রান্ত প্রাণির চিকিৎসা করতে হবে, ভাল হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে তা জবাই করে প্রাণি চিকিৎসকের মতে মাংস খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলে প্রাণির মরদেহ মাটির নীচে পুঁতে রাখতে হবে বা পুঁড়িয়ে ফেলতে হবে।

২৫.২.২ সংক্রামক রোগ দেখা দিলে গৃহীত ব্যবস্থা সমূহ

১। পৃথক করণ ঃ খামারে বা কোন বাড়িতে রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোগাক্রান্ত প্রাণি পৃথক করতে হবে ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রাণির কাজ কর্ম করার জন্য যদি একজন লোকই থাকে তবে প্রথমে সুস্থ প্রাণির কাজ কর্ম ও খাদ্য প্রদান করে অসুস্থ বা আক্রান্ত প্রাণির সেবা করতে হবে। যদি কোন প্রাণি রোগাক্রান্ত বলে সন্দেহ হয় তাকে পৃথক করে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।
২। আক্রান্ত প্রাণির চিকিৎসা অথবা নির্মূল করণ ঃ যে সকল রোগের চিকিৎসা আছে এবং চিকিৎসা করলে ভাল হয়ে যায় সে সকল ক্ষেত্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে, কিন্তু যে রোগের চিকিৎসা করলেও পরিপূর্ণভাবে ভাল হয় না এবং রোগের বাহক হিসাবে প্রাণিটির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে সে সব প্রাণিকে জবাই করে মৃতদেহ পুঁড়িয়ে অথবা মাটির নীচে পুঁতে রাখতে হবে।
৩। রোগাক্রান্ত এলাকার প্রাণি বিক্রয় না করা ঃ রোগ দেখা দিলেই অনেক লোকের মধ্যে রোগাক্রান্ত প্রাণি পাখী বাজারে বিক্রয়ের প্রবণতা দেখা যায়, এর ফলে রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ প্রবণতা অবশ্যই রোধ করতে হবে। রোগাক্রান্ত এলাকার প্রাণি পাখী যেন বাজারে বা রাস্তায় বের না হতে পারে সেদিকে সবার দৃষ্টি রাখতে হবে।

৪। রোগাক্রান্ত প্রাণি ও তার পরিচর্যা ঃ রোগাক্রান্ত প্রাণির সেবা বা আনুসাংগিক ব্যবস্থাপনা ভিন্ন লোক দ্বারা করানোই ভাল। রোগাক্রান্ত প্রাণির ঘরের সমস্ত কিছু পৃথক থাকতে হবে এবং তা সুস্থ প্রাণির ঘরে কখনই আনা যাবে না। রোগাক্রান্ত প্রাণির ঘরের ময়লা, আবর্জনা, খড়-কুটা সবই পুড়িয়ে ফেলাই উত্তম না হলে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে। প্রতিদিন ঘরে সুবিধাজনক কোন জীবাণু নাশক যেমন-স্যাভলন, আইওসান, ফিনাইল বা ডেটল ব্যবহার করতে হবে।
৫। মৃত দেহের সৎকার ঃ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত প্রাণি মারা গেলে তার দেহে প্রচুর পরিমাণে সংশিষ্ট রোগের জীবাণু থাকে। রোগে মরা প্রাণির মৃতদেহ পুঁড়িয়ে ফেলাই উত্তম না পারলে অবশ্যই মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। মৃত প্রাণির ঘরের সকল আসবাবপত্র সহ সংশিষ্ট অন্যান্য সকল কিছু এমনকি ঘরের দেওয়াল, বেড়া, সিলিং, সব কিছু জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে এবং এই ঘরে সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন সুস্থ প্রাণি না তুলে কমপক্ষে ২-৩ সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। মৃত প্রাণি ঘর থেকে বের করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রাণির দেহ থেকে কোন পদার্থ না পড়ে। এই সকল পদার্থে প্রচুর জীবাণু থাকে। সংক্রামক রোগে আক্রান্ত মৃত প্রাণির চামড়া ছাড়ানো যাবে না। মৃত দেহ মাটিতে পোঁতার পর খেয়াল রাখতে হবে যেন কুকুর, শেয়াল বা অন্য কোন বন্য জন্তু তা তুলে না ফেলে। মাটি চাপা দেওয়ার আগে মৃত দেহের উপর চুন, সোডা অথবা ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়।

৬। প্রচার ঃ সংক্রামক রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে এলাকার জন সাধারণকে সে রোগ সম্পর্কে সচেতন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য ঢোল, মাইক, প্রয়োজনে পত্র-পত্রিকায়, বেতার বা টেলিভিশনে প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

২৫.৩ গবাদি প্রাণির সংক্রামক রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার

ভাইরাসজনিত রোগ

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
১। ক্ষুরারোগ	এক ধরনের অতি সূক্ষ্ণ ভাইরাস দ্বারা হয়। এ রোগ মারাত্মক ছোঁয়াচে। আক্রান্ত প্রাণি, খাদ্য, পানি, বায়ু এমনকি কাপড়-চোপড় ও মানুষের মাধ্যমে ছড়ায়	মুখে, জিহ্বায় ও ক্ষুরায় ফোস্কা পড়ে। পরে ফোস্কা ফেটে ঘা হয়। মুখ দিয়ে লালা ঝরে। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। প্রাণি খেতে, হাঁটতে ও কাজ করতে পারে না। প্রাণি দুর্বল হয়ে যায়। গাভীর দুধ কমে যায়। এ রোগে বাছুরের মৃত্যুর হার বেশি।	অসুস্থ প্রাণিকে সুস্থ প্রাণি থেকে আলাদা রাখা। সুস্থ সকল প্রাণিদের ক্ষুরা রোগের টিকা দেয়া। প্রতিদিন গোয়াল ঘর জীবাণুনাশক যেমন ডেটল বা ফিনাইল দ্বারা ভালোভাবে ধুয়ে দেওয়া। প্রাণিকে নরম খাদ্য সরবরাহ করা ও ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করা।
২। জলাতঙ্ক	ভা্ইরাস জনিত একটি মারাত্মক রোগ। কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী এ ভাইরাস বহন করে। আক্রান্ত প্রাণীর লালায় এ ভাইরাস থাকে ও কামড়ের মাধ্যমে গবাদি প্রাণি আক্রান্ত হয়।	রোগের লক্ষণ দুরকম যথা (১) পাগলামী ভাব ও (২) নিস্তেজ ভাব। পাগলামী ভাবে প্রাণি অন্য প্রাণিকে আক্রমণ করতে চায়। মুখ দিয়ে লালা ঝরে ও পরে আস্তে আস্তে পক্ষাঘাত দেখা যায়। নিস্তেজ অবস্থায় প্রাণি চুপচাপ থাকে। প্রথমে পিছনের অংশ অবশ হয়ে যায়। উভয় অবস্থাতেই প্রাণির চোয়ালের অবশতা দেখা দেয়। জিহ্বা ঝুলে পড়ে দৃষ্টি শূন্যতা দেখা যায় ও কিছুই গিলতে পারে না।	এ রোগে চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। প্রাণির আক্রান্ত স্থানে সাথে সাথে সাবান বা সাইট্রিক এসিড দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। বেওয়ারিশ কুকুরকে মেরে ফেলতে হয় ও পোষা প্রাণীদেরকে প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।
৩। গো-বসন্ত	এটি ভাইরাস জীবাণু দ্বারা ঘটিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। আক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শে, খাদ্য, পানি, বাতাস, শ্বাস-প্রশ্বাস, গোয়ালার হাত, মশা-মাছির মাধ্যমে সুস্থ গবাদি প্রাণি আক্রান্ত হয়।	শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। মুখে ও খাদ্য নালীতে ঘা হয় পায়খানা প্রথমে শক্ত ও পরে পাতলা হয়। মুখে দুর্গন্ধ হয়। শ্বাসকষ্ট হয়। নাক ও চোখ দিয়ে স্রাব ঝরে। প্রাণির খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আক্রান্ত প্রাণি ২৪ ঘন্টা থেকে ৭ দিনের মধ্যে মারা যায়।	আক্রান্ত প্রাণিকে আলাদা ঘরে রাখা। সুস্থ প্রাণিকে নিয়মিত টিকা দেয়া ও স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালন ব্যবস্থা করা।
৪। রিন্ডার পেস্ট	এটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে ভাইরাস জনিত রোগ। আক্রান্ত প্রাণির সংস্পর্শে, শ্বাস-প্রশ্বাস, মলমূত্র, খাদ্যদ্রব্য, পানি, বায়ু দ্বারা সুস্থ গবাদি প্রাণি আক্রান্ত হয়।	জ্বর হয়, চোখ, নাক মুখ দিয়ে পানি ঝরে ও নাকের পর্দা রক্তাভ হয়। মুখ দিয়ে লালা ঝরে। দুগন্ধযুক্ত আম ও রক্ত মিশ্রিত ডায়রিয়া হয়। দেহের তাপমাত্রা কমে যায় ও প্রাণি ৭ দিনের মধ্যে মারা যায়।	আক্রান্ত প্রাণিকে আলাদা রাখা, সুস্থ প্রাণিকে নিয়মিত টিকা দেয়া ও গোয়াল ঘরে জীবাণুনাশক ব্যবহার করা।

২৫.৪ ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
১। তড়কা	*Bacillus anthracis* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়। এ রোগের জীবাণু মাটি থেকে সরাসরি ঘাস বা অন্য খাদ্যের সাথে মুখ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। আক্রান্ত প্রাণী হঠাৎ মারা যায় ও মৃত্যুর হার বেশি	অতি তীব্র প্রকৃতির হলে প্রাণি দ্রুত নিঃশ্বাস নেয় ও দেহ মাটিতে ঢলে পড়ে এবং খিচুনি দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যায়। তীব্র প্রকৃতির হলে প্রাণির জ্বর আসে, তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ক্ষুধামন্দা নিস্তেজ ও পেট ফাঁপা দেখা যায়। দ্রুত নিঃশ্বাস নেয় ও কাঁপতে থাকে। রক্ত মিশ্রিত পাতলা পায়খানা হয়। নাক, মুখ ও মল দ্বার দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়। রক্ত জমাট বাঁধে না।	এ রোগের জীবাণু সহজে মরে না বলে মৃত প্রাণিকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হয় বা পুড়ে ফেলতে হয়। রক্ত জমাট বাঁধে না বলে দেহে ও রক্তাক্ত মাটিতে জীবাণুনাশক ব্যবহার করতে হবে। আক্রান্ত প্রাণিকে আলাদা রাখতে হবে ও সুস্থ প্রাণিকে টিকা দিতে হবে।
২। বাদলা	*Clostridium chauvoei* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়। বর্ষাকালে ও ২ মাস থেকে ২ বছর বয়সের প্রাণিতে বেশি হয়। খাদ্য ও পানির মাধ্যমে এ রোগ সংক্রমিত হয়। এ রোগের জীবাণু স্পোর সৃষ্টি করে মাটিতে ৩-৪ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।	অতি তীব্র প্রকৃতির হলে প্রাণি হঠাৎ মারা যায়। তীব্র প্রকৃতির হলে ক্ষুধামন্দা জ্বর, পেটে গ্যাস, নাকের শ্লেস্মা দেখা যায়। প্রাণির পায়ের মাংসপেশী আক্রান্তের ফলে প্রাণি হাঁটতে পারে না ও খুঁড়িয়ে হাঁটে এবং মাংস পেশীতে চাপ দিলে পচ্ পচ্ শব্দ হয়।	আক্রান্ত প্রাণিকে আলাদা রাখতে হবে। মৃত দেহ মাটির নিচে পুঁতে রাখা বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সেঁতস্যাঁতে এলাকা চারণভূমি বা বাসস্থানের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। বর্ষার ২ মাস পূর্বে ৬ মাস থেকে ২ বছরের সকল প্রাণিকে টিকা দিতে হবে।
৩। গলা ফুলা	*Pasteurella multocida* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়। সকল বয়সের প্রাণিই আক্রান্ত হয়। বর্ষার পর সেঁতস্যাঁতে জমিতে চরালে এ রোগ বেশি হয় অসুস্থ প্রাণির সংস্পর্শ, লালা, মলমূত্র, দূষিত খাদ্য ও পানি দ্বারা এ রোগ ছড়ায়।	অতি তীব্র প্রকৃতির হলে, হঠাৎ করে প্রাণির জ্বর আসে, তাপমাত্রা বেড়ে যায়, ক্ষুধামন্দা হয়, নাক, মুখ দিয়ে লালা ঝরে ও ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রাণি মারা যায়। তীব্র প্রকৃতির হলে উপরের লক্ষণ ছাড়াও প্রথমে গলার নিচে, পরে চোয়াল, বুক পেট ও কানের অংশ ফুলে যায়। শ্বাস নিতে কষ্ট হয় গলা বাড়িয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়।	অসুস্থ প্রাণিকে আলাদা রাখা ও সালফোনিলামাইড জাতীয় ইনজেকশন ব্যবহার করা। মৃতদেহ সৎকার করা। সব সুস্থ প্রাণিকে সুস্থ অবস্থায় নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা দেয়া।
রোগের নাম	**কারণ**	**লক্ষণ**	**প্রতিকার**
৪। ম্যাসটাইটিস বা ওলান প্রদাহ	*Streptococcus genus* ব্যকটেরিয়া, ফাংগাস ও মাইকোপ্লাজমা দ্বারা হয়। অস্বাস্থ্যকর সেঁতস্যাঁতে বাসস্থান ময়লা হাতে দোহন, বাঁটে বা ওলানে আঘাত, ওলানে দুধ জমাট বেঁধে থাকা ইত্যাদি কারণে রোগজীবাণু সংক্রমিত হয়ে রোগ সৃষ্টি করে অর্থাৎ সংক্রমিত ওলান ও দূষিত পরিবেশ এ রোগ সৃষ্টি করে।	অতি তীব্র রোগের ক্ষেত্রে দুধের পরিবর্তন লক্ষণীয়, দুধ পাতলা ও কিছু জমাট বাঁধা হবে। ওলান লাল হয়ে ফুলে যায় ও গরম হয়। প্রাণি ব্যথা অনুভব করে ও তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ক্ষুধামন্দা, অবসাদভাব, জ্বর ইত্যাদি হয়। দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির হলে দুধের পরিমাণ কমে যায় ও ক্রমান্বয়ে দুধ ছানার মত ছাকা ছাকা হয়।	অসুস্থ প্রাণিকে সুস্থ প্রাণি থেকে আলাদা করা। গোয়াল ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। এ রোগ প্রতিরোধ করা খুব কঠিন, কারণ ওলানে কোন এন্টিবডি তৈরি হলে তা দুধের মাধ্যমে বের হয়ে যায়।

২৫.৫ গবাদি প্রাণির পরজীবী ঘটিত, অপুষ্টি জনিত ও বিষক্রিয়া জনিত ও অন্যান্য রোগসমূহের কারণ লক্ষণ ও প্রতিকার

১। পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগসমূহ

(ক) দেহাভ্যন্তরের পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগসমূহ

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
(১) পাকান্ত্রিক গোলকৃমি রোগ	গোলকৃমি দ্বারা সৃষ্টি রোগ। কৃমির ডিম, ভ্রূণযুক্ত কৃমির ডিম, কৃমির লার্ভায়, দূষিত পানি ও খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে বড় প্রাণিতে এবং লার্ভাযুক্ত শাল দুধের মাধ্যমে বাছুর আক্রান্ত হয়।	ডায়রিয়া, ক্ষুধামন্দা। ভগ্নস্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রকাশ পাওয়া । বাড়ন্ত প্রাণির বৃদ্ধি কমে যায়। বয়স্ক প্রাণির উৎপাদন কমে যায় ও রক্ত শূন্যতা দেখা যায়।	গোয়াল ঘর, আশপাশের জায়গা ও চারণভূমি পরিষ্কার রাখা। গোয়াল ঘরে নিয়মিত চুন ব্যবহার করা ও জলাবদ্ধ জমিতে প্রাণিকে চরানো যাবে না।
(২) হ্যাম্পসোর	*Stephanofilaria assamensis* প্রজাতির কৃমি দ্বারা এ রোগ হয়। হাম্পে এ রোগ বেশি হয়। মাছির মাধ্যমে ছড়ায়।	চর্ম প্রদাহ হয়, চামড়ার গুণগত মান ও মূল্য কমে যায়। গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যায়।	ক্ষতস্থানে মাছি না বসতে পারা, ক্ষতস্থান পলিথিন বা কাপড় দ্বারা ঢেকে দেয়া, মাছি তাড়ানো ঔষধ বা তারপিন তৈল ব্যবহার করা। নেগুভোন মলম ব্যবহার করে কৃমি ধ্বংস করা।

(খ) পাতাকৃমি দ্বারা সৃষ্ট রোগসমূহ

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
(১) ফ্যাসিওলিয়াসিস	পাতাকৃমি ঃ ফ্যাসিওলিয়া প্রজাতির	প্রাণি শুকিয়ে যাওয়া, ডায়রিয়া, রক্ত স্বল্পতা ও সাব-ম্যান্ডিবুলার এডিমা দেখা যায়।	কৃমির মাধ্যমিক পোষক ধ্বংস করা ও কৃমি নাশক খাওয়ানো এবং প্রাণিকে সংক্রামণ থেকে মুক্ত রাখা।
(২)প্যারামফিস্টোমিয়াসিস	প্যারামফিস্টোমাস প্রজাতির পাতা কৃমি দ্বারা হয়।	ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা, ডায়রিয়া, বদহজম হয়।	ঐ
(৩)সিস্টোসোমিয়াসিস/ স্নোরিং ডিজিজ	সিস্টোসোমা প্রজাতির পাতা কৃমি দ্বারা সৃষ্ট হয়।	ডায়রিয়া, মলে রক্ত ও মিউকাস থাকে। ক্ষুধামন্দা, রক্তাল্পতা ও নিস্তেজভাব দেখা যায়। প্রাণি নাক ডাকে ও ঘড় ঘড় শব্দ হয়।	ঐ
(গ) ফিতাকৃমি সৃষ্ট রোগসমূহ			
রোগের নাম	**কারণ**	**লক্ষণ**	**প্রতিকার**
টেনিয়াসিস	টেনিয়া প্রজাতির ফিতাকৃমি দ্বারা সৃষ্ট	হৃৎপিন্ড সিস্ট, হৃৎপিন্ডে প্রদাহ ও হৃৎপিন্ডের অকৃতকার্যতা ঘটে।	কৃমিনাশক প্রতিশোধক ব্যবহার
(ঘ) প্রোটোজোয়া সৃষ্ট রোগ			
ব্যাবেসিওসিস	ব্যাবেসিয়াগণ ভুক্ত আঁটুলি দ্বারা সৃষ্ট।	আক্রান্ত প্রাণির জ্বর, রক্তাল্পতা ও হেমোগ্লোবিনইউরিয়া দেখা যায়	আক্রান্ত প্রাণির সুষ্ঠু চিকিৎসা ও বাহক (আটুলি) নিয়ন্ত্রণ।
(ঙ) বহিঃদেহের পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগসমূহ			
(১)উকুন রোগ বা পেডিকুলোসিস	উকুন দ্বারা সৃষ্ট হয়	অল্প আক্রমণে তেমন লক্ষণ বোঝা যায় না তবে মাঝারি প্রকৃতিতে দীর্ঘমেয়াদী চর্ম প্রদাহ হয়। চুলকানি, ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা, ওজন হ্রাস ও বাছুরের লোম পড়ে যায়।	প্রাণির দেহ ব্রাশ করা, গোসল করানো, উকুন হাত দিয়ে মেরে ফেলা ও গোয়াল ঘরে ধোঁয়া দেয়া।

(২) আঁটুলির আক্রমণ	আঁটুলি	অ্যানিমিয়া, অস্বস্তি বোধ, খাদ্য গ্রহণ হ্রাস, দৈহিক ওজন ও দুধ উৎপাদন কমে যায়। চুলকানি, রক্ত জমাট বাঁধা দাগ দেখা যায়, আঁটুলি বিভিন্ন রোগের বাহক হয়।	প্রাণির দেহ ব্রাশ ও গোসল করানো, আঁটুলি ধরে মেরে ফেলা ও গোয়াল ঘরে ধোঁয়া দেওয়া।
(৩) মেঞ্জ	মাইটের আক্রমণ দ্বারা সৃষ্ট	চর্ম প্রদাহ, চুলকানি, লোম পড়া, খাদ্য গ্রহণ কমে যাওয়া, দুর্বল,স্বাস্থ্যহানী, চামড়া নষ্ট হয় ও পুঁজ সৃষ্টি হয়।	ঐ

২। অপুষ্টি ও বিপাকীয় রোগসমূহ

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
(ক) দুগ্ধ জ্বর	রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যাওয়া।	ক্ষুধামন্দা, উত্তেজিত ভাব, মাথা ও পা কাঁপা, দাঁড়িয়ে থাকা, হাঁটতে গেলে টলতে থাকা, পিছনের পায়ের দুর্বলতার কারণে শুয়ে পড়া। পা গুলো ছড়াতে থাকে যা থলথলে ও দুর্বল দেখায়।	ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড খাওয়ানো, দানাদার খাদ্যের সাথে ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম খাওয়ানো।
(খ)কিটোসিস	গর্ভবতী গাভীর শর্করা খাদ্যের ত্রুটিপূর্ণ বিপাকের কারণে সৃষ্ট বিপাকীয় রোগ। রক্তে গ্লুকোজের অভাব, খাদ্যে শর্করা জাতীয় খাদ্যের অভাবে এ রোগ হয়।	ক্ষুধামন্দা, দুধ উৎপাদন কম, দানাদার খাদ্য খাওয়া বন্ধ করে কিন্তু খড় খেতে থাকে। খাদ্য গ্রহণে অনিহা, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, গাভীর শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রস্রাব ও গোয়াল ঘরে অ্যালকোহলিক গন্ধ থাকে। সবকিছু অহেতুক চাটতে থাকে, টলমল করে। দাঁড়াতে পারে না, দেহে কাঁপুনি ও খিচুনি থাকে।	গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ ইনজেকশন দিয়ে প্রতিরোধ করা যায়।
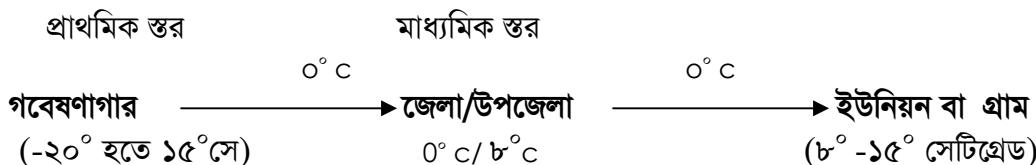
৩। বিষক্রিয়া

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
নাইট্রেট ও নাইট্রাইট বিষক্রিয়া	শ্যামা, হেলেঞ্চা, বোরা ইত্যাদি নাইট্রেট যুক্ত ঘাস খেয়ে। ভূট্টা গেইচা, মূলা, সরিষাতে ৩% এবং নেপিয়ারে ৯.৮% নাইট্রেট থাকে বিধায় এসব ঘাস খাওয়ানো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।	লালাক্ষরণ, ডায়রিয়া ও শ্বাসকষ্ট দেখা যায়, পেশীর কম্পন, দুর্বলতা, টলমল অবস্থা ও পরে মাটিতে শুয়ে পড়ে ও খিচুনি হয়।	১% এর অধিক নাইট্রেট যুক্ত ঘাস প্রাণিকে না খাওয়ানো ও কাঁচা ঘাসের সাথে খড় মিশিয়ে খাওয়ানো।
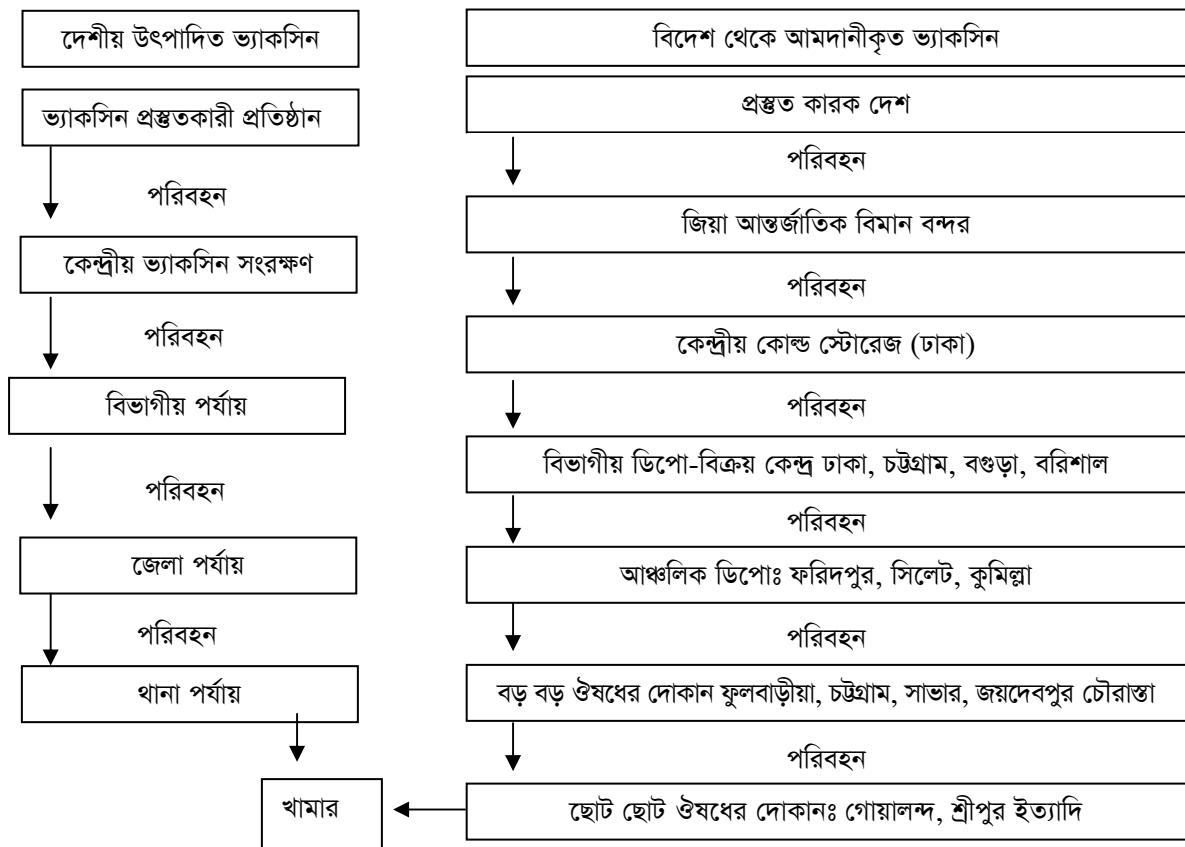
২৫.৬ গবাদি প্রাণির বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদানের শিডিউল, টিকা সংরক্ষণ ও ব্যবহারবিধি

টিকা সংরক্ষণ

সঠিক পদ্ধতিতে টিকা সংরক্ষণ না করলে টিকার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। টিকার বোতলের গায়ে বা অন্য কাগজে সংরক্ষণ নির্দেশনা লেখা থাকে। যে টিকা হিমু শুষ্ক অবস্থায় ভায়েলে থাকে সেগুলো শূন্য ডিগ্রির নিচের তাপমাত্রায় রেফ্রিজারেটরে বা ডিপফ্রিজে রাখতে হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকা ব্যবহার করা উচিত নয়। টিকা কোল্ড চেইন সিস্টেমের মাধ্যমে ল্যাবরেটরী/গবেষণাগার থেকে গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে। এটি নিম্নরূপে ঘটে।

প্রাথমিক স্তর — মাধ্যমিক স্তর

গবেষণাগার —($0^\circ C$)→ **জেলা/উপজেলা** —($0^\circ C$)→ **ইউনিয়ন বা গ্রাম**

(-২০° হতে ১৫°সে) — $0^\circ C$/ ৮°C — (৮° -১৫° সেটিগ্রেড)

পরিবহনে ত্রুটি হলে টিকা বীজের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। কোল্ড চেইন এর উপাদান যেমন মানুষ, যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল। কোল্ড চেইন সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন কোল্ড রুম, ফ্রিজার রুম, রেফ্রিজারেটর রুম, ডিপ ফ্রিজার, আইস প্যাক ফ্রিজার, কোল্ড বক্স, ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার, আইস প্যাক, রেফ্রিজারেট ও ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি। টিকা শীতল করে জেলা সদরে সরবরাহ করে শীতল কক্ষে বা ছোট ছোট ফ্লাস্কে বরফ দিয়ে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। টিকা প্রয়োগের সময়সীমা পর্যন্ত টিকার শীতলতা বজায় রাখতে হয়। নতুবা টিকার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

চিত্র ঃ কোল্ড চেইনের ধাপ

টিকার সঠিক ব্যবহারের জন্য বিবেচ্য বিষয়

১। যথাযথ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা ।

২। ভ্যাকসিনের শিশি বা ভায়াল কখনোই সরাসরি সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসবে না।

৩। সকালে অথবা সন্ধ্যায় যখন সূর্যের আলোর তীব্রতা কম থাকে তখনই টিকা প্রদান কর্মসূচি শুরু করতে হবে।

৪। সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এড়িয়ে প্রস্তুতকারক কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ মতো টিকা তৈরি করতে হবে।

৫। টিকা গোলানোর পর অতিদ্রুত ছায়াযুক্ত স্থানে বসে টিকা সঠিক পদ্ধতিতে ও সঠিক মাত্রায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে প্রয়োগ করা উচিত।

৬। অসুস্থ গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগিকে কখনোই টিকা প্রদান করা উচিত নয়।

৭। শীতকালে ভ্যাকসিন তৈরির ২ ঘন্টার ও গরম কালে ১ ঘন্টার ভিতর প্রয়োগ করতে হয়। টিকা প্রদানের বিলম্ব হলে গোলানো টিকার পাত্রের পাশে কিছুক্ষণ পর পর ঠান্ডা পানি অথবা বরফের টুকরা রাখতে হবে।

সারণী ২৫.১ গবাদি প্রাণির বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদানের শিডিউল

টিকার নাম	মাত্রা	কতদিন পর পর	কোন বয়সে	প্রয়োগ	সংরক্ষণ তাপমাত্রা
১	২	৩	৪	৫	৬
তড়কা	গরু/মহিষ/ ঘোড়া ১ সিসি	১ বছর	৪ মাস	ত্বকের নিচে	৪° সে.
বাদলা	বাছুর ৫ সিসি, ভেড়া/ছাগল ২ সিসি	৬ মাস	৪ মাস	ত্বকের নিচে	৪-৮° সে.
ক্ষুরারোগ ক)মনোভ্যালেন্ট খ) বাই ভ্যালেট	 ৩২ মাত্রা ভায়েল ১৬ মাত্রা ভায়েল	৪ মাস	৪ মাস	ত্বকের নিচে	৪-৮° সে.
গলাফুলা	গরু ও মহিষ ২ সিসি	১ বছর	৬ মাস	ত্বকের নিচে	২-৪° সে.
রিন্ডারপেস্ট	গরু ও মহিষ ১ সিসি	কয়েক বছর	প্রতি বছর	ত্বকের নিচে	৪-৮° সে.
জলাতঙ্ক	কুকুর ৩ সিসি; গরু, মহিষ, বানর-৬ সিসি; বিড়াল-১.৫ সিসি	১ বছর		মাংসে	-২০° সে.
অ্যান্টি র‍্যাবিস	ক) কুকুর/বিড়াল (৩০ পাঃ ওজন)-৫ সিসি/দিন-৭ দিন খ) কুকুর/বাছুর/ভেড়া/ছাগল-১০ সিসি/দিন-৭ দিন গ) ঘোড়া/গাভী/মহিষ-৩০ সিসি/দিন ১৪ দিন ঘ) বকনা/গাধা-২০ সিসি/দিন-১৪ দিন ঙ) হাতি/উট-৬০ সিসি/দিন-১৪ দিন	১ বছর (১ মাস পর বুষ্টার ডোজ)		মাংসে	-২০° সে.

উৎসঃ
*গাভী পালন গাইড - এ. টি. এম. ফজলুল কাদের
*প্রাণি পালন - কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
*প্রাণি সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা - ১২১২

মডিউল-২৬ ঃ
গবাদি প্রাণির মলমূত্র ও বর্জ্য হতে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

বায়োগ্যাস কি?

গোবর ও অন্যান্য পচনশীল পদার্থ বাতাসের অনুপস্থিতিতে পঁচানোর ফলে যে রং বিহীন জ্বালানি গ্যাস তৈরি হয় তাকে বায়োগ্যাস বলা হয়। এতে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ মিথেন থাকে যা জ্বালানি গ্যাস হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বাকীটা মূলতঃ কার্বন-ডাই-অক্সাইড। গ্যাস উৎপাদনের পর যা অবশিষ্ট থাকে (বায়োগ্যাস রেসিডিউ) তা উন্নতমানের জৈব সার।

বায়োগ্যাস কেন?

সাধারণত গোবর, আবর্জনা ও অন্যান্য পঁচনশীল পদার্থকে শুকিয়ে জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা হয়। এতে কাপড়-চোপড়, হাঁড়ি-পাতিল ও অন্যান্য আসবাবপত্র ময়লা হয় এবং রান্না-বান্নায় প্রচুর সময় নষ্ট হয়। উপরোক্ত পদার্থগুলো থেকে যে মূল্যবান সার কৃষি কাজে ব্যবহার করার জন্য পাওয়া যেত, তা পোড়ানোর ফলে নষ্ট হয়ে যায়। এ সমস্ত পদার্থকেই বায়োগ্যাস প্লান্টে পঁচিয়ে গ্যাস পাওয়া যায় এবং এটাকে সহজেই জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা যায়। বায়োগ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের ফলে হাঁড়ি-পাতিল, কাপড়-চোপড় ও আসবাবপত্র ময়লা হয় না এবং রান্না-বান্নার সময় ও শ্রম কম লাগে। রাতে বাতি জ্বালাবার জন্য কেরোসিনের দরকার হয় না, ম্যান্টল জ্বালিয়ে হ্যাজাক লাইটের মত আলো পাওয়া যায়। উপরন্তু গ্যাস উৎপাদনের পর প্লান্ট থেকে বেরিয়ে আসা পদার্থকে ভাল সার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

স্থিরডোম মডেলের সুবিধা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাধারণত দুই মডেলের প্লান্ট চালু আছে। যথাঃ ভাসমান ডোম মডেল। ভাসমান ডোম মডেলে এম এস সীটের তৈরি গ্যাস হোল্ডার দরকার হয় বিধায় খরচ বেশি এবং ক্ষয়জনিত কারণে স্থায়ীত্বকাল কম। কিন্তু স্থিরডোম মডলে কোন মেটালের দরকার পড়ে না। শুধু ইট, বালি এবং সিমেন্ট দিয়ে এই প্লান্ট নির্মাণ করা যায়। ফলে, খরচ হয় কম, তদুপরি দীর্ঘস্থায়ী। একবার লিকমুক্ত ভাবে তৈরি করা গেলেই তা নির্বিঘ্নে কমপক্ষে ৩০ বছর চালু থাকে। বায়োগ্যাস পাইলোট প্লান্ট প্রকল্প জ্বালানি গবেষনা ও উন্নয়ন ইন্ষ্টিটিউটে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৯১ সনে দেশোপযোগী স্থির ডোম মডেল প্লান্ট স্থাপন করে।

বায়োগ্যাস প্লান্টের স্থান নির্বাচন

বায়োগ্যাস প্লান্ট সাধারণত দুর্ঘটনামুক্ত এবং এই প্লান্টে দুর্গন্ধ বা মশ-মাছির উপদ্রবের সম্ভাবনা না থাকায় এটা রান্না ঘরের কাছেই বানানো যেতে পারে। অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এর খুব নিকটে বড় গাছ না থাকে, কারণ গাছের শিকড় প্লান্টের দেয়ালে ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। বড় গর্ত, নদী বা খাল ইত্যাদির সন্নিকটের প্লান্ট স্থাপন সঙ্গত হবে না।
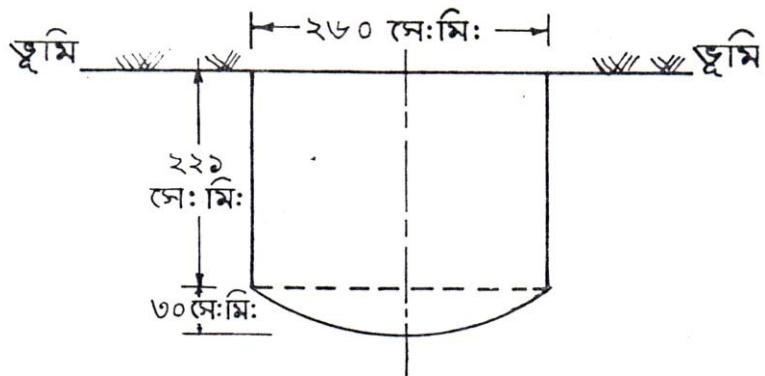
বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরির জন্য প্রথমেই যা আবশ্যক

বায়োগ্যাস প্লান্ট বানাতে ইচ্ছুক ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠানের গরু/মহিষ/হাঁস-মুরগী ইত্যাদি থাকতে হবে। ৭/৮ জন লোকের দৈনিক রান্নাবান্না ও বাতি জ্বালানোর জন্য ৫/৬টি বড় গরুর গোবর প্রয়োজন। মানুষের মল মূত্র ও গ্যাস উৎপাদনের জন্য বায়োগ্যাস প্লান্টে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭/৮ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য ১০৫ (৩ঘনমিটার) ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনোক্ষম স্থিরডোম বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ পদ্ধতি।
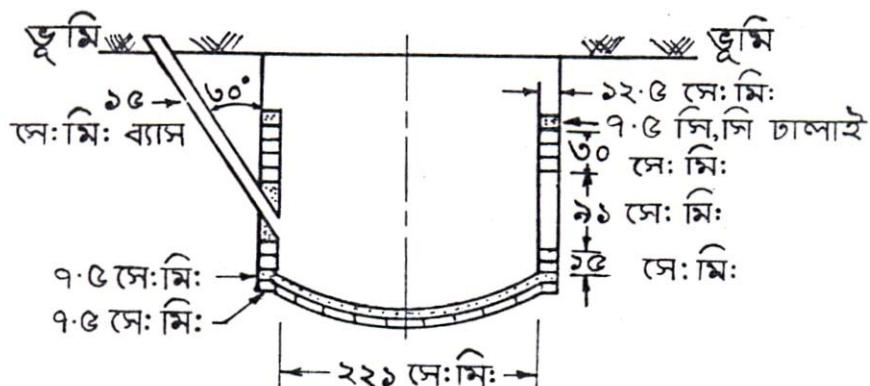
ডাইজেষ্টার তৈরি পদ্ধতি

২৬০ সেমি ব্যাস এবং ২২১ সেমি গভীর একটি গোলাকার কুয়া খনন করতে হবে। কুয়ার তলদেশ চাড়ির তলার আকৃতিতে খনন করতে হবে যাতে চাড়ির তলার মধ্য বিন্দু থেকে আর্চের উচ্চতা ৩০ সেমি (১ ফুট) হয় (চিত্র নং ২৬.১)। এরপর তলদেশে ভাল করে দুরমুজ করে নিতে হবে। তলদেশে ৭.৫ সেমি পুরু ইট বিছিয়ে দিতে হবে। এই
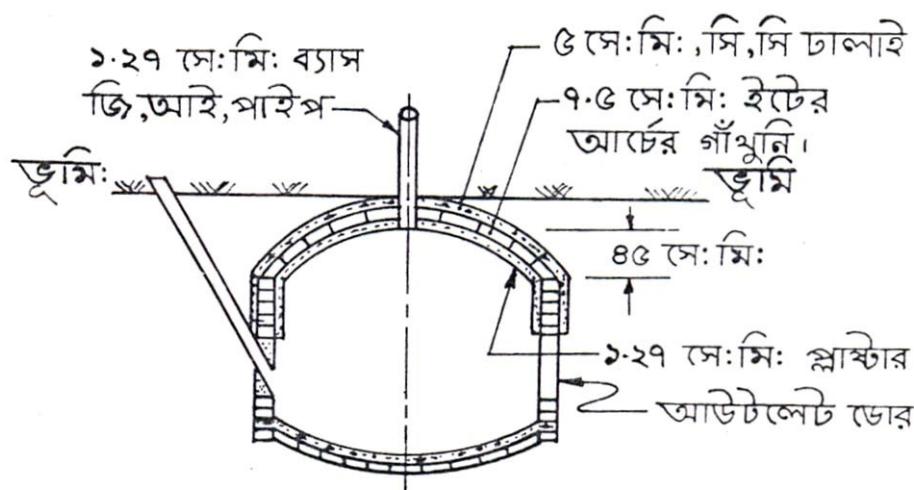
চিত্র ২৬.১

সোলিং এর উপরে ১ঃ ৩ঃ ৬ (সিমেন্ট ঃ বালু ঃ খোয়া) অনুপাতে ৭.৫ সেমি পুরু ঢালাই দিতে হবে। ঢালাই এর উপরে ২২১ সেমি ব্যাস (ভিতরে) রেখে গোলাকৃতি ১২.৫ সেমি ইটের দেয়ালের গাঁথুনি শুরু করতে হবে। দেয়ালের উচ্চতা যখন ১৫ সেমি হবে তখন কুয়ার একদিকে আউটলেট ডোর এর জন্য ৯১ সেমি×৯১ সেমি এবং অন্যদিকে (আউটলেট ডোর ৯০° কোনে) ইনলেট পাইপ বসানোর জন্য ২০ সেমি×২৫ সেমি গাঁথুনি খোলা রাখতে হবে (চিত্র নং২৬.২)। ১৫ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট, একটি আরসিসি/পিভিসি পাইপ (ইনলেট পাইপ) দেয়ালের সঙ্গে

চিত্র ২৬.২

আনুমানিক ৩০° কোণ রেখে বসিয়ে নিতে হবে। দেয়ালের কাজ মোট ১০৬ সেমি হলে আউটলেট ডোম এর কাজ শেষ হবে। দেয়ালের কাজ পুনরায় শুরু করে আউটলেট ডোর এর উপরিভাগ থেকে ৩০ সেমি পর্যন্ত গেঁথে নিতে হবে। এখন দেয়ালের উপরিভাগে ১ঃ ২ঃ ৪ অনুপাতে ৭.৫ সেমি পুরু ঢালাই দিতে হবে। এই ঢালাই এর উপর ৭.৫ সেমি পুরু ইটের গাঁথনি দিয়ে ৪৫ সেমি আর্চ উচ্চতা (ভিতরে) বিশিষ্ট গম্বুজ আকৃতির ডোম তৈরি করতে হবে (চিত্র নং ২৬.৩)।
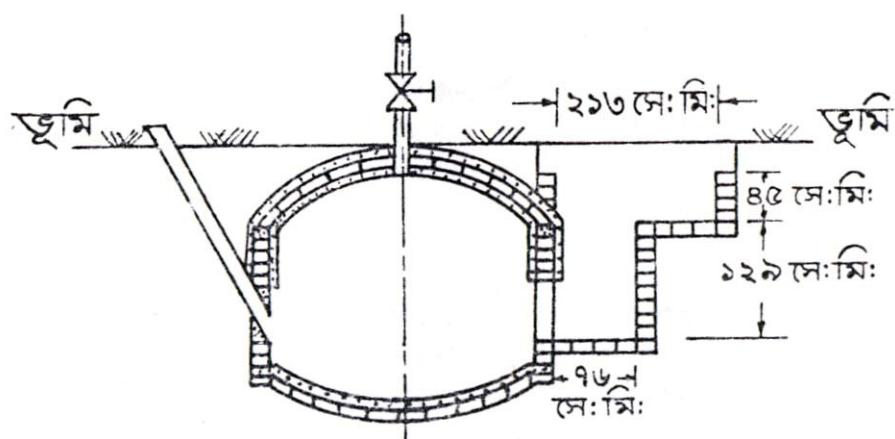
চিত্র ২৬.৩

ডোমর উপরের অংশে গ্যাস নির্গমনের জন্য একটি **১.২৭** সেমি ব্যাস বিশিষ্ট **২৫** সেমি লম্বা জিআই পাইপ খাড়াভাবে স্থাপন করতে হবে। জিআই পাইপের উপরি অংশে একটি গ্যাস ভাল্ব সংযুক্ত করতে হবে। এখন দেয়ালের ভিতরের অংশে নিচ থেকে আউটলেট ডোর এর উপরিভাগ পর্যন্ত ১ঃ ৪ অনুপাতে **১.২৭** সেমি পুরু প্লাষ্টার করতে হবে। আউটলেট ডোর এর উপরিভাগ থেকে ডোমের ভিতরের সম্পূর্ণ অংশ (গ্যাস চেম্বার) ১ঃ৩, ১ঃ২, ১ঃ১ অনুপাতে তিনবার প্লাষ্টার করতে হবে। প্রতিবার প্লাষ্টারিং এর পূর্বে সিমেন্ট পেষ্ট করে ব্রাস করে নিতে হবে। ৫/৬ দিন কিউরিং করার পর ভিতরের ডোম সহ আউটলেট ডোর পর্যন্ত দেয়ালের শুকনা অবস্থায় **১** মিমি পুরু মোম/সিলিকেট প্রলেপ দিতে হবে। ডোমের উপরের সম্পূর্ণ অংশ এবং আউটলেট ডোরের উপর থেকে গ্যাস চেম্বারের বাইরের অংশ ৫ সেমি সিসি ঢালাই এর পর নিট ফিনিশিং করে নিতে হবে।

হাইড্রলিক চেম্বার
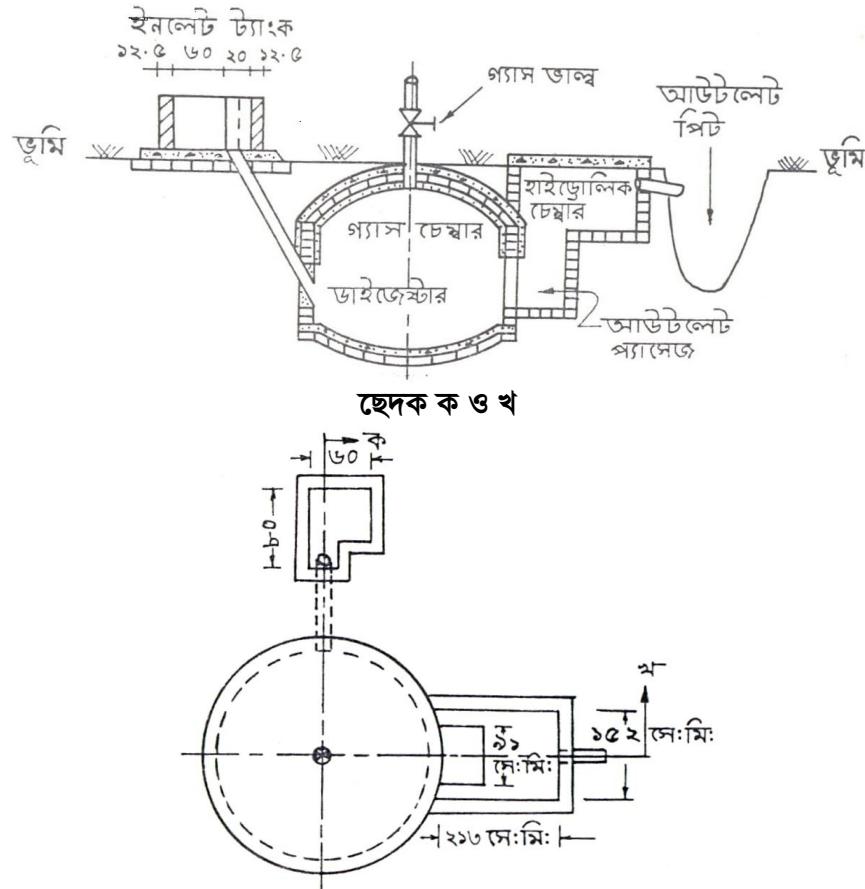
১২.৫ সেমি ইটের গাঁথুনি দিয়ে ৭৬ সেমি দৈর্ঘ্য×**৯১** সেমি প্রস্থ ×**১২৯** সেমি উচ্চতা মাপের একটি আউটলেট প্যাসেজ এবং আউটলেট প্যাসেজের উপরে **২১৩** সেমি দৈর্ঘ্য×**১৫২** সেমি প্রস্থ ×৪৫ সেমি উচ্চতা মাপের আয়তকার একটি হাইড্রলিক চেম্বার তৈরি করতে হবে (চিত্র নং২৬.৪ ও ২৬.৫)। ৪৫ সেমি দেয়ালের কাজ শেষ হলে

স্পেন্ট স্লারী নির্গমনের জন্য একদিকে একটা ওভারফ্লো পাইপ বসাতে হবে অথবা খোলা পথ/দরজা রাখতে হবে

চিত্র ২৬.৪

(চিত্র নং২৬. ৫)। হাইড্রলিক চেম্বারের ভিতরের দিক ১ঃ৪ অনুপাতে প্লাষ্টার করে নিতে হবে। স্পেন্ট স্লারী নির্গমনের পথের উপরে আরো ৭.৫ সেমি গেঁথে নিতে হবে। হাইড্রলিক চেম্বারের উপরের অংশ ঢেকে রাখার জন্য স্বাব/টিনের ঢাকনি ব্যবহার করতে হবে।

ছেদক ক ও খ

চিত্র ২৬. ৫

ইনলেট ট্যাংক

ইনলেট পাইপের মুখে ৬০ সেমি×৬০ সেমি×৬০ সেমি মাপে একটি ১২.৫ সেমি পুরু ইটের ট্যাংক তৈরি করতে হবে। এই ট্যাংক এর বাইরের এবং ভিতরের অংশ ভালোভাবে প্লাষ্টার করতে হবে।

ডাইজেষ্টার, হাইড্রলিক চেম্বার এবং ইনলেট ট্যাংক তৈরির পর প্লান্টের চারপাশে বালি ও মাটি দিয়ে এমনভাবে ভরাট করতে হবে যেন ডোমের উপরিভাগ পর্যন্ত মাটির নিচে থাকে।

প্লান্ট চালু করার নিয়মাবলী

প্লান্ট চালু করার সময় ১.৫-২ টন কাঁচামাল যথা গোবর, হাঁস-মুরগীর মল, মানুষের মল জাতীয় পচঁনশীল পদার্থের প্রয়োজন। প্লান্ট তৈরির শুরু থেকে এগুলো জমা করে রাখলে প্লান্ট চালুর সময় এগুলো ব্যবহার করা যাবে। অবশ্য কেউ যদি ২/১ দিনেই উক্ত পরিমাণ কাঁচামাল যোগাড় করতে পারেন, তবে আগে থেকে জমা করে রাখার প্রয়োজন নেই। জমাকৃত কাঁচামাল এবং পরিষ্কার পানি গোবরের ক্ষেত্রে ১ঃ১, হাঁস-মুরগীর মলের ক্ষেত্রে ১ঃ২ অনুপাতে মিশিয়ে ইনলেট পাইপ দিয়ে আস্তে আস্তে ডাইজেষ্টারে ঢালতে হবে। কাঁচামাল ও পানির মিশ্রণ (স্লারী) এই পরিমাণ প্লান্টের মধ্যেঢালতে হবে যাতে করে স্লারীর লেভেল হাইড্রোলিক চেম্বারের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছায় ।

চার্জিং এর সময় খেয়াল রাখতে হবে মাটির ঢাকা, পাথর, বালি, বড় সাইজের খড়কুটা ইত্যাদি যেন কুয়ার ভিতর প্রবেশ না করে।

প্লান্ট এবং গ্যাস ভাল্বের ছিদ্র পরীক্ষা

গ্যাস ভাল্বের ছিদ্র পরীক্ষার জন্য পলিথিন পাইপের একমাথা গ্যাস ভাল্বে এবং অন্য মাথা পানির মধ্যে সামান্য ডুবিয়ে দিতে হবে, যদি ভাল্ব বন্ধ অবস্থায় পানিতে বুদবুদ তৈরি হয়, তবে বুঝতে হবে ভাল্বের ভিতরে ছিদ্র আছে। ভাল্বের গোড়ায় সাবানের ফেনা লাগিয়ে যদি বুদ বুদ দেখা যায় তবে ধরে নিতে হবে ভাল্বের গোড়ায় গ্যাস লিক করছে। এমতাবস্থায় গ্রিজ ও থ্রেড টেপ/পাট জাতীয় কিছু দিয়ে ছিদ্র মুক্ত করতে হবে।

গ্যাস সরবরাহে নিয়ম

১.২৭-২.৫৪ সেমি ব্যাসের পিভিসি/জিআই পাইপ প্লান্ট থেকে চুলা/হ্যাজাক লাইট/জেনারেটর পর্যন্ত সংযোগ করতে হবে। যেহেতু বায়োগ্যাসে পানি মিশ্রিত থাকে, সেহেতু সরবরাহ লাইনে মাঝখানে উঁচু করে নিতে হবে। ফলে পাইপের মাঝখানে কোথাও পানি জমে থাকার সম্ভাবনা থাকবে না। পাইপের একমাথা একটি প্লাষ্টিক পাইপের সাহায্যে প্লান্টের সরবরাহ লাইনে এবং অন্য মাথাটি চুলা/হ্যাজাক লাইট/জেনারেটর ইত্যাদির সাথে টি এর সাহায্যে যুক্ত করে নিতে হবে।

বায়োগ্যাস প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ

বায়োগ্যাস প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষণের তেমন কোন ঝামেলা নেই। তথাপি নিম্নলিখিত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম পালন করলে সুষ্ঠুভাবে গ্যাস উৎপাদনে সহায়ক হবেঃ

(১) চার্জিং এর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন ইট, পাথর বা কাঠের টুকরা ইত্যাদি প্লান্টে ঢুকতে না পারে। তা হলে ইনলেট পাইপ তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

(২) কোন সময় ইনলেট পাইপ বন্ধ হয়ে গেলে একটি সোজা ও সরু বাঁশ দিয়ে সাবধানে পাইপের ভিতর নেড়ে দিতে হবে। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এতে কুয়ার তলায় বা পাইপের গায়ে জোরে আঘাত না লাগে।

(৩) গ্যাস পাইপ লাইনে পানি জমেছে কিনা দেখে নিতে হবে। পানি জমলে যে মাথায় পানি জমেছে সে মাথা খুলে পানি বের করে দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে পানির ট্র্যাপ ব্যবহার করতে হবে।

(৪) প্লান্টে প্রতিদিন চার্জ করতে হবে নতুবা গ্যাস উৎপাদন কমে যাবে। বেশ কিছু দিন চার্জ না করা হলে ইনলেট পাইপ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বায়োগ্যাসের ব্যবহার

- তিতাস গ্যাসের মতই এই গ্যাস দিয়ে রান্না করা যায়।
- ম্যান্টল জ্বেলে হ্যাজাক লাইটের মত আলো পাওয়া যায়।
- জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে ফ্যান, রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিপি ইত্যাদি চালানো যায় এবং বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বালানো যায়।
- পাম্পের সাহায্যে জমিতে পানি সেচ করা যায়।
- এই গ্যাস দিয়ে গাড়ী চালানো যায়।
- এই গ্যাস ব্যবহার করে ফলমূল, খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করা যায়।
- এই গ্যাস দ্বারা ইনকিউবেটর চালানো যায়।

বায়োগ্যাস রেসিডিউ এর ব্যবহার

- উন্নতমানের জৈব সার
- মাশরুম চাষ
- মাছের চাষ
- মুক্তো চাষ
- কেঁচো চাষ (হাঁস, মুরগী ও মাছের খাদ্য)
- বীজ অংকুরোদগম।

স্বাস্থ্যগত সুবিধাদি

বায়োগ্যাস প্রযুক্তির আর একটি বিশেষ দিক হল স্বাস্থ্যগত সুবিধা। আবর্জনাই হোক অথবা মানুষ বা প্রাণি-পাখীর মল-মূত্রই হোক, যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকলে দুর্গন্ধ ছড়ায়, মশা-মাছি আকৃষ্ট করে, রোগ-জীবাণু বিস্তারে সহায়তা করে। বায়োগ্যাস প্লান্টে এ সব দ্রব্য পঁচনের ফলে দুর্গন্ধ ছড়ায় না, মশা-মাছি আকৃষ্ট হয় না এবং রোগ-জীবাণু বহুলাংশে ধ্বংস হয়ে যায়।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে বায়োগ্যাস রেসিডিউ

বায়োগ্যাস প্রযুক্তির আরও একটি সুফল হল জৈব সার হিসেবে এর ব্যবহার। গ্যাস নির্গত হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে (বায়োগ্যাস রেসিডিউ) তা একটি উন্নতমানের জৈব সার। এই সারে জৈব পদার্থ, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সংরক্ষিত হয়, ফলে সারের মান উন্নত হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

সারণী ২৬.১ কম্পোষ্ট সারের তুলনায় বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে প্রাপ্ত সারের উৎকৃষ্টতা

সার	ধান	গম	ভুট্টা	তুলা
সাধারণ জৈব সার	১০০	১০০	১০০	১০০
বায়োগ্যাস রেসিডিউ	১১০	১১২.৫	১২৮	১২৪.৭

সারণী ২৬.২ রাসয়নিক সারের তুলনায় বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে প্রাপ্ত সারের উৎকৃষ্টতা

ফসলের নাম	রাসায়নিক সারে ফসল উৎপাদন (টন/হেক্টর)	বায়োগ্যাস রেসিডিউতে ফসল উৎপাদন (টন/হেক্টর)	শতকরা বৃদ্ধির হার
ধান	৮.২৮	৯.০২	৮.৯৩
ভুট্টা	৭.০	৯.৫	৩৫.৭
তুলা	৩.১৩	৩.৯৭	২৬.৮
শাকসবজি	কম	বেশি	

উৎসঃ

*স্থির ডোম বায়োগ্যাস প্লান্ট - বায়োগ্যাস পাইলোট প্লান্ট প্রকল্প, জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়ন ইন্সটিটিউট

*গাভী পালন গাইড - এ. টি. এম. ফজলুল কাদের

ছাগল ও ভেড়া পালনঃ

মডিউল - ২৭ ঃ
ছাগল পালনের প্রাথমিক বিষয়াবলী

২৭.১ ঃ দুগ্ধ, মাংস ও পশম উৎপাদনে ছাগল পালনের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের দুগ্ধ, মাংস ও পশম উৎপাদনে ছাগল পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন দুগ্ধ, মাংস ও পশম উৎপাদনে ছাগল পালনের গুরুত্বসম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করবেন।

দুধ, মাংস ও পশম উৎপাদনে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ছাগল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে । ছাগলের দুধ একটি সুস্বাদু ও সহজপাচ্য পানীয় । স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি, আমিষ, চর্বি, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন প্রভৃতি পুষ্টিকর উপাদান ছাগলের দুধের মধ্যে প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায় । গাভীর দুধের চর্বি কণার তুলনায় আকারে ছোট হওয়ায় ছাগলের দুধের পরিপাচ্যতা বেশী । বাড়ন্ত শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীর জন্য ছাগলের দুধ উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য । ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শিশু ও প্রসূতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজ যা গাভীর দুধের তুলনায় ছাগলের দুধে বেশী থাকে । সামান্য ক্ষারীয় হওয়ায় গ্যাস্ট্রিক আলসার বা এসিডিটিতে আক্রান্ত রোগীর জন্য সহজপাচ্য পানীয় হিসাবে ছাগলের দুধ পান করা হয় । হাঁপানী রোগের ঔষধ হিসাবে কোথাও কোথাও ছাগলের দুধ বিবেচিত ।

ছাগলের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় প্রাণীজ আমিষ । বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপালসহ বিশ্বের অনেক দেশে ছাগলের মাংসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে । বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের মাংস পৃথিবীর অন্যান্য যে কোন জাতের ছাগলের মাংসের চেয়ে সুস্বাদু বলে দাবী করা হয়ে থাকে । ধর্ম বিশ্বাসের কারণে প্রাণীজ আমিষের উৎস হিসাবে পৃথিবীর অনেক দেশে গরুর মাংসের তুলনায় ছাগলের মাংসের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করা যায় । এ ছাড়া বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন বিয়ে, জন্মদিন, ঈদ, আকীকা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ছাগল জবাই করে ভুড়িভোজের আয়োজন করা হয়ে থাকে ।

দুধ ও মাংস উৎপাদন ছাড়াও পশম, চামড়া ও জৈব সার উৎপাদনে ছাগল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া হতে উন্নতমানের চামড়াজাত পণ্য তৈরী হয় । বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়ার কদর বিশ্বজোড়া । শীত প্রধান দেশের ছাগলের লম্বা লোম পশমিনা, শাল, সোয়েটার, হ্যাট, কার্পেট, স্যুট ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এ্যাংগোরা জাতের ছাগলের লোম হতে তৈরী হয় সাদা ও সোনালী মোহেয়ার (Mohair)।

ছাগলের দুধ, মাংস, চামড়া, পশম ও মলমূত্রের বহুমুখী ব্যবহার একে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিসম্পদে পরিণত করেছে । ছাগল পালনে স্বল্প পুঁজি, স্বল্প জায়গা এবং কম খাদ্য খরচের প্রয়োজন হয় । আত্মকর্মসংস্থান, বেকার সমস্যা হ্রাস, দারিদ্র বিমোচন, পুষ্টি সরবরাহ সর্বোপরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ছাগল হতে পারে একটি অন্যতম হাতিয়ার ।

২৭.২ ঃ বাংলাদেশে ছাগল পালনের সুবিধা ও সমস্যাসমূহ

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশে ছাগল পালনের সুবিধা ও সমস্যসমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন বাংলাদেশে ছাগল পালনের সুবিধা ও সমস্যাসমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

বাংলাদেশে ছাগল পালনের সুবিধাসমূহঃ

- বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল স্বল্প ব্যয়ে ছাগল পালনের জন্য খুবই উপযুক্ত । গ্রামের বসতবাড়িতে ২-৪ টি ছাগল পালন করা লাভজনক । বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৭৬% এলাকা ছাগল পালনের উপযোগী ।
- ছাগল অপ্রচলিত খাদ্য যেমনঃ কাঁঠাল পাতা, বাঁশ পাতা, কলা পাতা, হিজল পাতা এমনকি বসতবাড়ির আশেপাশের লতাপাতা ও সামান্য ঘাস খেয়ে জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম । ফলে ছাগলের খাবার জোগাড় করা তেমন কষ্টসাধ্য নয় ।
- যেসব খামারীর গাভী পালন করার সামর্থ নেই তারা অনায়াসে ২-৪ টি ছাগল পালন করতে পারে । স্বল্প আয়ের মানুষ যেমন ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী চাষী, গ্রামের দুস্থ মহিলা বা ছোট ছোট বালক বালিকারাও বাড়ির আশেপাশে, ক্ষেতের ধারে, রাস্তার পাশে ছাগল চড়িয়ে পালন করতে পারে ।
- ছাগলের রোগ বালাই অন্যান্য গবাদিপ্রাণির তুলনায় কম হওয়ায় ছাগল পালন লাভজনক ।
- বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল বছরে ২ বার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবাওে ২-৪ টি করে বাচ্চা দেয় বলে এ জাতের ছাগল পালন লাভজনক ।
- দেশে ও দেশের বাইরে ছাগলের মাংস, দুধ ও চামড়ার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে । তাই এগুলো বাজারজাতকরণ সহজসাধ্য ।
- ছাগল খামার খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থের ঝুঁকি অন্যান্য গবাদি প্রাণির তুলনায় কম ।

বাংলাদেশে ছাগল পালনের সমস্যাসমূহঃ

- ছাগলের পুষ্টি, প্রজনন, স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে খামারীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব ।
- ছাগলের বিভিন্ন রোগ দমনে প্রস্তুতিমূলক ও কৌশলগত ব্যবস্থার অভাব যেমনঃ কৃমি নাশক না খাওয়ানো, যথাসময়ে টিকা প্রদান না করা ইত্যাদি ।
- স্ক্যাভেঞ্জিং, সেমি-ইন্টেনসিভ এবং ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল উৎপাদনের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।
- নীতিমালাহীন অবাধ সংকরায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের কৌলিক মানের বিনাশ ।
- ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কার্যকর সমন্বিত জাতীয় পরিকল্পনার অভাব ।

২৭.৩ ঃ ছাগলের বিভিন্ন জাত

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের বিভিন্ন জাত সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগলের বিভিন্ন জাত সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাংস, দুধ, চামড়া ও পশম উৎপাদনের জন্য অনেক উন্নত জাতের ছাগল রয়েছে । নিচে এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো ঃ

মাংস উৎপাদনকারী ছাগলের জাতঃ এই শ্রেণীর ছাগলের মাংস সুস্বাদু ।

জাতের নাম	প্রাপ্তি স্থান	দৈহিক ওজন
১. ব্ল্যাক বেঙ্গল	বাংলাদেশ, ভারত	১৫-৩০ কেজি
২. বোয়ার	দক্ষিণ আফ্রিকা, এ্যাঙ্গোলা, নামিবিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন	৭০-৯৫ কেজি
৩. দামানি	পাকিস্তান, ভারত	২০-২৫ কেজি
৪. বিটাল	পাকিস্তান, ভারত	৪৫-৬৫ কেজি

টেবিল ২৭-১ঃ মাংস উৎপাদনকারী ছাগলের বিভিন্ন জাতের বিবরণ

এ ছাড়া অন্যান্য সকল জাতের ছাগলের মাংসই ভক্ষণযোগ্য ।

চিত্র-২৭.১ঃ বোয়ার জাতের ছাগল
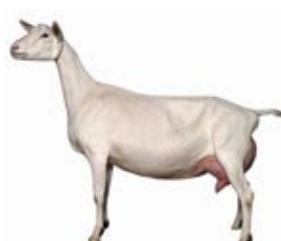
চিত্র-২৭.২ঃ বোয়ার জাতের ছাগল

দুধ উৎপাদনকারী ছাগলের জাতঃ ল্যাকটেশন পিরিয়ডে এই শ্রেণীর ছাগী হতে প্রতিদিন গড়ে ১-৪ লিটার দুধ পাওয়া যায় ।

চিত্র-২৭.৩ঃ সানেন জাতের ছাগল

চিত্র-২৭.৪ঃ সানেন জাতের ছাগল

চিত্র-২৭.৫ টোগেনবার্গ জাতের ছাগল

চিত্র-২৭.৬ঃ টোগেনবার্গ জাতের ছাগল

দুধ উৎপাদনকারী ছাগলের জাতের উদাহরণঃ

জাতের নাম	প্রাপ্তি স্থান	দৈহিক ওজন	ছাগীর দৈনিক দুধ উৎপাদন	প্রতি ল্যাকটেশনে দুধ উৎপাদন
১. যমুনাপাড়ি (রাম ছাগল)	ভারত, বাংলাদেশ	৪৫-৮০ কেজি	২-৪ লিটার	৬১৮ লিটার
২. সানেন	হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র	৬৫-৯৫ কেজি	৩-৫ লিটার	১৫০০ লিটার
৩. অ্যাংলো নুবিয়ান	ব্রিটেন, সুইজারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড	৬০-৭০ কেজি	২-৩ লিটার	৭৭৪ লিটার
৪. টোগেনবার্গ	সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র	৫০-৬৫ কেজি	১ লিটার	৫০০ লিটার
৫. দামাসকাস	সিরিয়া, লেবানন	৫০-৬০ কেজি	২-৩ লিটার	৫২৫ লিটার
৬. বারবারি	উত্তর ভারত, পাকিস্তান	৩৫-৪০ কেজি	১-২ লিটার	১২০-১৫০ লিটার
৭. ব্রিটিশ আলপাইন	ব্রিটেন, ইউরোপ	৬০-৬৫ কেজি	৯০০-১৩০০ মি.লি.	২১০-২৭৫ লিটার

টেবিল ২৭-২ঃ দুধ উৎপাদনকারী ছাগলের বিভিন্ন জাতের বিবরণ

চিত্র-২৭.৭ঃ অ্যাংলো নুবিয়ান জাতের ছাগল

চিত্র-২৭.৮ঃ অ্যাংলো নুবিয়ান জাতের ছাগল

চিত্র-২৭.৯ঃ অ্যাংলো নুবিয়ান জাতের ছাগল

চিত্র-২৭.১০ঃ অ্যাংলো নুবিয়ান জাতের ছাগল

চামড়া উৎপাদনকারী ছাগলের জাতঃ এই শ্রেণীর ছাগলের চামড়া দিয়ে উন্নতমানের চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় ।

জাতের নাম	প্রাপ্তিস্থান	দৈহিক ওজন
১. ব্ল্যাক বেঙ্গল	বাংলাদেশ, ভারত	১৫-৩০ কেজি
২. মালাবার	ভারত	৩৫-৪০ কেজি
৩. বারবারি	উত্তর ভারত, পাকিস্তান	৩৫-৪০ কেজি
৪. দামাসকাস	সিরিয়া, লেবানন	৫০-৬০ কেজি

টেবিল ২৭-৩ঃ চামড়া উৎপাদনকারী ছাগলের বিভিন্ন জাতের বিবরণ

পশম উৎপাদনকারী ছাগলের জাতঃ এই শ্রেণীর ছাগলের লোম হতে উন্নতমানের দামী পোশাক ও গরম কাপড় তৈরী করা হয় ।

উদাহরণঃ

জাতের নাম	প্রাপ্তিস্থান	লোম/পশমের নাম
১. অ্যাংগোরা	তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র	মোহেয়ার
২. কাশ্মিরী	ভারত	ক্যাশমেয়ার
৩. মেরাডি	উত্তর ভারত, পাকিস্তান	ক্যাশমেয়ার

টেবিল ২৭-৪ঃ পশম উৎপাদনকারী ছাগলের বিভিন্ন জাতের বিবরণ

চিত্র-২৭.১১ঃ অ্যাংগোরা জাতের ছাগল

চিত্র-২৭.১২ঃ অ্যাংগোরা জাতের ছাগল

আমাদের দেশে সচরাচর ছাগলের দুটি জাত দেখা যায় । এগুলো হলো ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও রাম ছাগল বা যমুনা পাড়ি ছাগল ।

২৭.৪ ঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্যসম্পর্কে ধারণা প্রদান ।

অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

চিত্র-২৭.১৩ঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল

চিত্র-২৭.১৪ঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দেহ সাধারণতঃ খাটো । উচ্চতা ১৬-২০ ইঞ্চি ।
- এদের দেহ নাম কালো লোম দ্বারা আবৃত । তবে খয়েরী বা সাদা বা এদের মিশ্রিত রংএর ছাগলও দেখা যায়।
- এদের কান ছোট, খাড়া ও ভূমির সমান্তরাল ।
- এদের শিং ছোট, খাঁড়া ও কালো ।

- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের গড় দৈহিক ওজন ২০-৩০ কেজি । পাঁঠার ওজন ২৫-৪০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ১৫-২৫ কেজি ।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের শারীরিক বৃদ্ধি অতি অল্প সময়ে ঘটে । ৭-৮ মাস বয়সে এরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় । ১৩-১৪ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয় । বছরে এরা কমপক্ষে দুইবার বাচ্চা দেয় ।
- এ জাতের ছাগল প্রতিবার ২-৪ টি বাচ্চা জন্ম দেয় ।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগীর ওলান ছোট ।
- ল্যাকটেশন পিরিয়ডে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগী গড়ে প্রতিদিন ৪০০-৫০০ মি.লি. দুধ দেয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাগলছানার চাহিদা পূরণ করতে পারে না ।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল খাসীর মাংস অত্যান্ত সুস্বাদু । একটি ২০ কেজি ওজনের খাসী হতে গড়ে ১২ কেজি ভক্ষণযোগ্য মাংস পাওয়া যায় ।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া অতি উন্নত মানের বিধায় বিশ্বব্যাপী এর কদর রয়েছে । একটি ২০ কেজি ওজনের ছাগল হতে গড়ে ১.২-১.৪ কেজি চামড়া পাওয়া যায় ।

২৭.৫ ঃ যমুনা পাড়ি ছাগলের বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের যমুনা পাড়ি ছাগলের বৈশিষ্ট্যসম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন যমুনা পাড়ি ছাগলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

চিত্র-২৭.১৫ঃ যমুনা পাড়ি জাতের ছাগল

চিত্র-২৭.১৬ঃ যমুনা পাড়ি জাতের ছাগল

যমুনা পাড়ি ছাগলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ
- যমুনা পাড়ি ছাগলের শরীরের গঠন লম্বাটে । এদের পা বেশ লম্বা; পিছনের পায়ের পেছনে লম্বা লোম থাকে ।
- এদের কান লম্বা ও ঝুলন্ত । সাধারণতঃ ২০-২৫ সে.মি. ঝুলন্ত কান দেখা যায়।
- ছাগীর ওলান বেশ বড়, সুগঠিত ও ঝুলন্ত । বাটগুলো মোটা ও লম্বা ।
- শরীরের উচ্চতা ৩২-৪০ ইঞ্চি ।
- যমুনা পাড়ি জাতের পাঁঠার ওজন গড়ে ৭৫-১০০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ৫০-৭৫ কেজি হয়ে থাকে।
- এরা দেরীতে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় ।
- যমুনা পাড়ি জাতের ছাগী বছরে একবার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবার গর্ভধারণ করে এরা সাধারণতঃ একটি বাচ্চা প্রসব করে ।
- ল্যাকটেশন পিরিয়ডে যমুনা পাড়ি জাতের ছাগী গড়ে প্রতিদিন ২-৪ লিটার দুধ দেয় । প্রতি ল্যাকটেশনে এরা সর্বোচ্চ ৬১৮ লিটার দুধ দিয়ে থাকে । ৪০০-৫০০ মি.লি. দুধ দেয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাগলছানার চাহিদা পূরণ করতে পারে না ।

- এদের মাংস ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মত সুস্বাদু নয় এবং চামড়াও উন্নতমানের নয় । তবু দুধ ও মাংস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এদেশে যমুনা পাড়ি জাতের ছাগল পালন করা হয় ।

<u>মডিউল - ২৮ ঃ</u>
<u>ছাগল খামার স্থাপনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ</u>

২৮.১ ঃ বিভিন্ন ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি

<u>উদ্দেশ্য</u> ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
<u>অর্জন</u> ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন বিভিন্ন ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

<u>উদ্দেশ্য</u>ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
<u>অর্জন</u>ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন বিভিন্ন ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

একটি ছাগল খামার স্থাপনের পূর্বে বিভিন্ন ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা প্রয়োজন । মূলতঃ কোন খামারে ছাগলে সংখ্যা, খামারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য, খামার মালিকের পুঁজি, বিচরণ ভূমি ও খাদ্যের প্রাপ্যতা প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ছাগল পালন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয় । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৫-২০ কেজি দৈহিক ওজনের একটি ছাগলকে দৈনিক গড়ে ১.৫-২.০ কেজি কাচা ঘাস সরবরাহ করা প্রয়োজন । ছাগল পালনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে পারিবারিক ক্ষুদ্র খামার, মুক্তভাবে ছাগল পালন, সেমি ইন্টেনসিভ/আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন, ইন্টেনসিভ/নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন, ইন্টেগ্রেটেড/সমন্বিত খামার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । নিম্নে ছাগল পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ।

১. পারিবারিক ক্ষুদ্র খামার

বৈশিষ্ট্যঃ

- খামারে ছাগলের সংখ্যা ২-৫ টি
- ছাগলের জন্য আলাদা কোন বাসগৃহের প্রয়োজন হয় না । সাধারণতঃ গোয়াল ঘরে বা খামারীর শোয়ার ঘরে বা বসতঘরের পাশের বারান্দায় ছাগলকে রাখা হয় ।
- বসত ঘরের আশে পাশের পতিত জমি ও ক্ষেতের আইলের ঘাস হতে ছাগলের খাদ্যের সংস্থান হয় ।
- তবে সাপ্লিমেন্ট হিসাবে গমের ভূষি, চালের কুড়া, ছোলার ভূষি, ভাতের মাড়, কাঁঠাল পাতা প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়ে থাকে ।

সুবিধাঃ

- অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয় বলে ভূমিহীন ক্ষুদ্র খামারী, প্রান্তিক চাষী এবং উচ্চ বিত্ত কৃষক সকলেই এ ধরণের খামার করতে পারেন ।
- এ ধরণের খামার স্থাপনে অল্প জায়গা এবং ব্যবস্থাপনায় অল্প শ্রম প্রয়োজন হয় ।
- বিনিয়োগ অল্প বলে এ ধরণের খামারে ঝুঁকির পরিমানও কম ।
- এক সাথে অল্প সংখ্যক ছাগল পালন করা হয় বলে এদের ব্যবস্থাপনা সহজসাধ্য । এদের রোগ ব্যাধিও তুলনামূলকভাবে কম হয় এবং উৎপাদন ভাল হয় ।
- সংখ্যা কম হওয়ায় বাজারজাতকরণও তুলনামূলকভাবে সহজ ।

অসুবিধাঃ

- অল্প সংখ্যক ছাগল পালনের কারণে বাৎসরিক আয় কম হয় । তাই একক পেশা হিসাবে গ্রহণের জন্য এ ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি উপযুক্ত নয় ।

- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পালন করা হয় না বলে অনেক সময় ছাগলের খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খাতে কম অর্থ বিনিয়োগ করা হয় । ফলে উৎপাদন অনেক সময় আশানুরূপ হয় না ।

আয়ঃ

- এ ধরণের খামার হতে বছরে ১২-১৫ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব ।

২. মুক্তভাবে ছাগল পালন

বৈশিষ্ট্যঃ

- খামারে ছাগলের সংখ্যা ৮-১০ টি
- বসত ঘরের আশে পাশের অনাবাদি জমি, পতিত জমি যেমনঃ রেল লাইনের ধার, বাঁধ, পুকুর পাড়, খেলার মাঠ, পাহাড়ী ভূমি, নদীর চর প্রভৃতি জায়গায় মুক্তভাবে সারাদিন ছাগল চরানো হয় ।
- শুধু রাতের বেলায় ছাগলকে বাড়ীতে নেওয়া হয় । এসময় শুধুমাত্র দানাদার খাবার ছাগলকে সরবরাহ করা হয় ।

সুবিধাঃ

- পতিত/অনাবাদি জমিতে মুক্তভাবে চরে বেড়ায় বলে ছাগলের জন্য আলাদাভাবে ঘাস উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না ।
- খাদ্য ব্যবস্থাপনা খাতে খরচ কম হয় ।
- মুক্তভাবে চরে বেড়ায় বলে রোগ-বালাই তুলনামূলকভাবে কম হয় ।

অসুবিধাঃ

- মুক্তভাবে চরে বেড়ায় বলে রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনার কাজে নজরদারি করতে হয় । নতুবা ছাগল হারিয়ে যাওয়ার বা চুরি হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে ।
- মুক্তভাবে চরে বেড়ানোর কারণে অনেক সময় ছাগল কর্তৃক অন্যের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করার সম্ভাবনা থাকে । এর ফলে প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে ।
- দেশব্যাপী নিবিড় কৃষি কাজের কারণে বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের অধিকাংশ স্থানে এ পদ্ধতিতে ছাগল পালন করা দুরুহ ।
- মুক্তভাবে চরে বেড়ায় বলে ছাগলের পরিকল্পিত প্রজনন সম্ভব নাও হতে পারে ।

আয়ঃ

- এ ধরণের খামার হতে বছরে ২৫-৩৫ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব ।

৩. সেমি ইন্টেনসিভ/আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন

বৈশিষ্ট্যঃ

- এ ধরণের পদ্ধতিতে খামারে ২০ বা ততোধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয় । খামারীর বিনিয়োগ ও ইচ্ছার উপর এই সংখ্যা নির্ভরশীল ।
- এ পদ্ধতিতে ছাগলকে দিনের বেলায় খামারের নিজস্ব ভূমিতে চরানো হয় এবং রাতের বেলায় ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয় ।
- ছাগলের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য দানাদার খাদ্য ও কাচা ঘাস সরবরাহ করা হয় ।

সুবিধাঃ

- এই পদ্ধতিতে পালন করলে ছাগল কর্তৃক অন্যের ক্ষেতের ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা থাকে না বলে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী ।
- খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পেছনে বেশী বিনিয়োগ করা হয় বলে এই পদ্ধতিতে উৎপাদন আশাব্যঞ্জক হয় ।

অসুবিধাঃ

- বিনিয়োগ বেশী করতে হয় বলে স্বল্প পুঁজির খামারীর জন্য এই পদ্ধতি কিছুটা ব্যয় বহুল ।
- এক সাথে অনেক ছাগল পালন করা হয় বলে খামারের কোন একটি ছাগলে সংক্রামক রোগ হলে তা দ্রুত খামারে ছড়িয়ে পড়ে । ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খাতে খরচ বেশী হয় ।

আয়ঃ

- বিনিয়োগের উপর আয় নির্ভরশীল । বিনিয়োগ যত বেশী হবে অর্থ্যাৎ যত বেশী সংখ্যায় ছাগল পালন করা হবে আয়ও সেই অনুপাতে বেশী হবে ।

৪. ইন্টেনসিভ/নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন

বৈশিষ্ট্যঃ

- এই পদ্ধতিতে খামারে শতাধিক হতে সহস্রাধিক ছাগল পালন করা সম্ভব । বিনিয়োগের পরিমানের উপর এই সংখ্যা নির্ভরশীল ।
- এই পদ্ধতিতে ছাগলকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয় এবং কাচা ঘাস, দানাদার খাদ্যসহ সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা হয় ।
- এই পদ্ধতিতে ছাগলের মুক্তভাবে চারণভূমিতে চরে বেড়ানোর কোন সুযোগ থাকে না । তবে খামার গৃহের সাথে খামার গৃহের প্রায় দ্বিগুন জায়গা নিয়ে খোঁয়াড় তৈরী করা হয় যার চারপাশে বেড়া দেওয়া থাকে । উক্ত খোঁয়ারে ছাগলকে দিনের বেলা ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সকল প্রকার রাফেজ জাতীয় খাদ্য খোঁয়াড়ে সরবরাহ করা হয় ।

সুবিধাঃ

- পরিকল্পিতভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় করা হয় বলে উৎপাদন আশানুরূপ হয়।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রজনন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় ।
- অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয় বলে তুলনামূলকভাবে জনবল খাতে ব্যয় কম হয় ।
- বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমে ছাগল পালনকে শিল্প হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব ।

অসুবিধাঃ

- গৃহ নির্মান ও খোঁয়াড় স্থাপনে প্রাথমিক বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে বেশী ।
- এই পদ্ধতিতে খাদ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় তুলনামূলকভাবে অন্য পদ্ধতির চেয়ে বেশী ।
- সময়মত কাঙ্খিত উৎপাদন নিশ্চিত করা না গেলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় । ফলে কখনো কখনো এই পদ্ধতি লাভজনক হয় না ।
- একসাথে অধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয় বলে খামারের কোন একটি ছাগলে সংক্রামক রোগ হলে তা দ্রুত খামারে ছড়িয়ে পড়ে । ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায় ।

আয়ঃ

- বিনিয়োগের উপর আয় নির্ভরশীল । বিনিয়োগ যত বেশী হবে অর্থ্যাৎ যত বেশী সংখ্যায় ছাগল পালন করা হবে আয়ও সেই অনুপাতে বেশী হবে ।

৫. ইন্টেগ্রেটেড/সমন্বিত খামার

বৈশিষ্ট্যঃ
ফলজ বা বনজ বাগানে সমন্বিত উপায়ে আধা-নিবিড় বা পারিবারিকভাবে ছাগল পালন করা যেতে পারে । সাধারণতঃ পেয়ারা, পেঁপে, আম, কাঠাল, লিচু, কলা প্রভৃতি ফলজ বাগান অথবা বনজ বাগানের নিচে পারা, সিগনাল, মাসকালাই, কাউপি, ধইঞ্চা পৃভৃতি ঘাস/রাফেজ চাষ করা যেতে পারে । ফলে ঘাস চাষের জন্য আলাদা কোন জমির প্রয়োজন হয় না। উক্ত ঘাস কেটে খাওয়ানো যেতে পারে বা এতে ছাগল চরানো যেতে পারে । এ ছাড়া ফল বাগানের অতিরিক্ত পাতা কেটে ছাগলকে খাওয়ানো যেতে পারে ।
সুবিধাঃ

- সমন্বিত উপায়ে খামার গড়ে তোলা হয় বলে ছাগলের জন্য আলাদা চারণভূমি বা ঘাস চাষের ভূমির প্রয়োজন হয় না ।
- একই ব্যক্তি একই সাথে বাগানের তদারকি ও ছাগল দেখাশোনা করতে পারেন বলে এই পদ্ধতিতে শ্রমের সাশ্রয় হয় ।
- ছাগলের মল-মূত্র জৈব সার হিসাবে খামারে ব্যবহার করা যায় ।
- এই পদ্ধতিতে ছাগর চরে বেড়ানোর সুযোগ পায় এবং অল্প জায়গায় আবদ্ধ থাকতে হয় না বলে রোগ বালাইয়ের প্রকোপ কম হয় ।

অসুবিধাঃ

- নজরদারী না থাকলে ছাগল কর্তৃক বাগানের চারা গাছ, ছোট গাছ, সব্জি ক্ষেত খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে ।

আয়ঃ

- সমন্বিত উপায়ে পালন করা হয় বলে খামারীগন বাগান ও ছাগল খামার হতে তুলনামূলকভাবে বেশী আয় করতে পারেন ।

২৮.২ ঃ ছাগল খামারের স্থান নির্বাচন

<u>উদ্দেশ্য</u> ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগল খামারের স্থান নির্বাচন সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
<u>অর্জন</u> ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগল খামারের স্থান নির্বাচন সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

স্বাস্থ্যসম্মত ও লাভজনক ছাগল খামার স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ছাগল খামার স্থাপনের সময় নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে ঃ

- যথাসম্ভব উঁচু ও শুষ্ক জায়গায় ছাগল খামার স্থাপন করতে হবে, যাতে বন্যার পানি খামারে প্রবেশ করতে না পারে এবং বৃষ্টির পানি জমে না থাকে ।
- খোলামেলা এবং প্রচুর আলো বাতাস রয়েছে এমন জায়গায় খামার স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় ।
- ঘাস চাষের উপযোগী উর্বর মাটি যেমনঃ দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটিতে খামার স্থাপন করলে ঘাস চাষের সুবিধা হয় ।

- লোকালয় হতে সামান্য দূরে কিন্তু বাজার বা শহরের সাথে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে এমন স্থানে খামার স্থাপন করা উচিৎ । এতে খামারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিবহন সহজতর হয় ।
- বিশুদ্ধ পানির উৎস/সরবরাহ রয়েছে এমন স্থানে খামার স্থাপনা করা প্রয়োজন ।
- বিদ্যুতের সুবন্দোবস্ত রয়েছে এমন স্থানে খামার স্থাপন করতে হবে ।
- খামারে পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় নালা নর্দমা থাকতে হবে ।
- কাছাকাছি চারণভূমি আছে এমন স্থানে খামার স্থাপন করা লাভজনক ।
- এ ছাড়া জীবন ধারণের আধুনিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল, সামাজিক অসন্তোষ নেই এমন স্থানে খামার স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় ।

২৮.৩ ঃ ছাগলের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের বাসস্থান সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগলের বাসস্থান সম্পর্কে ধারণা পাবেন ন ।

ছাগলের ঘর নির্মানে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

- ছাগলের বাসগৃহ শুষ্ক ও উঁচু স্থানে নির্মান করা দরকার ।
- ঘরে আলো-বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন ।
- ঘরের মেঝে সব সময় শুষ্ক ও পরিস্কার রাখার ব্যবস্থা করা উচিৎ ।
- ছাগলের ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বা লম্বি দক্ষিণ দিক খোলা থাকলে ভাল ।

ছাগল খামারে যে সকল ঘর থাকা প্রয়োজন ঃ

পারিবারিক পদ্ধতিতে এবং মুক্তভাবে ছাগল পালন করলে ছাগলের জন্য আলাদা ঘরের তেমন প্রয়োজন হয় না। মানুষের থাকার ঘরের একপাশে, ঘরের পাশের বারান্দায় অথবা গোয়াল ঘরের গরুর সাথে ছাগল পালন করা হয় । আধা নিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে একসাথে অনেক ছাগল পালন করা হয় বলে ছাগলের জন্য আলাদা করে বিভিন্ন ঘর তৈরী করতে হয় ।
একটি বাণিজ্যিক ছাগল খামারে নিম্নবর্ণিত আলাদা আলাদা ঘর থাকা বাঞ্ছনীয় ঃ

- প্রজনন উপযোগী ও দুগ্ধবতী ছাগলের ঘর, ব্রুডিং পেন
- বাচ্চা ছাগলের ঘর (দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত)
- মাংস উৎপাদনকারী ছাগলের ঘর (২-৩ মাস বয়স হতে প্রাপ্ত বয়স্ক)
- পাঁঠা ছাগলের ঘর (৩ মাস বয়স হতে সার্ভিসকালীন সময়)
- গর্ভবতী ছাগলের ঘর
- আইসোলেশন শেড (অসুস্থ ছাগলের জন্য)
- কোয়ারেন্টাইন শেড (নতুন ক্রয়কৃত ছাগলের জন্য-ক্রয়ের পর ২ সপ্তাহ পর্যন্ত)
- দানাদার খাদ্য রাখার ঘর
- সবুজ ঘাস ও রাফেজ জাতীয় খাদ্য রাখার ঘর

পালন পদ্ধতি অনুসারে ছাগলের ঘরের শ্রেণী বিন্যাস ঃ

পালন পদ্ধতি অনুসারে ছাগলের ঘরকে দুই ভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে ঃ
ক. মেঝে পদ্ধতির ঘর- এ ধরণের ঘরে ছাগলকে মেঝেতে পালন করা হয় ।

খ. মাচা পদ্ধতির ঘর- এ ধরণের ঘরে মেঝের উপর মাচা তৈরী করে তার উপর ছাগল পালন করা হয়।

নির্মান উপকরণের উপর ভিত্তি করে মেঝে পদ্ধতির ঘর তিন রকম হতে পারে

- কাঁচা মেঝের ঘর
- অর্ধ পাকা মেঝের ঘর
- পাকা মেঝের ঘর

মডিউল - ২৯ ঃ

ছাগল পালন ব্যবস্থাপনা

২৯.১ ঃ খামারে ছাগল পালনের জন্য ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের খামারে পালনের জন্য ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।

অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন খামারে পালনের জন্য ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

লাভজনকভাবে খামার পরিচালনা করতে হলে খামারে পালনের জন্য ছাগল নির্বাচনের সময় কয়েকটি বিষয় সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে । খামারে পালনের জন্য ক্রয়কৃত/নির্বাচিত ছাগলকে সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি মুক্ত হতে হবে । তা ছাড়া চর্মরোগ, চোখের রোগ এবং বংশগত রোগ ব্যাধি থাকা চলবে না। কোন এলাকায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে বা কিছুদিন পূর্বে হয়েছিল এমন এলাকা হতে ছাগল সংগ্রহ করা যাবে না । খামারে প্রতিপালনের জন্য উন্নত জাতের ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচন করতে হবে । নিম্নে উন্নত জাতের ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো ।

ছাগী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- নির্বাচনের সময় ছাগীর বয়স ৯-১৩ মাসের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় ।
- মাথা লম্বা ও মধ্যম আকারের হবে । মুখ ভরাভরা হবে ।
- কুঁজ ও ঘাড় প্রায় সরল রেখায় বা সোজা থাকবে ।
- বুক মধ্যম আকৃতির ও বেশ চওড়া হবে যাতে সামনের দুই পা সামঞ্জস্যপূর্ণ দূরত্বে থাকে।
- পেট তুলনামূলকভাবে বড়, পাঁজরের হাড় চওড়া ও প্রসারণশীল হবে ।
- সামনের পা দুটি সোজা, দৃঢ় ও হাড়গুলো মজবুত হবে । পায়ের খুর সমান্তরালভাবে মাটিতে পড়বে।
- নির্বাচিত ছাগী অধিক উৎপাদনশীল বংশের হবে । ছাগীর মা, দাদী ও নানীর বছরে ২ বার বাচ্চা দেওয়ার এবং প্রতিবারে একাধিক বাচ্চা দেওয়ার রেকর্ড থাকতে হবে ।
- নির্বাচিত ছাগীর মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার ১০% এর নিচে থাকতে হবে ।
- নির্বাচিত ছাগীর মা, দাদী ও নানীর দৈনিক গড়ে ৫০০ গ্রাম দুধ প্রদান করার রেকর্ড থাকতে হবে ।
- নির্বাচিত ছাগীর ওলান বড়, বাঁট সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিছুটা ভিতরের দিকে বাঁকানো এবং দুধের শিরা লক্ষণযোগ্য হবে।

পাঁঠা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- নির্বাচনের সময় পাঁঠার বয়স ১২-১৪ মাসের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় ।
- পাঁঠা হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং সকল প্রকার যৌন ব্যাধি মুক্ত ।
- চামড়া নরম ও ঢিলেঢালা হবে, টানলে উঠানামা করবে ।

- পশম মসৃণ ও ছোট ছোট, সিল্কের মত চকচকে হবে ।
- মাথা ও ঘাড় পুরুষালি, ভারী হবে । শরীরের পেছনের ভাগ সবল ও দৃঢ় হবে ।
- অন্ডকোষের আকার বড় ও সুগঠিত এবং দৃষ্টিযোগ্য হবে কিন্তু বেশী ঝুলানো থাকবে না ।
- পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট, মজবুত ও দৃঢ় হবে ।
- পাঁঠার মা, দাদী ও নানীর দুধ প্রদানের রেকর্ড কমপক্ষে ৭০০ গ্রাম হবে ।
- পাঁঠার মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হবে, বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান এবং প্রতিবারে দুই বা ততোধিক বাচ্চা প্রদানের রেকর্ড থাকতে হবে ।
- পেছনের পা দুটি মজবুত, সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে । জাম্প করায় পটু হতে হবে ।

২৯.২ ঃ ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।

অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন খামারে ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

ছাগলের খাদ্যাভ্যাস

ছাগল রোমন্থক প্রাণী । গরু মহিষের মত ছাগলও সেলুলোজ বা আঁশ জাতীয় খাবার হজম করতে পারে । এ ছাড়া ছাগল সংকটকালে নাইট্রোজেন ও পানি অধিকতর ভালভাবে শরীরের কাজে লাগাতে পারে । প্রাকৃতি দুর্যোগ বা খাদ্যের অভাব হলে ছাগল অত্যন্ত নিম্ন পুষ্টিমানযুক্ত খাদ্য খেতে পারে যা সচরাচর অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণি খায় না । এরা সাধারণ বা নিম্নমানের খাদ্য খেয়েই প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় । ছাগল সাধারণতঃ কাঁঠাল, আম, কলা, তুত, গামারী, মেহগিনি, বট, বরই, ভুট্ট, সূর্যমুখী প্রভৃতি গাছের পাতা খেয়ে থাকে । এ ছাড়া রাস্তা ঘাটের দূর্ব ঘাস, লতা, গুল্ম, কাটা ঝোপ এবং বাড়ির শাক সব্জি ও ফলমূলের উচ্ছিষ্টাংশ ও খোসা খেয়ে ছাগল তার খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে থাকে । ছাগলকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলে এবং অধিক উৎপাদন পেতে হলে একে নিয়মিত সুষম খাদ্য খাওয়ানো উচিৎ । অধিক দুধ ও মাংস এবং উন্নতমানের চামড়া উৎপাদনের জন্য ছাগলকে সম্পূরক দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হয় ।

খাদ্যের সুস্বাদুতা

ছাগল অন্যান্য প্রাণীর খাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে । আবার ছাগলের সামনে গাছের ডালপালা ও কান্ডসহ পাতা দিলে ছাগল কান্ড বাদে শুধু পাতা খেয়ে থাকে । ছাগল সাধারণতঃ বেছে বেছে খাদ্য মনোনীত করে খেয়ে থাকে । ছাগল মিষ্টি, তিক্ততা এবং টকা স্বাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে । এরা তিক্ত স্বাদ বেশি সহ্য করতে পারে । ছাগল লিগুম ফডার বেশী পছন্দ করে । ছাগল শালগম, ভূট্টা, জোয়ার ইত্যাদি কাঁচা ঘাস পছন্দ করলেও সাইলেজ পছন্দ করে না । নিতান্ত বাধ্য না হলে এরা সাইলেজ খেতে চায় না ।

খাদ্যের সুষমিকরণ

বিজ্ঞানীগন পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, ছাগল দুধ উৎপাদনের জন্য তার ওজন অনুপাতে ৭-৮ ভাগ বেশী খায় । ৪.৫ লিটার দুধ দেয় এমন একটি ছাগলের দৈনিক গড়ে ১.৮ কেজি শুষ্ক বস্তু (ড্রাই ম্যাটার) বিশিষ্ট খাদ্য প্রয়োজন যদিও ঐ ছাগল স্বাধীনভাবে চরে দৈনিক সর্বাধিক ৩.১৮ কেজি পরিমান শুষ্ক বস্তু (ড্রাই ম্যাটার) বিশিষ্ট খাদ্য খেয়ে থাকে । ছাগলের দেহের তুলনায় পেটের স্ফিতি বড় হওয়ায় তার পেট পরিপূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । পেটের স্ফিতি পূর্ণ করার জন্য দানাদার খাদ্যের পাশাপাশি ছাগলকে সেলুলোজ বা আঁশ জাতীয় খাদ্য খাওয়ানো প্রয়োজন ।

খাদ্যের পুষ্টিমান

বয়স্ক ছাগলের তুলনায় ছাগল ছানার দানাদার খাদ্য মিশ্রণে কম আঁশ, উচ্চ আমিষ ও উচ্চ বিপাকীয় শক্তি থাকতে হবে । ৪-১৫ বয়সী ছাগল (বাড়ন্তকালীন সময়) কে পর্যাপ্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার ও আঁশজাতীয় খাদ্য প্রদান করা প্রয়োজন । স্মরণ রাখা দরকার যে, ছাগল খামারের খাদ্য ব্যয় মোট ব্যয়ের ৬০-৭০ ভাগ । তাই খামারের লাভ লোকসান খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল । দানাদার খাদ্যের মূল্য আঁশ জাতীয় খাবারের চেয়ে বেশি । তাই আঁশ জাতীয় খাবার খেয়ে যত বেশি পুষ্টি চাহিদা মেটানো যাবে তত ব্যয় কমানো যাবে । নিম্নে ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা ছক আকারে দেখানো হলো ।

ছাগলের ওজন (কেজি)	**দৈনিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ (গ্রাম)**	**দৈনিক ঘাস সরবরাহ/চরানো (কেজি)**
৪	১০০	০.৪
৬	১৫০	০.৬
৮	২০০	০.৮
১০	২৫০	১.০
১২	৩০০	১.০
১৪	৩৫০	১.৫
> ১৮	৩৫০	২.০

টেবিল-২৯.১ঃ বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা

ছাগীর ওজন (কেজি)	দুধের পরিমান (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ঘাস/পাতা (কেজি)	খড় (গ্রাম)	ভাতের মাড় (কেজি)
২০	০.৫০	৩০০	১.৫	-	১.০
২৫	০.৮০	৪০০	১.৫	-	১.২
৩০	১.০০	৪০০	২.০	৩০০	১.৫
৩৫	১.০০	৪০০	২.৫	৫০০	২.০
৪০	১.০০	৪০০	২.৫	৬৫০	২.০

টেবিল ২৯-২ঃ দুগ্ধবতী ছাগীর দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা

বয়স (মাস)	ওজন (কেজি)	ঘাস/পাতা (কেজি)	ইউরিয়া মিশ্রিত খড় (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ভাতের মাড় (কেজি)
৩	৬.০	০.৪০	০.০২	১০০	৪০০
৪	৭.৮	০.৪৫	০.০৫	২০০	৪০০
৫	৯.৬	০.৫০	০.০৫	২০০	৪০০
৬	১১.৫	০.৬০	০.১০	২৫০	৪০০
৭	১৩.২	০.৮০	০.১৫	২৫০	৪০০
৮	১৫.০	১.০০	০.২০	৩০০	৪০০
৯	১৬.৮	১.০০	০.২০	৩০০	৪০০
১০	১৮.৬	১.২০	০.২০	৩০০	৪০০
১১	২০.৫	১.৩০	০.২০	৩০০	৪০০
১২	২২.২	১.৩০	০.২০	৩০০	৪০০
১৩	২৪.০	১.৫০	০.২০	৩০০	৪০০
১৪	২৫.৮	১.৬০	০.২০	৩০০	৪০০
১৫	২৬.৫	১.৮০	০.২০	৩০০	৪০০

টেবিল ২৯-৩ঃ বিভিন্ন ওজনের খাসীর দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা

খাদ্যের উপাদান	বাচ্চা ছাগলের খাদ্য	বড় ছাগলের খাদ্য
ছোলা ভাঙ্গা	২০ ভাগ	১৫ ভাগ
গম ভাঙ্গা	২০ ভাগ	৩৫ ভাগ
তিলের খৈল	৩৫ ভাগ	২৫ ভাগ
গমের ভূসি	২০ ভাগ	২০ ভাগ
খনিজ মিশ্রণ	০৪ ভাগ	০৪ ভাগ
লবন	০১ ভাগ	০১ ভাগ
মোট	১০০ ভাগ	১০০ ভাগ

টেবিল ২৯-৪ঃ বাচ্চা ও বড় ছাগলের দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ

২৯.৩ ঃ ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।

অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন ।

উন্নতমানের ও অধিক উৎপাদনশীল বাচ্চা পেতে হলে ছাগলকে সুপরিকল্পিত ভাবে প্রজনন করাতে হবে । ক্রমাগত বাছাই পদ্ধতিতে দলের মধ্যে উন্নত মানের পাঁঠা এবং প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচন করে তাদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে ছাগলের মান উন্নয়ন করা হয় । বাছাই ক্রিয়ার সময় নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে ।

প্রজনন উপযোগী ছাগলের বৈশিষ্ট্য

১। বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

- দৈহিক বৃদ্ধির হার
- যৌন পরিপক্কতায় আসার বয়স ও ওজন
- জন্মকালীন বাচচার ওজন
- দুধ ছাড়ার বয়স ও ওজন
- দুধ ছাড়ার পর দৈহিক বৃদ্ধির হার

২। উৎপাদন বৈশিষ্ট্য

- ছাগল প্রতি মাংস উৎপাদন
- ড্রেসিং আউট পার্সেন্টেজ
- চামড়ার গুনাগুন
- দুধ উৎপাদন
- লোম উৎপাদন
- লোমের গুনগত মান

৩। পুনরুৎপাদন বৈশিষ্ট্য

- বয়োসন্ধির বয়স
- প্রথম প্রজননে আসার বয়স ও ওজন
- প্রথম গর্ভধারণের সময় বয়স ও ওজন

- প্রথম প্রসবে ওজন ও বয়স
- কিডিং ইন্টারভ্যাল
- প্রতিবার গর্ভধারণের জন্য পাল দেওয়ার সংখ্যা
- পাঁঠার শুক্রাণুর গুনগত মান

প্রজনন উপযোগী পাঁঠা নির্বাচন

প্রজনন উপযোগী পাঁঠা নির্বাচনের সময় নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে ঃ

- পাঁঠার বয়স কমপক্ষে ১২ মাস বা তার বেশি হতে হবে ।
- পাঁঠা শারীরিকভাবে সুস্থ হবে এবং শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হবে ।
- পাঁঠা রুক্ষ, আক্রমনাত্নক ও শৌর্য বীর্যের অধিকারী হবে ।
- পাঁঠার পিতামাতার অধিক উৎপাদনের রেকর্ড থাকতে হবে ।
- পাঁঠার অন্ডকোষ বড় ও সুগঠিত হবে । পেছনের পা মজবুত ও শক্তিশালী হবে ।
- অবশ্যই সকল প্রকার যৌন রোগ হতে মুক্ত থাকবে ।

প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচন

প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচনের সময় নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে ঃ

- ছাগীর বয়স কমপক্ষে ৯ মাস হতে হবে । দৈহিক ওজন কমপক্ষে ১২ কেজি হতে হবে ।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের হলে মাংসবহুল ছাগী নির্বাচন করতে হবে । দুধ উৎপাদনকারী জাতের হলে ওলান ও বাঁট বড় ও সুগঠিত হবে ।
- ছাগীর পিতামাতার অধিক উৎপাদনের রেকর্ড থাকতে হবে ।
- দৈহিক বৃদ্ধির হার বেশি এমন ছাগী নির্বাচন করতে হবে । ছাগী অবশ্যই শান্ত প্রকৃতির হবে।

ছাগীর ইস্ট্রাস বা গরম হওয়ার লক্ষণ

- ছাগীর আচরণে অস্থিরতা দেখা যায় ।
- খাওয়া দাওয়া কমে যায় বা ছেড়ে দেয় ।
- মাঝে মাঝে উচ্চ স্বরে চিৎকার করে ।
- সঙ্গী অন্য ছাগলের পিঠের উপর লাফিয়ে উঠে । অন্য ছাগলকে তার পিঠে উঠতে দেয় ।
- ঘন ঘন লেজ নাড়ে, যোনীদ্বার (ভালভা) লাল হয় এবং ফুলে যায় ।
- যোনীদ্বার দিয়ে জেলির মত মিউকাস জাতীয় তরল পদার্থ বের হয় ।

ছাগীকে পাল দেওয়ার উপযুক্ত সময় নির্ধারণ

- ছাগী গরম হওয়ার ৮ ঘন্টা পর এবং ১৮ ঘন্টার মধ্যে পাল দিতে হয় ।
- প্রয়োজনে এ সময়ের মধ্যে দুইবার পাল দিয়ে গর্ভধারণ নিশ্চিত করা যায় । সকালে গরম হলে বিকালে এবং বিকালে গরম হলে পরের দিন সকালে পাল দেওয়া প্রয়োজন ।
- সঠিক সময়ে পাল দেওয়া না হলে পরবর্তী ১৮ দিন হতে ২১ দিনের মধ্যে ছাগী পুনরায় গরম হবে বা হিটে আসবে ।
- একবার বাচ্চা প্রসবের দেড় হতে দুই মাস পর ছাগী পুনরায় গরম হয় ।
- ছাগীকে ৩-৪ বার পাল দেওয়ার পরও গর্ভবতী না হলে অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ।

২৯.৪ ঃ ছাগলের পরিচর্যা

২৯.৪.১ ঃ প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছাগীর যত্ন

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছাগীর যত্ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছাগীর যত্ন সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

উন্নতমানের ও অধিক উৎপাদনশীল বাচ্চা পেতে হলে ছাগলকে সুপরিকল্পিত ভাবে প্রজনন করাতে হবে । আর প্রজননের সুফল পেতে হলে প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছাগীর বিশেষ যত্ন নিতে হবে । প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছাগীর জীবনে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ লক্ষ্য করা যায় । ধাপগুলো হচ্ছেঃ ড্রাই পিরিয়ড, গর্ভকালীন সময়, প্রসবকালীন সময় এবং দুধ প্রদানকালীন সময় । উক্ত চারটি ধাপে ভিন্ন ভিন্নভাবে ছাগীর যত্ন নিতে হবে। নিচে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা হলো ।

ড্রাই পিরিয়ড

বাচ্চা দুধ খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার পর হতে পুনরায় প্রজনন করার পূর্ব পর্যন্ত (পরবর্তী গর্ভধারণকাল পর্যন্ত) সময়কে ছাগীর ড্রাই পিরিয়ড বলে। এ সময়ে দেহ রক্ষা, পর্যাপ্ত হরমোন নিঃসরণ এবং দেহের ক্ষয় পূরণের নিমিত্ত ছাগীকে পর্যাপ্ত পরিমান পুষ্টিকর সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে

গর্ভকালীন সময়

সুস্থ, সবল ও স্বাস্থ্যবান বাচ্চা উৎপাদনের লক্ষ্যে ছাগীকে গর্ভকালীন সময়ে উপযুক্ত পরিমান উন্নতমানের খাবার এবং উপযুক্ত যত্ন নেওয়া জরুরী । এ সময়ে ছাগীকে স্বাভাবিক খাদ্যের পাশাপাশি ভিটামিন ও মিনারেল সরবরাহ করতে হবে । গর্ভস্থ ভ্রূণের দেহের দুই তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি ঘটে গর্ভধারণের শেষ সপ্তাহে । তাই এসময়ে আমিষের চাহিদা তিনগুন হয় । এসময়ে ভ্রূণের বৃদ্ধি ও ছাগীর স্তনের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে উন্নত মানের খাবার দিতে হবে । বাচ্চা প্রসবের দুই সপ্তাহ পূর্ব হতে ছাগীকে পৃথক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে । এসময় মাচার উপর বা উঁচু স্থানে ছাগীকে উঠতে না দেওয়া ভাল । দিনে ঘর সংলগ্ন খোঁয়াড় অথবা উঠানে ছায়ার মধ্যে ছাগীকে রাখতে হবে । গর্ভবতী ছাগীকে শুকনা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে । রাতে মাটিতে শুকনো ও পরিস্কার খড় বা চট বিছিয়ে বিছানা তৈরী করে দিতে হবে ।

প্রসবকালীন সময়

প্রসবের পূর্বে ছাগীর ওলান এবং লেজের চারপাশের পশম পরিস্কার করতে হবে । এসময় দানাদার খাদ্য সরবরাহ কমিয়ে দিতে হবে বা বন্ধ করতে হবে । প্রসব ঘর অবশ্যই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, শুকনা এবং জীবানুমুক্ত রাখতে হবে । প্রসুতি ছাগী ও সদ্যজাত বাচ্চার জন্য মেঝেতে বিছানা/বেডিং এর ব্যবস্থা করতে হবে । প্রসবের ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে । অত্যন্ত শীতের মধ্যে সদ্যজাত বাচ্চাকে যেন উষ্ণ রাখা যায় সে সুযোগ থাকতে হবে ।

দুধ প্রদানকালীন সময়

প্রসবের পর ছাগীর প্রয়োজনের উপর লক্ষ্য রেখে খাদ্যের পরিমান প্রয়োজন অনুসারে বৃদ্ধি করা আবশ্যক । গাভীর দুধের চেয়ে ছাগীর দুধে প্রোটিন ও চর্বির শতকরা পরিমান বেশি থাকে বিধায় দুগ্ধবতী ছাগীকে পর্যাপ্ত পরিমান প্রোটিন ও ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার প্রদান করতে হবে । দুগ্ধবতী ছাগীর হাইপোক্যালসেমিয়া প্রতিরোধ করার জন্য খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমানে ক্যালসিয়াম সরবরাহ করতে হবে ।

২৯.৪.২ ঃ সদ্য প্রসূত ছাগল ছানার যত্ন

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের সদ্য প্রসূত ছাগল ছানার যত্ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন সদ্য প্রসূত ছাগল ছানার যত্ন সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

- প্রসবের সাথে সাথে বাচ্চাকে মায়ের সামনে দিতে হবে যাতে ছাগী বাচ্চার শরীর চেটে পরিস্কার করতে পারে। বাচ্চার নাক শ্লেষ্মাতে আটকে থাকার কারণে দম বন্ধ হয়ে বাচ্চা মারা যেতে পারে তাই প্রসবের সাথে সাথে বাচ্চার সমস্ত শরীর ও নাকের শ্লেষ্মা সরিয়ে নাকের মধ্যে ফু দিয়ে বাচ্চার শ্বাস প্রশ্বাসে সহযোগীতা করতে হবে ।
- শীতের সময় দ্রুত বাচ্চার শরীর মুছে না দিলে শীতে বাচ্চার শরীরের অতিরিক্ত তাপমাত্রা দ্রুত হারাতে থাকে এবং বাচ্চা কাঁপতে কাঁপতে মারা যায় । এজন্য বাচ্চাকে উষ্ণ স্থানে অর্থ্যাৎ খড় বা চটের উপর রেখে চারদিক চট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে অথবা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
- সদ্য প্রসূত ছাগল ছানাকে পরিস্কার পরিচ্ছন ও শুষ্ক জায়গা (ব্রুডিং পেন) তে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে ।
- বাচ্চা প্রসবের পরপরই বাচ্চার নাভি ২-৩ সে.মি. রেখে বাকী অংশ কেটে দিতে হবে এবং উক্ত স্থানে টিংচার অব আয়োডিন লাগিয়ে দিতে হবে ।
- সদ্য প্রসূত বাচ্চার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন শক্তি । নবজাত ছাগল ছানা শক্তি পায় মায়ের দুধ হতে । তাই প্রসবের ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে ছাগল ছানাকে মায়ের শাল দুধ খেতে সাহায্য করতে হবে । প্রয়োজনে শাল দুধ দোহন করে বোতলে খাওয়ানো যেতে পারে ।
- খেয়াল রাখতে হবে যে সকল বাচ্চা যেন সমভাবে দুধ পায় । অপেক্ষাকৃত দূর্বল বাচ্চাকে নিজের হাতে ধরে মায়ের দুধ খাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে । জন্মের পর ১ম ৪-৫ দিন বাচ্চাকে শাল দুধ খাওয়াতে হবে ।
- জন্মের সময় বাচ্চার ওজন ১ কেজির কম হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি এক সপ্তাহ পর্যন্ত চিনির সিরা/ডেক্সট্রোজ দিনে ৩-৪ বার খাওয়ানো যেতে পারে । এতে বাচ্চার শরীরে শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বাচ্চা মৃত্যুর হার কমে যায় ।
- ছাগীর দুধ উৎপাদন কম কিন্তু বাচ্চার সংখ্যা যদি বেশী হয় তাহলে তিন মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে মায়ের দুধের পাশাপাশি কৃত্রিম উপায়ে গাভীর দুধ, বার্লি, পাউডার মিল্ক, ভাতের মাড় প্রভৃতি খাওয়ানো যেতে পারে।
- গরুর দুধ পাওয়া না গেলে প্রয়োজনে ছাগল ছানাকে মিল্ক রিপ্লেসার তৈরী করে দিনে ৩-৪ বার খাওয়ানো যেতে পারে । এতে ননীমুক্ত গুড়া দুধ (স্কিম মিল্ক) ৭০ ভাগ; চাল,গম বা ভূট্টার গুড়া ২০ ভাগ, সয়াবিন তেল ৭ ভাগ, লবন ১ ভাগ, ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট ১.৫ ভাগ এবং ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স ০.৫ ভাগ থাকে । উক্ত মিশ্রণের একভাগ, নয়ভাগ পানির সাথে মিশিয়ে ভালমত ফুটানোর পর ঠান্ডা করে ছাগল ছানাকে খাওয়াতে হবে ।

২৯.৪.৩ ঃ বাচ্চা ছাগলের যত্ন

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের বাচ্চা ছাগলের যত্ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন বাচ্চা ছাগলের যত্ন সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

- ছাগল ছানার ১৫ দিন বয়স হতে অল্প অল্প করে দানাদার খাদ্য এবং আঁশ জাতীয় খাবার (কাঁচা ঘাস, গাছের পাতা প্রভৃতি) খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে ।
- যে সকল ছাগল ছানা দীর্ঘ সময় ধরে মায়ের অপর্যাপ্ত দুধ পাওয়ার কারণে দূর্বল হয় তাদেরকে অন্যান্য সুষম খাবার সরবরাহের পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটি করে কাঁচা বা সিদ্ধ ডিম খাওয়ানো যেতে পারে । এতে ছাগল ছানার আমিষের চাহিদা কিছুটা পূরণ হবে এবং বাচ্চা সুস্থ ও সবল হবে ।
- শীতের সময় মেঝেতে ছালা বা খড় বিছিয়ে মার সাথে ছাগল ছানাকে রাখতে হবে ।
- প্রয়োজনে ছাগল ছানার শরীর গরম কাপড়া বা ছালা দিয়ে ঢেকে দেয়া যেতে পারে ।
- ছাগলের ঘরের বেড়া বা দেয়াল চট দিয়ে ঢেকে দেয়া দেতে পারে যাতে ঘর হতে শীত শীত ভাব দূর হয় ।
- প্রতিদিন খাদ্য ও পানির পাত্র পরিস্কার করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন ঘর ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে না হয় ।
- শীতে বা বৃষ্টির সময় ছাগর ছানাকে ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া উচিৎ নয় । এতে ঠান্ডা লেগে ছাগল ছানার নিউমোনিয়া হতে পারে ।
- বড় প্রাণীর আক্রমন হতে ছাগল ছানাকে রক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে ।
- বিভিন্ন কারণে ছাগল ছানার শরীরে উঁকুন, আঠালী, মাইট প্রভৃতি পরজীবির সংক্রমন হতে পারে । এর ফলে বাচ্চা রক্তশূন্যতায় ভুগে দূর্বল হয়ে পড়ে এবং মারা যায় । এ সব পরজীবির আক্রমন প্রতিরোধের জন্য ছাগল ছানাকে উঁকুন নাশক সাবান দিয়ে অথবা ০.৫% ম্যালাথিয়নের পানিতে গোসল করাতে হবে । ছাগল ছানার বয়স ২ মাস হলেই প্রতি সপ্তাহে দুইবার একে সাধারণ পানিতে গোসল করাতে হবে । শরীরে উঁকুন, আঠালী, মাইট প্রভৃতি পরজীবির সংক্রমন দেখা দিলে মাসে দুইবার ০.৫% ম্যালাথিয়নের পানিতে বাচ্চাকে গোসল করাতে হবে । গোসলের পরপরই ছাগল ছানার শরীর কাপড় বা ছালা দিয়ে মুছে দিতে হবে ।
- বয়স বাড়ার সাথে সাথে ছাগল ছানার পেটে গোল কৃমি, ফিতা কৃমি এবং যকৃত কৃমিসহ বিভিন্ন ধরণের কৃমি হতে থাকে । এর ফলে ছাগলের খাদ্য হজম কমে যায় এবং হজমকৃত খাদ্য শোষণে ব্যাঘাত ঘটে । এক পর্যায়ে বাচ্চা অপুষ্টিতে দূর্বল হয়ে মারা যেতে পারে । তাই বাচ্চার বয়স একমাসের অধিক হলে প্রতি চার মাস পরপর পায়খানা পরীক্ষা করে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে ।

২৯.৪.৪ ঃ পাঁঠার যত্ন

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের পাঁঠার যত্ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন পাঁঠার যত্ন সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

ছাগীর তুলনায় পাঁঠার দৈহিক বৃদ্ধির হার বেশী । একটি পাঁঠা মাত্র তিন মাস বয়সেই বয়োঃপ্রাপ্তি লাভ করে । কিন্তু ৬ মাস বয়সের আগে তাকে প্রজনন কাজে ব্যবহার করা যাবে না; অন্যথায় পাঁঠার স্বাস্থ্যহানী ঘটবে । ১২ মাস বয়স প্রজনন কাজের জন্য আদর্শ । পাঁঠার প্রজনন ক্ষমতা ২-৩ বছর বয়সে সর্বোচ্চ । প্রজনন কাজে ব্যবহৃত পাঁঠাকে শারীরিক ভাবে সুস্থ ও শৌর্য বীর্যের অধিকারী হতে হয় । পর্যাপ্ত পরিমানে সুষম খাদ্য সরবরাহ করলে এবং উপযুক্ত পরিচর্যা করলে একটি পাঁঠাকে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রজনন কাজে ব্যবহার করা যায় । একটি ব্ল্যাক বেঙ্গল পাঁঠার থাকার জন্য ২৪ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয় । পক্ষান্তরে একটি যমুনা পাড়ি পাঁঠার থাকার জন্য ৩৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয় । পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা দুধালো ছাগীর মতই । তবে প্রজনন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য প্রতিটি পাঁঠাকে দৈনিক ১০ গ্রাম গাঁজানো ছোলা দেয়া প্রয়োজন । কোন ভাবেই পাঁঠার শরীরে চর্বি জমতে দেয়া উচিৎ নয় । প্রয়োজনে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে । ২৮-৩০ কেজি ওজনের একটি পাঁঠাকে দৈনিক ৪০০ গ্রাম করে দানাদার খাদ্য প্রদান করতে হবে । একটি পাঁঠাকে সপ্তাহে ১০-১২ বারের বেশি প্রজনন কাজে ব্যবহার করা উচিৎ নয় ।

২৯.৫ ঃ ছাগলের বাচ্চাকে খাসী করানো

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের বাচ্চাকে খাসী করানো সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগলের বাচ্চাকে খাসী করানো সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

মাংস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে খামারে ছাগল পালন করা হলে প্রজনন উপযোগী কয়েকটি পাঁঠা রেখে বাকী সব পুরুষ ছাগলকে খাসী করানো হয়ে থাকে । খাসী করানো হচ্ছে কোন প্রাণীর সেক্স গ্লান্ডকে অপসারণ বা নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমে উক্ত প্রাণীর প্রজনন ক্ষমতা রহিত করা । খাসী করানোর মাধ্যমে খামারে অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্খিত প্রজনন নিয়ন্ত্রণ করা হয় । পাঁঠার শরীরে ক্যাপ্রিক এসিড ও ক্যাপ্রোয়িক এসিডের উপস্থিতির কারণে তীব্র গন্ধ বের হয় । খাসী করানো হলে উক্ত গন্ধ দূরীভূত হয় । এ ছাড়া ছাগলের মাংস গন্ধমুক্ত ও সুস্বাদু হয় । খাসীকরণের ফলে চামড়ার গুনগত মানও বৃদ্ধি পায় । এর ফলে ছাগল শান্ত ও নম্র স্বভাবের হয় এবং অনেক ছাগল একত্রে পালন সহজতর হয় । ২-৪ সপ্তাহ বয়সে পাঁঠা বাচ্চাকে খাসী করানো উত্তম ।

খাসীকরণের পদ্ধতিসমূহ

দুই পদ্ধতিতে আমাদের খাসীকরণ করা হয়ে থাকে ঃ

১. বন্ধ পদ্ধতি - বার্ডিজোস ক্যাস্ট্রেটর দ্বারা এবং রাবার রিং পরিয়ে ছাগলকে খাসী করা হয়ে থাকে । এ পদ্ধতিতে শরীর হতে সেক্স গ্লান্ড অপসারণ করা হয় না অর্থ্যাৎ সেক্স গ্লান্ড যথাস্থানেই থাকে ।
২. মুক্ত/খোলা পদ্ধতি - ধারালো ছুরি/ব্লেড/স্কালপেল এর সাহায্যে সার্জিক্যাল অপারেশনের মাধ্যমে এ পদ্ধতিতে শরীর হতে সেক্স গ্লান্ড অপসারণ করা হয় ।

সতর্কতা ও পরিচর্যা

সার্জিক্যাল অপারেশনে সৃষ্ট ক্ষতে যে মশা, মাছি বা পোকামাকড় না বসে সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে । ক্ষতস্থানে সালফানিলামাইড পাউডার লাগাতে হবে । স্যাঁতসেঁতে ও অপরিস্কার স্থানে খাসীকে রাখা যাবে না । শুকনো জায়গার ব্যবস্থ করতে হবে । প্রয়োজনে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী খাসীকে এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে ।

মডিউল - ৩০ ঃ
ছাগলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

রোগ ব্যাধি ছাগল খামারের অন্যতম প্রধান ক্ষতির কারণ । লাভজনক ভাবে ছাগল পালন করতে হলে খামারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে । রোগের বিরূদ্ধে সময়মত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে খামারের ক্ষতি এড়ানো অসম্ভব হয়ে পরে । তাই খামারের রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমের উপর সমধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে ।

৩০.১ ঃ সুস্থ ছাগলের লক্ষণসমূহ এবং অসুস্থ ছাগল চেনার পদ্ধতি

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের সুস্থ ছাগলের লক্ষণসমূহ এবং অসুস্থ ছাগল চেনার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন সুস্থ ছাগলের লক্ষণসমূহ এবং অসুস্থ ছাগল চেনার পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হবেন ।

সুস্থ ছাগলের লক্ষণসমূহ

- ছাগলের নাক, মুখ ও চোখ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে । চোখের কোনায় পিঁচুটি থাকবে না ।
- ছাগল দলবদ্ধভাবে থাকবে এবং দলের সাথে চলাফেরা করবে ।
- সারা শরীরের লোম উজ্জ্বল, মসৃণ ও চকচকে থাকবে ।
- মাথা সবসময় উঁচু করে চলবে । নাকের আগায় ঘাম থাকবে ।
- কান সজাগ ও খাঁড়া থাকবে এবং লেজ স্বাভাবিকভাবে নেড়ে মশা মাছি তাড়াবে ।
- ছাগলের ক্ষুধা থাকবে এবং সর্বদাই কিছু না কিছু খেতে আগ্রহ প্রকাশ করবে ।
- জাবর কাটবে ।
- পানির পিপাসা স্বাভাবিক থাকবে ।
- মল-মূত্র স্বাভাকি রংয়ের এবং নিয়মিত হবে ।
- পায়ু অঞ্চল থাকবে পরিচ্ছন্ন ।
- শান্ত থাকবে এবং অপরিচিত কোন কিছুর সাথে অস্বাভাবিক আচরণ করবে না ।

অসুস্থ ছাগল চেনার পদ্ধতি

- ছাগলের মুখ ও চোখ নিস্তেজ ও বিষন্ন হবে । চোখের কোনায় পিঁচুটি থাকতে পারে ।
- ছাগল দল থেকে সরে ধীরে ধীরে চলাফেরা করবে অথবা চুপ করে দাড়িয়ে থাকবে ।
- মাথা নীচু বা ঝুলে থাকবে । জ্বর থাকলে । নাকের আগা শুকনো ও গরম থাকবে ।
- ছাগলের ক্ষুধা কম থাকবে এবং খাদ্য গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করবে ।
- বিশেষ বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণ থাকবে যেমন, পিপিআর হলে ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা, ধনুষ্টংকার হলে শরীর শক্ত হয়ে যাবে এবং নড়াচড়া করবে না, একথাইমা হলে ঘা দেখা যাবে, ক্ষুরারোগ হলে মুখে, জিহবায় ও পায়ের ক্ষুরে ক্ষতস্থান দেখা যাবে ইত্যাদি ।
- মল-মূত্র অনিয়মিত এবং স্বাভাবিক হবে না ।
- তীব্র/অতি তীব্র রোগে অস্থিরতা প্রকাশ করবে ।

৩০.২ ঃ ছাগলের অপুষ্টিজনিত রোগ ও তার প্রতিকার

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের অপুষ্টিজনিত রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে ছাগলের অপুষ্টিজনিত রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পরিমানমত না থাকলে উক্ত খাদ্য খেয়ে ছাগল অপুষ্টিজনিত রোগব্যাধিতে ভুগে থাকে । কিছু কিছু পুষ্টি উপাদা দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অধিক পরিমানে প্রয়োজন হয় যেমনঃ শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য । আবার কিছু কিছু উপাদান খুব সামান্য পরিমানে প্রয়োজন হয় । যেমন মিনারেল ও ভিটামিন । এদের প্রয়োজন খুব সামান্য পরিমানে হলেও এর অভাবে ব্যাপক ক্ষতি হয় । তাই অপুষ্টি জনিত রোগব্যাধি সম্পর্কে সাধারন জ্ঞান থাকা আবশ্যক । নিম্নে কয়েকটি অপুষ্টি জনিত রোগব্যাধি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো ।

অস্টিওম্যালাসিয়া ঃ
শরীরে ভিটামিন ডি এর অভাব হলে, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব হলে বা খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত ঠিক না থাকলে অস্টিওম্যালাসিয়া রোগ হয় । এ রোগে ছাগলের ক্ষুধামন্দা দেখা যায়, পায়ের গিঁড়া ও জয়েন্ট ফুলে যায়, দুধ উৎপাদন কমে যায় এবং ক্রনিক অবস্থায় ছাগল চলাফেরা করতে এমনকি দাড়াতে অক্ষম হয়ে পড়ে । অস্টিওম্যালাসিয়া রোগে আক্রান্ত পাঁঠাকে প্রজনন কর্মকান্ডে ব্যবহার করা যায় না ।

অপুষ্টি জনিত রক্তশূন্যতা ঃ
শরীরে আয়রনের অভাব হলে রক্তশূন্যতা দেখা যায় । এ ছাড়া কপার, কোবাল্ট ও ভিটামিন-বি এর অভাব হলেও রক্তশূন্যতা হয়ে থাকে । পরজীবির আক্রমনেও ছাগলে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে । এ রোগে ছাগল ফ্যাকাশে হয়ে যায়, ক্ষুধামন্দা দেখা যায়, পর্যায়ক্রমে শুকিয়ে যায় এমনকি মৃত্যুবরণ করতে পারে । সুষম খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে রক্তশূন্যতা এড়ানো সম্ভব ।

গয়টার বা গলগন্ড ঃ
শরীর আয়োডিনের অভাব হলে এ রোগ দেখা যায় । এ রোগে গলা ফুলে যায়, প্রজনন অক্ষমতা দেখা দেয় এবং দূর্বল বাচ্চা জন্ম হয় । ছাগলের খাদ্যে আয়োডিনযুক্ত লবন যোগ করে ছাগলকে খাওয়ালে ছাড়া কপার, কোবাল্ট ও ভিটামিন-বি এর অভাব হলেও রক্তশূন্যতা হয়ে থাকে । পরজীবির আক্রমনেও ছাগলে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে । এ রোগে ছাগল ফ্যাকাশে হয়ে যায়, ক্ষুধামন্দা দেখা যায়, পর্যায়ক্রমে শুকিয়ে যায় এমনকি মৃত্যুবরণ করতে পারে । সুষম খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে রক্তশূন্যতা এড়ানো সম্ভব ।

৩০.৩ ঃ ছাগলের পরজীবিজনিত রোগ ও তার প্রতিকার

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের পরজীবিজনিত রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগলের পরজীবিজনিত রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

পরজীবিজনিত রোগে ছাগলের পুষ্টির অভাব ঘটে । ফলে উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হয় । একটি ছাগল খামার সফলভাবে পরিচালনা করতে হলে ছাগলকে অবশ্যই অন্তঃ পরজীবি ও বহিঃ পরজীবির আক্রমন হতে মুক্ত রাখতে হবে । নিম্নে ছাগলের কয়েকটি অন্তঃ পরজীবি ও বহিঃ পরজীবিজনিত রোগব্যাধি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো ।

অন্তঃ পরজীবি বা কৃমিজনিত রোগ ঃ

ছাগলের অন্তঃপরজীবিজনিত রোগ প্রধানতঃ ফ্যাসিওলা, প্যারামফিস্টোমাম, অ্যাসকারিয়া, হেমোনকাস, হুক ওয়ার্ম, সিস্টোসোমা, ইসোফেগোসটোমাম, ট্রাইচুরিয়া, ট্রাইকোস্টংগাইলাস প্রভৃতি প্রজাতির কৃমি দ্বারা ঘটে থাকে । এসব কৃমির আক্রমনে শরীরে পুষ্টির অভাব ঘটে, রক্তশূন্যতা দেখা যায়, ওজন কমে যায়, ক্ষুধামন্দা ঘটে, আক্রান্ত অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং অতি তীব্র প্রকৃতির রোগে ছাগলের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে । ছাগলের বয়স একমাসের অধিক হলে প্রতি চার মাস পরপর পায়খানা পরীক্ষা করে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে ।

বহিঃ পরজীবিজনিত রোগ ঃ

উঁকুন, আঠালী, মাইট, মাছি প্রভৃতি কীটপতঙ্গ ছাগলের বহিঃপরজীবিজনিত রোগের প্রধান কারণ । মাইটের আক্রমনে ছাগলের সারকোপটিক মেঞ্জ, ডেমোডেকটিক মেঞ্জ, সোরোপটিক মেঞ্জ ও কোরিওপটিক মেঞ্জ খোস পাঁচড়া রোগ হয়ে থাকে । এ রোগে ছাগলের দৈহিক বৃদ্ধি ও উৎপাদন যেমন বাধাগ্রস্থ হয় তেমনি এর চামড়ার গুনগত মান কমে যায় । ইস্ট্রাস ওভিস প্রজাতির মাছির লার্ভার আক্রমনে ছাগলের নেজাল মিয়াসিস রোগ হয় এ রোগে ছাগলের নাক চুলকায়, হাঁচি হয়, শ্বাসকষ্ট হয়, খাদ্য গ্রহণ হ্রাস পায়, ছাগল দূর্বল হয়ে পড়ে এমনকি মারাও যায় । উঁকুন ও আঠালী ছাগলের শরীর হতে রক্ত চুষে খায় । এদের অতিরিক্ত আক্রমনে ছাগল অস্থির হয়ে পড়ে, খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখায়, রক্ত শূন্যতায় ভুগে । বহিপরজীবিজনিত রোগ হতে ছাগলকে রক্ষার জন্য একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ ও পথ্য প্রদান করতে হবে ।

৩০.৪ ঃ ছাগলের বিপাকীয় রোগ ও তার প্রতিকার

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের বিপাকীয় রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগলের বিপাকীয় রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

কিটোসিস ঃ

ছাগলের গর্ভধারণের শেষ দিকে সাধারণতঃ বাচ্চা প্রসবের কয়েকদিন পূর্ব থেকে প্রসবের পরে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এ রোগ হয়ে থাকে । রক্তে গ্লুকোজের পরিমান কম হলে, রক্তে ইস্ট্রোজেন হরমোনের পরিমান বেড়ে গেল, খাদ্য গ্রহণের মাত্রা কমে গেলে, শর্করা জাতীয় খাদ্যের বিপাকে সমস্যা হলে ছাগলের রক্তের মধ্যে এসিটোন ও কিটোন নামক রাসায়নিক পদার্থ জমে যায় । ফলে বিষক্রিয়া হয় । এজন্য এ রোগকে কিটোনেমিয়া ও প্রেগনেন্সি টক্সিমিয়া নামেও অভিহিত করা হয় । এ রোগে ছাগলের ক্ষুধামন্দা হয়, জাবর কাটা বন্ধ হয়ে যায়, আক্রান্ত ছাগীর শ্বাস প্রশ্বাসে এসিটোনের গন্ধ পাওয়া যায়, অস্থিরতা দেখা দেয়, মাংসে খিঁচুনি শুরু হয়, হাটা চলায় অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়, ঠোঁট কাঁপে, চোখ ঘুরায়, অনেক সময় ছাগল অন্ধ হয়ে যায়। অতি তীব্র রোগে শুয়ে পড়ে এবং মৃত্যুবরণ করে । একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত ছাগলকে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করতে হবে ।

দুগ্ধজ্বর/মিল্ক ফিভার ঃ

বাচ্চা প্রসবের কিছুদিন পূর্ব হতে কিছুদিন পর পর্যন্ত সময়ে ক্যালসিয়ামের অভাবে ছাগীতে এ রোগ দেখা যায়। এ রোগে ছাগীর পক্ষাঘাতের মত অবস্থা হয়, ছাগী ঘাড় ঘুরিয়ে অবশ হয়ে শুয়ে পড়ে, অজ্ঞান ও প্যারালাইজড হয়ে যায় এবং শরীরের তাপমাত্রা কমে যায় । চিকিৎসা না করালে ১২-২৪ ঘন্টার মধ্যে ছাগল মারা যায় । একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্তছাগলকে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করতে হবে ।

গ্রাস টিটানি ঃ

খাদ্যে ম্যাগনেসিয়ামের অভাব থাকলের ছাগলের এ রোগ হয় । এ রোগকে হাইপোম্যাগনেসেমিয়াও বলা হয়। এ রোগে ছাগল এলোমেলোভাবে পা ফেলে, মাংসপেশীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, খিঁচুনি দেখা দেয়

এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অচল হয়ে যায় । বেশী আক্রান্ত হলে লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই ছাগল মারা যায় । একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত ছাগলকে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করতে হবে ।

৩০.৫ ঃ ছাগলের ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগ ও তার প্রতিকার

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগলের ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

৩০.৫.১ ঃ ওলান প্রদাহ/ম্যাস্টাইটিস

ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, মাইকোপ্লাজমা, ফাংগাস সহ ১৮-২০ ধরণের জীবানু দ্বারা দুগ্ধবতী ছাগলের ম্যাস্টাইটিস বা ওলান প্রদাহ রোগ হয়ে থাকে । এ রোগে ছাগীর ওলান লাল হয়ে ফুলে যায়, শক্ত হয়ে যায়, হাত দিয়ে স্পর্শ করলে গরম অনুভূত হয়, দুধ দোহন করলে পাত্রে দুধের তলানি পড়ে, দুধ উৎপাদন কমে যায়, দুধের স্বাদ লবনাক্ত হতে পারে, তীব্র প্রকৃতির রোগে ওলানের ভিতর পুঁজ হয় । পরে দুধের সাথে রক্ত আসে ও দুর্গন্ধ হয় । ওলান ও বাটে ব্যাথা হয় দুধ দোহন করতে বা বাচ্চাকে টেনে খেতে দিতে চায় না । একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে । এ রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ঃ

- মাঝে মাঝে ওলানের প্রত্যেক কোয়ার্টারের দুধ কালো কাপড়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোন তলানি, পুঁজ বা রক্ত আছে কিনা, দুধের রং পরিবর্তন হয়েছে কিনা ।
- ছাগীকে গাদাগাদি বা ঠাসাঠাসি করে রাখা যাবে না । প্রসবের আগে ও পরে ছাগীকে সমতল ও নরম পরিস্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে ।
- দুধ দোহনের সময় হাত পরিস্কার করে নিতে হবে । প্রয়োজনে সাবান বা ক্লোরিন সলিউশন ব্যবহার করা যেতে পারে ।
- বড় ছাগল ছানাকে ওলান থেকে দুধ চুষে খেতে দেওয়া যাবে না ।

৩০.৫.২ ঃ ধনুষ্টংকার/টিটেনাস

যে কোন অপারেশন, খাসীকরণ, বাচ্চা প্রসবের সময় ছাগীতে বা ছাগল ছানার নাভীতে ক্ষত সৃষ্টি হলে উক্ত ক্ষতে যদি ক্লোস্ট্রিডিয়াম টিটানি নাম ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমন ঘটে তখন টিটেনাস রোগ হয় । এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের চোয়াল, গলা ও দেহের অন্যান্য অংশের মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায় । দাঁতের মাড়ির মাংসপেশী শক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে দাঁত লেগে যায় বলে ছাগল খেতে পারে না । খিঁচুনি দেখা যায়, মুখ থেকে লালা ঝরে, প্রথম দিকে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং শেষ দিকে তাপমাত্রা কমে যায়, দেহ শক্ত হয়ে বেঁকে যায়, পা ও ঘাঁড় শক্ত হয়ে যায় বলে আক্রান্তছাগল চলাফেরা করতে পারেনা এমনকি দাড়াতেও পারেনা । তীব্র আক্রান্তছাগল কয়েকদিনের মধ্যে মারা যায় ।
একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী টিটেনাস আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে । এ রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ঃ

- খোঁজাকরণ, নাড়ি কর্তন, লোম কাটাসহ যে কোন ধরণের অপারেশনের সময় ছাগলকে Anti tetanus serum/Tetanus Toxoid ইনজেকশন করতে হবে ।
- ডেটল, সেভলন প্রভৃতি এন্টিসেপটিক দিয়ে ক্ষতস্থান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ।
- এক বছর পরপর দুইবার ছাগীকে Tetanus Toxoid ইনজেকশন প্রদান করলে এ রোগের আশংকা অনেক কমে যাবে ।

৩০.৫.৩ ঃ তড়কা/এ্যানথ্রাক্স

ব্যাসিলাস এ্যানথ্রাসিস নাম এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয় । এ রোগে আক্রান্ত ছাগল লক্ষণ প্রকাশের আগেই অনেক সময় মারা যায় । ছাগল টলতে টলতে পড়ে গিয়ে হাঁপাতে থাকে, খিঁচুনি দেখা যায় এবং মারা যায় । শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় (১০৩-১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট), খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়, জাবর কাটে না, শ্বাস কষ্ট হয়, নাক মুখ দিয়ে লালা পড়ে, পেট ফুলে ওঠে, রক্ত মিশ্রিত পায়খানা হয় । রোগের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মল কালো হতে হতে আলকাতরার মত হয়ে যায় । মরা ছাগলের নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত মিশ্রিত ফেনা বের হয় ।

তড়কা একটি মারাত্মক ব্যাধি । রোগ লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী তড়কা আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে । এ রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ঃ

- মৃত ছাগলকে মাটিতে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটির গর্তে চুন বা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে তার উপর মৃতদেহ রেখে মৃতদেহের উপর আবার চুন বা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে ।
- কোন অবস্থাতেই মৃত ছাগলের চামড়া ছাড়ানো যাবে না । কারণ চামড়া এ রোগের জীবানু বহন করে ।
- আক্রান্ত প্রাণি বা মৃতদেহ কোন অবস্থাতেই ব্যবচ্ছেদ করা যাবে না ।
- মৃত ছাগলের ব্যবহৃত সকল জিনিস পুড়ে ফেলতে হবে ।
- লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে আক্রান্ত প্রাণিকে পৃথক করে চিকিৎসা দিতে হবে ।
- অসুস্থ ছাগলকে বিক্রি করা যাবে না । অসুস্থ ছাগলকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলাচল করানো যাবে না ।
- সুস্থ ছাগলকে নিয়মিত (১ বছর পর পর) এ্যানথ্রাক্স রোগের টিকা প্রদান করতে হবে ।

৩০.৫.৪ ঃ এন্টারোটক্সিমিয়া

ক্লোস্ট্রিডিয়াম প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট টক্সিন দ্বারা এন্টারোটক্সিমিয়া রোগ দেখা দেয় । পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যবস্তু এ রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে । এ রোগে আক্রান্ত ছাগল শরীরের ভার বহন করতে পারে না, চারণভূমিতে হাটতে হাটতে কাঁপতে থাকে, খিঁচুনি দেখা যায়, মুখ দিয়ে লালা ঝরে. পেট ফুলে উঠে, ডায়রিয়া হয় । তীব্র প্রকৃতির রোগে হঠাৎ কাপুনি দিয়ে মারা যায় । রোগ লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী এন্টারোটক্সিমিয়া আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে । এ রোগ প্রতিরোধের জন্য ছাগলকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে এবং বিশুদ্ধ খাবার ও পানি প্রদান করতে হবে ।

৩০.৫.৫ ঃ ক্ষুরারোগ

ক্ষুরারোগ ছাগলের একটি ছোঁয়াচে সংক্রামক রোগ । এ রোগে মৃত্যুর হার কম হলেও উৎপাদন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয় । এ রোগে আক্রান্ত ছাগীর দুধ উৎপাদন কমে যায়, গর্ভবতী ছাগীর গর্ভপাত হয়, শরীরে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, মুখ হতে লালা ঝরে, মুখের ভিতরের পর্দায়, জিহবায়, দাঁতের মাড়িতে, ক্ষুরের ফাঁকে এমনকি ওলানে ফোস্কা পড়ে । মুখ ঘায়ের কারণে ছাগল খেতে পারে না, ফলে দূর্বল হয়ে পড়ে । ক্ষুরে ঘা হওয়ায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটে । আক্রান্ত ক্ষতে মাছি ডিম পাড়লে পোকা হতে পারে । বাচ্চা ছাগলে এ রোগ হলে হার্ট আক্রান্ত হয়ে মারা যায় ।

এ রোগের লক্ষণ দেখা দিলে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত ছাগলকে পৃথক করে সাপোর্টিভ চিকিৎসা প্রদান করতে হবে । কুসুম গরম পানিতে ফিটকিরি বা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গুলে মুখের ও পায়ের ঘা ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে । ছাগলের ঘর ২% আয়োসান বা অন্যান্য ডিসইনফেকট্যান্ট দ্বারা পরিস্কার করতে হবে । রোগাক্রান্ত ছাগলের মল মূত্র, বিছানা ও ব্যবহৃত উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে । মৃত ছাগলকে গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে । কোন অবস্থাতেই মৃত ছাগলের চামড়া ছাড়ানো যাবে না এবং পথে ঘাটে ফেলা যাবে না । অসুস্থ ছাগলকে স্থানান্তর করা যাবে না এবং বাজারে বিক্রি করা যাবে না ।

৩০.৫.৬ ঃ পিপিআর

পিপিআর ছাগলের একটি মারাত্মক রোগ । এ রোগের জীবানু ছাগলের দেহে প্রবেশের ৪-৫ দিন পর রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় । দ্রুত চিকিৎসা না করালে ছাগল মারা যেতে পারে । এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়, নাক দিয়ে শ্লেস্মা ঝরে এবং নাকের ভিতরে শ্লেস্মা জমে যায়, পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া দেখা দেয়, জিহবা, দাঁতের মাড়ি, মাজল ও মুখের ভিতর ঘা হয়, মলের রং গাঢ় বাদামী হয় এবং মলের সাথে মাঝে মাঝে রক্ত মিশানো মিউকাস আসে । শ্বাস কষ্ট, কাশি প্রভৃতি নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যায় । চিকিৎসায় বিলম্ব হলে ৫-১০ দিনের মধ্যে ছাগল মারা যায় । একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী পিপিআর আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে । এ রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক টিকা ব্যবহার করা প্রয়োজন । বাচ্চার ৪ মাস বয়সে টিকা প্রদান করতে হয় । অনেক সময় ঝুঁকি এড়াতে বাচ্চার ২ মাস বয়সে টিকা দেওয়া হলে পুনরায় ৪ মাস বয়সে বুষ্টার ডোজ দিলে ভাল ফল পাওয়া যায় । এশবার টিকা দিলে ১ বছর পর্যন্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে ।

৩০.৫.৩ ঃ একথাইমা/ঠোঁটের ক্ষত রোগ

কন্টাজিয়াস একথাইমা হচ্ছে ছাগলের একটি ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ । এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের নাক ও মুখের চারদিকে ফুসকুড়ি হয় । ঠোঁট ও মাড়িতে ক্ষতের সৃষ্টি হয় । ক্ষতের উপর মরা চামড়ার আবরণ থাকে যা সরিয়ে দিলে লাল ক্ষত দেখা যায় । ক্ষতের জন্য ঠোঁট ফুলে যায় । অনেক সময় চোখ, ওলান, মলদ্বার ও পায়ের খুরের উপরের চামড়ায় ফুসকুড়ি ছড়িয়ে পড়ে । ফোস্কা ফেটে তরল আঠাল পদার্থ ঝরতে থাকে এবং প্রদাহ হয় । অনেক সময় এই ক্ষত অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়ে রোগ জটিল আকার ধারণ করে । একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী কন্টাজিয়াস একথাইমা আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে । আক্রান্ত ক্ষত ফিটকিরি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে । আক্রান্ত স্থানে মিথাইল ব্লু বা ক্রিষ্টাল ভায়োলেট ব্যবহার করা যেতে পারে । এ রোগ প্রতিরোধের জন্য ছাগল ছানার ১-২ দিন বয়সে ১ম ডোজ, ১০-১৪ দিন বয়সে ২য় ডোজ এবং ৩ মাস পর ৩য় ডোজ প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করা প্রয়োজন ।

৩০.৫.৩ ঃ গোটপক্স

গোট হচ্ছে ছাগলের একটি অন্যতম মারাত্মক ভাইরাসজনিত ছোঁয়াচে সংক্রামক রোগ । এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের জ্বর হয় । চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়ে, মুখ দিয়ে লালা ঝরে । আক্রান্ত ছাগলের সারা শরীরে ফোস্কা পড়ে । সাধারণতঃ মুখের চারপাশে, নাকে, মাজলে, মুখের ভিতরে দাঁতের মাড়িতে, কানে, গলায়, ওলানে ও বাঁটে পশম কম এমন জায়গায় বসন্তের গুটি বা ফোস্কা দেখা যায় । বসন্ত রোগ দেখা দিলে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী বসন্ত আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে । আক্রান্ত ক্ষতে এন্টিবায়োটিক পাউডার বা কর্টিসোন ক্রিম লাগানো যেতে পারে । রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে অসুস্থ ছাগলকে পাল থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে । সুস্থ ছাগলকে গোট পক্স টিকা প্রদান করতে হবে ।

৩০.৬ ঃ ভ্যাক্সিনেশন/টিকাদান

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের ভ্যাক্সিনেশন/ টিকাদান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান ।
অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ভ্যাক্সিনেশন/ টিকাদান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবেন ।

রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ উত্তম । রোগ প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে ভ্যাক্সিন বা প্রতিষেধক টিকা । কোন সুস্থ প্রানীকে রোগ হওয়ার পূর্বেই একটি নির্দিষ্ট রোগের টিকা প্রদানের মাধ্যমে উক্ত রোগ হতে মুক্ত রাখার পদ্ধতিকে ভ্যাক্সিনেশন বলে । এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গড়ে ওঠে । এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কখনও কয়েক মাসের জন্য গড়ে ওঠে, আবার কখনও কয়েক বছর হতে আজীবনকাল হতে পারে ।

ভ্যাক্সিনেশনের সাধারণ নিয়মাবলী

- সুস্থ সবল প্রাণীকে ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হবে । অসুস্থ প্রাণীকে ভ্যাক্সিন প্রদান করা নিরাপদ নয় ।
- পরজীবি আক্রান্ত প্রাণীতে ভ্যাক্সিন ভাল কাজ করে না । তাই ভ্যাক্সিন প্রয়োগের পূর্বে প্রাণীকে পরজীবি মুক্ত করে নিতে হবে ।
- সরকারী প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন ভাল কোম্পানী হতে ভ্যাক্সিন সংগ্রহ করে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করতে হবে । মেয়াদোত্তীর্ণ ভ্যাক্সিন কোন কাজে আসে না বরং তা ক্ষতিকর।
- ভ্যাক্সিন গুলানোর জন্য ডিস্টিল্ড ওয়াটার বা পাতিত পানি ব্যবহার করতে হবে । পুকুর, নদীনালা, ট্যাপ ও নলকূপের পানি ব্যবহার করলে ভ্যাক্সিনের কার্যকারীতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
- পানিতে গুলানো ভ্যাক্সিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবহার করে ফেলতে হবে (গুলানোর সর্বোচ্চ ১ ঘন্টার মধ্যে ভ্যাক্সিন ব্যবহার করতে হবে) ।
- ভ্যাক্সিন নির্দেশনানুযায়ী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে । পরিবহনের সময় থার্মোফ্লাক্সে পরিবহন করতে হবে ।
- প্রস্তুতকারকের নির্দেশনামতে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করতে হবে ।

ভ্যাক্সিন প্রয়োগ পদ্ধতি

বিভিন্ন ধরণের ভ্যাক্সিন প্রস্তুতকারকের নির্দেশনানুযায়ী শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হয় । সাধারণতঃ যে সকল পদ্ধতিতে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হয় সেগুলো হলো ঃ

- মাংসপেশীতে ইনজেকশন
- চামড়ার নিচে ইনজেকশন
- শিরায় ইনজেকশন
- খাদ্য বা পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ
- স্প্রে বা এ্যারোসলের মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে
- চোখে ড্রপ
- মুখে খাওয়ানো ইত্যাদি ।

ভ্যাক্সিনের কার্যকারীতা কমে যাওয়া বা নষ্ট হওয়ার কারণ

- ভ্যাক্সিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে
- অসুস্থ প্রানীকে ভ্যাক্সিন প্রদান করলে
- প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগছে কিংবা রক্তশুন্যতায় ভুগছে এমন প্রাণীতে ভ্যাক্সিন করলে
- জীবিত জীবানু দ্বারা তৈরী ভ্যাক্সিনের জীবানুগুলো মারা গেলে
- ভ্যাক্সিন গুলানোর জন্য ডিস্টিল্ড ওয়াটার ব্যবহার না করে অনিরাপদ পানি ব্যবহার করলে
- ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করার যন্ত্রপাতি পরিস্কার ও জীবানুমুক্ত না হলে
- যে জীবানুর বিরূদ্ধে ভ্যাক্সিন দেওয়া হলো ভ্যাক্সিন ঐ জীবানুর এন্টিজেন দ্বারা তৈরী না হলে
- প্রস্তুতকারকের নির্দেশিত মাত্রায় ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা না হলে

ভ্যাক্সিনেশনের সতর্কতা

- অসুস্থ প্রাণীকে কোন অবস্থাতেই ভ্যাক্সিন প্রদান করা যাবে না
- প্রয়োগের পূর্বে প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা ভালমত পড়ে নিতে হবে । নির্দেশনানুযায়ী নির্ধারিত মাত্রায় নির্দেশিত স্থানে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করতে হবে
- দুটি ভ্যাক্সিন প্রয়োগের মধ্যবর্তী বিরতিকাল কমপক্ষে ২ সপ্তাহ হবে
- গর্ভবতী ছাগলকে জিটিভি দেয়া যাবে না

৩০.৭ ঃ ছাগলের রোগ প্রতিরোধে কতিপয় আবশ্যকীয় টিকার বিবরণঃ

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের রোগ প্রতিরোধে কতিপয় আবশ্যকীয় টিকা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।

অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে ছাগলের রোগ প্রতিরোধে কতিপয় আবশ্যকীয় টিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ।

টিকার নাম	টিকা প্রয়োগের বয়স	পরবর্তী টিকা প্রয়োগের সময়	টিকা প্রয়োগের স্থান	টিকা প্রয়োগের মাত্রা/পরিমান
পিপিআর টিকা	৪ মাস	১ বছর পর	চামড়ার নিচে	১ মি.লি
ক্ষুরারোগ টিকা	৩ মাস		চামড়ার নিচে	২ মি.লি.
গোট পক্স টিকা	৫ মাস		চামড়ার নিচে	
জলাতংক টিকা (রেবিসিন)	৪ মাস (বাচ্চার মাকে টিকা দেওয়া না হলে) ৯ মাস মাস (বাচ্চার মাকে টিকা দেওয়া হলে)	১ বছর পর	চামড়ার নিচে বা মাংসপেশীতে	১ মি.লি
এ্যানথ্রাক্স টিকা			চামড়ার নিচে	১ মি.লি
গলাফুলা টিকা			চামড়ার নিচে	
টিটেনাস টিকা (টিটেনাস টক্সয়েড)	প্রসবের পূর্বে ছাগীকে এবং প্রসবের পর বাচ্চাকে	-	মাংসপেশীতে	১ মি.লি.
ব্রুসেলোসিস টিকা			চামড়ার নিচে	
এন্টারো টক্সিমিয়া টিকা	৬ মাস		চামড়ার নিচে	
কন্টাজিয়াস একথাইমা টিকা	১-৩ দিন (১ম ডোজ), ১০-১৪ দিন (২য় ডোজ)	৩ মাস (৩য় ডোজ), ১২ মাস (পরবর্তী ডোজ)		

টেবিল ৩০-১ঃ ছাগলের বিভিন্ন টিকার বিবরণ

মডিউল - ৩১ ঃ
বিশেষ পদ্ধতিতে ছাগল পালন

৩১.১ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল পালন [১] ঃ

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল পালন সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।

অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল পালন সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ।

৩১.১.১ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল পালনের সুবিধা ঃ

সেমি ইন্টেনসিভ/আধা নিবিড় পদ্ধতিতে খামারে ২০ বা ততোধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয় । খামারীর বিনিয়োগ ও ইচ্ছার উপর এই সংখ্যা নির্ভরশীল । এ পদ্ধতিতে ছাগলকে দিনের বেলায় প্রাকৃতিক পরিবেশে খামারের নিজস্ব ভূমিতে চরানো হয় এবং রাতের বেলায় ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয় । ছাগলের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য দানাদার খাদ্য ও কাচা ঘাস সরবরাহ করা হয় ।

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল পালনের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. এই পদ্ধতিতে পালন করলে ছাগল কর্তৃক অন্যের ক্ষেতের ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা থাকে না বলে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী ।
২. এই পদ্ধতিতে ছাগলকে উপযুক্ত বাসস্থান ও উপযুক্ত খাদ্য প্রদান করা হয়
৩. খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পেছনে বেশী বিনিয়োগ করা হয় বলে এই পদ্ধতিতে উৎপাদন আশাব্যঞ্জক হয় ।
৪. এই পদ্ধতিতে প্রজনন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিকল্পিত ব্রিডিং করা হয়
৫. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগ ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করা হয়
৬. বিনিয়োগের উপর আয় নির্ভরশীল । বিনিয়োগ যত বেশী হবে অর্থ্যাৎ যত বেশী সংখ্যায় ছাগল পালন করা হবে আয়ও সেই অনুপাতে বেশী হবে ।

৩১.১.২ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের বাসঘরের স্থান নির্বাচন ঃ

লাভজনকভাবে খামার করতে হলে ছাগলের জন্য পরিস্কার, শুষ্ক, দুর্গন্ধমুক্ত, উষ্ণ, পর্যাপ্ত আলো ও বায়ূ চলাচলকারী পরিবেশ রয়েছে এমন আবাসন প্রয়োজন । অপরিস্কার স্যাঁতসেঁতে, বদ্ধ, অন্ধকার ও পুঁতিগন্ধময় পরিবেশে ছাগলের বিভিন্ন রোগ বালাই হতে পারে । ফলে দৈহিক ওজন বৃদ্ধির হার, দুধ প্রদানের পরিমান এবং বাচ্চা উৎপাদনের হার কমে যায় ।

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের বাসঘরের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

- ছাগলের বাসগৃহ শুষ্ক ও উঁচু স্থানে নির্মান করা দরকার ।
- ঘরে আলো-বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন ।
- ঘরের মেঝে সব সময় শুষ্ক ও পরিস্কার রাখার ব্যবস্থা করা উচিৎ ।
- উত্তম পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে ।
- ছাগলের ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বা লম্বি দক্ষিণ দিক খোলা থাকলে ভাল ।
- খামারের তিনদিকে ঘেরা পরিবেশ বিশেষ করে উত্তর দিকে গাছপালা লাগাতে হবে ।

৩১.১.৩ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের বাসঘর নির্মান ঃ

আয়তন

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলকে সাধারণতঃ ১৪-১৬ ঘন্টা সময় ঘরে আবদ্ধ রাখা হয় । এজন্য এই পদ্ধতিতে একটি ছাগলের জন্য ৮-৯ বর্গ ফুট জায়গার প্রয়োজন হয় । অর্থ্যাৎ ১৬ x ১২ বর্গফুট ঘরে ২৪ টি বয়স্ক ছাগল রাখা যায় । প্রতিটি বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য গড়ে ৫-৭ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয় ।

বাসঘরের ধরণ

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে পালনের জন্য ছাগলের ঘর ছন, গোলপাতা, খড়, টিনা বা ইটের তৈরী হতে পারে। ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাচা তৈরী করে তার উপর ছাগলকে রাখতে হবে । মাচার উচ্চতা ৫ ফুট হবে এবং মাচা থেকে ছাদের উচ্চতা হবে ৬-৮ ফুট । গোবর ও পেশাব পড়ার সুবিধার্থে মাচার মেঝেতে বাঁশের চটা বা কাঠকে ১ ইঞ্চি ফাঁকা রাখতে হবে । শীতের সময় মাচার উপর ৪-৫ ইঞ্চি পুরু খড়ের বেডিং বিছিয়ে দিতে হবে ।

বাসঘরের বিন্যাস

বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন ধরণের ছাগলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রাখা উচিৎ । পাঠাকে সবসময় ছাগী হতে পৃথক রাখা উচিৎ। দুগ্ধবতী, গর্ভবতী ও শুস্ক ছাগীকে একসাথে রাখা যেতে পারে । ছাগল ছানাকে ১ মাস বয়স পর্যন্ত মা ছাগীর সাথে রাখা উচিৎ । বাড়ন্ত ছাগল ও খাসীকে একসাথে রাখা যেতে পারে তবে তাদেরকে পৃথকভাবে খাওয়াতে হবে ।

ব্রুডিং পেন

বাঁশের খাঁচা বা কাঠের খাঁচাকে ব্রুডিং পেন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে । এর চারপাশ ছালা বা চটের বস্তা দিয়ে ঢাকা থাকবে । খাঁচার মেঝেতে ৪-৫ ইঞ্চি পুরু খড় বিছানো থাকবে । ৬০ x ৫৬ x ৬০ ঘন সে.মি. আয়তনের ব্রডিং পেনে ২ টি ছাগীসহ ৪-৬ টি বাচ্চা রাখা যায় । তাপমাত্র ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নামলে খাঁচা প্রতি ১ টি ১০০ ওয়াটের বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা ২০-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখা যায় ।

৩১.১.৪ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের খাদ্যের পরিমান ও গুনগত মান নির্ভর কওে চারণ ভূমিতে প্রাপ্ত ঘাসের পরিমান ও গুনগত মানের উপর । বয়স ও উৎপাদনের ভিত্তিতে এ পদ্ধতিতে ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিম্নরূপ ঃ

ক) ছাগল ছানার কলষ্ট্রাম ও দুধ খাওয়ানো ঃ

সাধারণতঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চার ওজন জন্মের সময়ে ০.৮-১.৫ কেজি হয় । জন্মের পরপরই ছাগল ছানাকে কলষ্ট্রাম বা শাল দুধ খাওয়াতে হবে । শাল দুধ বাচ্চার দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করে । প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ছাগল ছানাকে ১৫০-২০০ গ্রাম শাল দুধ খাওয়াতে হবে । এই পরিমান দুধ দিনে ৮-১০ বারে খাওয়াতে হবে । শাল দুধ খাওয়াতে দেরী হলে হজমে সমস্যা হয় । দুই বা ততোধিক বাচ্চা হলে প্রত্যেকেই যেন শাল দুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে । ছাগল ছানা সাধারণতঃ ২-৩ মাসের মধ্যে দুধ খাওয়া ছেড়ে দেয় । জন্ম হতে তিন মাস বয়স পর্যন্ত ছাগল ছানাকে নিম্নোক্ত হারে খাদ্য প্রদান করা উচিৎঃ

বয়স (সপ্তাহ)	প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ছাগলের দুধ খাওয়ানোর পরিমান	প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য দানাদার খাদ্য খাওয়ানোর পরিমান	কাচা ঘাস
০-২	২০০ গ্রাম	সামান্য পরিমান	সামান্য পরিমান
৩-৪	১৫০ গ্রাম	সামান্য পরিমান	সামান্য পরিমান
৫-৬	১৫০ গ্রাম	২০ গ্রাম	সামান্য পরিমান
৭-৮	১৩০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
৯-১০	১১০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
১১-১২	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী

টেবিল-৩১.১ ঃ ছাগল ছানার বয়স ভিত্তিক খাদ্য সরবরাহ

ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের একটি ছাগী এক সাথে ৩-৪ টি বাচ্চা প্রসব করে । কিন্তু ছাগীর দুধের বাট দুটি হওয়ায় সবগুলো বাচ্চা একসাথে মায়ের দুধ খেতে পায় না । ফলে অপেক্ষাকৃত দূর্বল বাচ্চা আরও দূর্বল হয়ে পড়ে । এক্ষেত্রে ছাগল ছানাকে নিম্নোক্ত মিশ্রণ অনুযায়ী মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়ানো যেতে পারে ।

উপাদান	পরিমান (%)
ননীমুক্ত গুড়া দুধ (স্কিম মিল্ক) পাউডার	৭০
চাল,গম বা ভূট্টার গুড়া	২০
সয়াবিন তেল	৭
লবন	১.৫
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	১
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫

টেবিল-৩১.২ঃ মিল্ক রিপ্লেসারের বিভিন্ন উপাদান

উক্ত মিশ্রণের একভাগ, নয় ভাগ উষ্ণ (৩৯-৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস) পানির সাথে মিশিয়ে ভালমত ফুটানোর পর ঠান্ডা করে ছাগল ছানাকে খাওয়াতে হবে ।

খ) কিড ষ্টার্টার ঃ

ছাগল ছানার দানাদার খাদ্য মিশ্রণে কম আঁশ, উচ্চ প্রোটিন এবং উচ্চ বিপাকীয় শক্তি থাকতে হবে । নিম্নে ছাগল ছানার কিড ষ্টার্টার এর কয়েকটি সম্ভাব্য মিশ্রণ দেয়া হলো ঃ

উপাদান	মিশ্রণ-১	মিশ্রণ-১	মিশ্রণ-১
গম/চাল/ভূট্টা ভাঙ্গা	২৫.০	২৫.০	২৫.০
মাসকালাই/খেসারী ভাঙ্গা	২৫.০	২৫.০	২৫.০
গমের ভূষি/চালের কুড়া	২৫.০	২৫.০	২৫.০
তিলের খৈল	১০.০	৫.০	-
সয়াবিন খৈল	৮.০	১০.০	১৭.০
শুটকি মাছর গুড়া	-	২.০	-
চিটাগুড়	৪.০	৫.০	৫.০
সয়াবিন তেল	১.০	১.০	১.০
লবন	১.০	১.০	১.০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	০.৫	০.৫	০.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫	০.৫	০.৫

টেবিল-৩১.৩ ঃ কিড (০-৩ মাস) ষ্টার্টারের সম্ভাব্য মিশ্রণ (%)

গ) সবুজ ঘাস ঃ
ছাগল ছানার **১৫** দিন বয়স হতে অল্প অল্প করে দানাদার খাদ্য এবং আঁশ জাতীয় খাবার (কাঁচা ঘাস, গাছের পাতা প্রভৃতি) খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে । মোটামুটি একমাসের মধ্যে পাকস্থলী ও অন্ত্রের জীবানুর মাধ্যমে ছাগল ছানা ঘাস হজম করতে পারে । এ সময়ে ছাগল ছানাকে কচি ঘাস ও পাতা খাওয়ানো যেতে পারে । ছাগল ছানা এ সময় ২০০-৩০০ গ্রাম ঘাস/পাতা খেতে পারে ।

ঘ) বাড়ন্ত ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ
ছাগলের বাড়ন্তকালীন সময়ে যে সব ছাগল প্রজনন বা মংস উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হবে তাদের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে । দুধ ছাড়ানোর পর থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত সময়ে পর্যাপ্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার ও আঁশ জাতীয় খাদ্য দিতে হবে । ছাগল সাধারণতঃ তার ওজনের ৪-৫% হারে শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে । **টেবিল-২৯.১ এ** বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা দেওয়া হয়েছে । দানাদার খাদ্যের পরিমান সবুজ ঘাসের প্রাপ্যতা এবং গুনগত মানের উপর নির্ভরশীল ।

৩১.১.৫ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ প্রজননক্ষম পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা বাড়ন্ত ছাগল ও দুধালো ছাগীর মতই । তবে প্রজনন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য প্রতিটি পাঁঠাকে দৈনিক **১০** গ্রাম গাঁজানো ছোলা দেয়া প্রয়োজন । কোন ভাবেই পাঁঠার শরীরে চর্বি জমতে দেয়া উচিৎ নয় । প্রয়োজনে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে । ২৮-৩০ কেজি ওজনের একটি পাঁঠাকে দৈনিক ৪০০ গ্রাম করে দানাদার খাদ্য প্রদান করতে হবে ।

৩১.১.৬ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

সুস্থ, সবল ও স্বাস্থ্যবান বাচ্চা উৎপাদনের লক্ষ্যে ছাগীকে গর্ভকালীন সময়ে উপযুক্ত পরিমান উন্নতমানের খাবার এবং উপযুক্ত যত্ন নেওয়া জরুরী । এ সময়ে ছাগীকে স্বাভাবিক খাদ্যের পাশাপাশি ভিটামিন ও মিনারেল সরবরাহ করতে হবে। গর্ভস্থ ভ্রূণের দেহের দুই তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি ঘটে গর্ভধারণের শেষ সপ্তাহে । তাই এসময়ে আমিষের চাহিদা তিনগুন হয় । এসময়ে ভ্রূণের বৃদ্ধি ও ছাগীর স্তনের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে উন্নত মানের খাবার দিতে হবে ।

প্রসবের পর ছাগীর প্রয়োজনের উপর লক্ষ্য রেখে খাদ্যের পরিমান প্রয়োজন অনুসারে বৃদ্ধি করা আবশ্যক । গাভীর দুধের চেয়ে ছাগীর দুধে প্রোটিন ও চর্বির শতকরা পরিমান বেশি থাকে বিধায় দুগ্ধবতী ছাগীকে পর্যাপ্ত পরিমান প্রোটিন ও ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার প্রদান করতে হবে । দুগ্ধবতী ছাগীর হাইপোক্যালসেমিয়া প্রতিরোধ করার জন্য খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমানে ক্যালসিয়াম সরবরাহ করতে হবে । দুগ্ধবতী ছাগীর দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা **টেবিল ২৯-২ এ দেখানো হয়েছে ।**

৩১.১.৭ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের মাঠে চরানো ঃ

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলকে ঘরে দানাদার খাদ্য প্রদানের সাথে সাথে মাঠে চরিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমানে ঘাস খাওয়ানো উচিৎ । ভাল চারণ ভূমিতে প্রতি হেক্টরে ৮০-১০০ টি ছাগল চরানো যায় । চারণ ভূমিতে দুর্বা, রোজী, পেঙ্গোলা প্রভৃতি জাতের ঘাস লাগানো যেতে পারে । এ ছাড়া অতিরিক্ত ঘাস সরবরাহের জন্য আলাদাভাবে নেপিয়ার, স্প্লেনডিডা ইত্যাদি ঘাসের চাষ করা যেতে পারে । এ ছাড়া বর্ষাকালে ঘাসের সাথে মাসকালাই ছিটিয়ে দিলে ঘাসের খাদ্যমান অনেক বেড়ে যায় । শীতকালে পর্যাপ্ত ঘাস পাওয়া যায় না বিধায় ছাগলকে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (ইউএমএস) খাওয়ানো যেতে পারে ।

ইউএমএস তৈরীর প্রণালীঃ

উপকরণ-

১।	২-৩ ইঞ্চি করে কাটা খড়	-	১০ কেজি,
২।	পানি	-	৬ লিটার
৩।	চিটাগুড়	-	২.২ কেজি
৪।	ইউরিয়া	-	৩০০ গ্রাম

প্রথমে পানি, চিটাগুড় ও ইউরিয়া মিশিয়ে উক্ত মিশ্রণ খড়ের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে । ইউরিয়া চিটাগুড় মিশানো খড় প্রতিদিন ছাগল প্রতি ০.৫-১.০ কেজি দিতে হবে । তবে এভাবে খড় খাওয়ানোর জন্য ছাগলকে ধীরে ধীরে অভ্যস্থ করে নিতে হবে ।

৩১.২ ঃ ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল পালন [২] ঃ

ছাগলকে মাঠে না ছেড়ে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় বাসস্থান, খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থপানা অনুসারে ছাগল পালনের প্যাকেজ প্রযুক্তি হলো ষ্টল ফিডিং প্রযুক্তি ।

৩১.২.১ ঃ ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে পালনের জন্য ছাগল নির্বাচন

ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে খামার করার উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক ও রোগ মুক্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ৬-১৫ মাস বয়সী ছাগী এবং ৫-৭ বয়সী পাঁঠা সংগ্রহ করতে হবে । ছাগল সংগ্রহ কালে ২৯.১ নং অধ্যয়ে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে ছাগল নির্বাচন করতে হবে ।

৩১.২.২ ঃ ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলের ঘর

ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে পালনের জন্য প্রতিটি বয়স্ক ছাগলের জন্য প্রায় ১০ বর্গ ফুট ঘরের জায়গা প্রয়োজন হয়। ঘরটি বাঁশ, কাঠ বা ইটের তৈরী হতে পারে । ঘর নির্মানের সময় ২৮.৩ নং অধ্যয়ে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে ঘর নির্মান করতে হবে । ঘরটি বাঁশের তৈরী হলে শীতের রাতে ঘরের বেড়া চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং মেঝেতে খড় বিছিয়ে দিতে হবে ।

৩১.২.৩ ঃ ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলকে ঘরে থাকতে অভ্যস্তকরণ

ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে পালনের জন্য সংগৃহীত ছাগলকে সংগ্রহের সাথে সাথেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখ উচিৎ নয় । প্রথমে ছাগলকে দিনে ৬-৮ ঘন্টা চরিয়ে বাকী সময় আবদ্ধ অবস্থায় রেখে পর্যাপ্ত খাদ্য (ঘাস ও দানাদার) সরবরাহ করতে হবে । এভবে ১-২ সপ্তাহের মধ্যে চরানোর সময় পর্যায়ক্রমে কমিয়ে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে । তবে ছাগল ছানাকে বাচ্চা বয়স থেকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখলে এই ধরণের অভ্যস্ত করণের প্রয়োজন নেই ।

৩১.২.৪ ঃ ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলের বাচ্চার পরিচর্যা

জন্মের পরপরই ছাগল ছানাকে পরিস্কার করে শাল দুধ খাওয়াতে হবে । এক মাস বয়স পর্যন্ত ছাগল ছানাকে দিনে ১০-১২ বার দুধ খাওয়াতে হবে । বাচ্চার চাহিদার তুলনায় মা ছাগীতে দুধ কম থাকলে প্রয়োজনে অন্য ছাগীর দুধ বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে । এ ছাড়া ছাগীর দুধ পাওয়া না গেলে বিকল্প দুধ বা মিল্ক রিপ্লেসার

খাওয়াতে হবে (টেবিল-৩১.২) । দুধ খাওয়ানোর আগে ফিডার, নিপলসহ আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র পানিতে ফুটিয়ে জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে । এক হতে দেড় কেজি ওজনের একটি ছাগল ছানার দৈনিক ২৫০-৩০০ গ্রাম দুধ প্রয়োজন । ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুধের পরিমান বৃদ্ধি করতে হবে । বাচ্চার বয়স ২-৩ মাস হলে বাচ্চা দুধ খাওয়া ছেড়ে দিবে । সাধারণতঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগীকে প্রয়োজনমত খাওয়ালে বাচ্চার প্রয়োজনীয় দুধ পাওয়া যায় । বাচ্চার ১ মাস বয়স হতে ধীরে ধীরে কাঁচা ঘাস ও দানাদার খাদ্যে অভ্যস্ত করাতে হবে । ছাগল ছানার পরিচর্যা সম্পর্কে বিস্তারিত ৩২ নং মড্যুলে আলোচনা করা হয়েছে ।

৩১.২.৫ ঃ ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলকে খাওয়ানো

ছাগল সাধারণতঃ তার ওজনের ৪-৫% হারে খেয়ে থাকে । এই খাদ্যের মধ্যে ৬০-৮০% আঁশ জাতীয় খাবার (ঘাস, লতা, পাতা, খড় ইত্যাদি) এবং ২০-৪০% দানাদার খাবার (কুড়া, ভূষি, চাল, ডাল, ছোলা ইত্যাদি) থাকতে হবে । একটি বাড়ন্ত খাসীকে দৈনিক ২০০-২৫০ গ্রাম দানাদার খাবার প্রদান করতে হবে (টেবিল-৩১.৪)। দুই থেকে তিন বাচ্চা বিশিষ্ট ২৫ কেজি ওজনের ছাগীর দৈনিক প্রায় ৩৫০-৪৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন হয় । একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পাঁঠার দৈনিক ২০০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন ।

উপাদান	শতকরা হার
গম/চাল/ভূট্টা ভাঙ্গা	৩৫.০০
গমের ভূষি/আটা/ কুড়া	২৪.০০
খেসারী/মাসকালাই/অন্য ডালের ভূষি	১৬.০০
সয়াবিন/তিল/নারিকেল/সরিষা প্রভৃতির খৈল	২০.০০
শুটকি মাছর গুড়া	১.৫০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	২.০০
লবন	১.০০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০

টেবিল-৩১.৪ ঃ ছাগলের দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ (%)

৩১.২.৬ ঃ ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলকে ঘাস, খড় খাওয়ানো

ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে একটি বাড়ন্ত খাসীকে দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি কাঁচা ঘাস প্রদান করতে হবে । দুই থেকে তিন বাচ্চা বিশিষ্ট ২৫ কেজি ওজনের ছাগীকে দৈনিক ১.৫-২.৫ কেজি কাঁচা ঘাস এবং একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পাঁঠাকে দৈনিক ১.৫-২.৫ কেজি কাঁচা ঘাস প্রদান করা প্রয়োজন । ঘাস পাওয়া না গেলে খড়কে ২-৩ ইঞ্চি পরিমান কেটে ইউরিয়া মোলাসেস দিয়ে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে । এ বিষয়ে ৩১.১.৭ ঃ নং অনুচ্ছেদে বিস্ত্মারিত আলোচনা করা হয়েছে ।

৩১.২.৭ ঃ খাসী করানো

ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো অধিকতর মাংস উৎপাদন । তাই এ পদ্ধতির খামারে প্রজনন উপযোগী কয়েকটি পাঁঠা রেখে বাকী সব পুরুষ ছাগলকে খাসী করানো হয়ে থাকে । খাসী করানোর মাধ্যমে ছাগলের মাংস গন্ধমুক্ত ও সুস্বাদু হয় । খাসীকরণের ফলে চামড়ার গুনগত মানও বৃদ্ধি পায় । এর ফলে ছাগল শান্ত ও নম্র স্বভাবের হয় এবং অনেক ছাগল একত্রে পালন সহজতর হয় । ২-৪ সপ্তাহ বয়সে

পাঁঠা বাচ্চাকে খাসী করানো উত্তম । খাসী করার জন্য বার্ডিজোস ক্যাস্ট্রেটর, রাবার রিং বা অন্ডকোষ কাটা পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে । এ ব্যাপারে ২৯.৫ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । খাসী করানোর পর ক্ষতস্থানে মাছি বা অন্য কোন পোকা বা আঠালি যেন না বসে সেজন্য টিংচার অব আয়োডিন দিয়ে পরিস্কার করে সালফানিলামাইড পাউডার ছিটিয়ে দিতে হবে ।

৩১.২.৮ ঃ পাঁঠা ব্যবস্থাপনা

পাঁঠাকে যখন প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হয় না তখন তাকে পর্যাপ্ত পরিমানে ঘাস খাওয়ালেই চলে । তবে প্রজনন কাজে ব্যবহারের সময় পাঁঠাকে ওজনভেদে ২০০-৫০০ গ্রাম পরিমান দানাদার খাবার দিতে হবে । প্রজনন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য প্রতিটি পাঁঠাকে দৈনিক ১০ গ্রাম পরিমান গাঁজানো ছোলা দেয়া প্রয়োজন । কোন ভাবেই পাঁঠার শরীরে চর্বি জমতে দেয়া উচিৎ নয় । প্রয়োজনে দানাদার খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে

৩১.২.৯ ঃ ছাগলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, খামারের জৈব নিরাপত্তা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

খামারের সব ছাগলকে বছরে কমপক্ষে দুই বার (বর্ষা ও শীতের শুরুতে) কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে । ছাগলের মারাত্মক রোগ যেমন- পিপিআর, গোটপক্স হলে দ্রুত নিকটস্থ প্রাণি হাসপাতাল বা ভেটেরিনারিয়ানের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । এ ছাড়া ছাগলের তড়কা, গলা ফুলা, এন্টারোটক্সিমিয়া, ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া হতে পারে । সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসার মাধ্যমে এ সকল রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । ছাগলের টিকাদান কর্মসূচী অনুসরণ করলে অনেক রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব (টেবিল-৩০.১) ।

জৈব নিরাপত্তাঃ খামারে নতুন ছাগল আনার ক্ষেত্রে অবশ্যই রোগমুক্ত ছাগল সংগ্রহ করতে হবে এবং ১৫ দিন খামার থেকে দূরে অন্যত্র পর্যবেক্ষণ (কোয়ারেন্টাইন) করতে হবে । কোন রোগ দেখা না দিলে ১৫ দিন পর পিপিআর ভ্যাক্সিন দিয়ে ছাগল খামারে অন্যান্য ছাগলের সাথে রাখা যাবে । অসুস্থ ছাগলকে পালের অন্য ছাগল থেকে দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে । ছাগলের ঘর নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে । সকল ছাগলকে বছরে ৫-৬ বার ০.৫% ম্যালাথায়ন দ্রবণে চুবিয়ে বহিঃপরজীবি মুক্ত রাখতে হবে । প্রজননশীল পাঁঠা ও ছাগীকে বছরে দুইবার ১.০-১.৫ মি.লি. ভিটামিন এ, ডি. ই ইনজেকশন দিতে হবে ।

৩১.২.১০ ঃ ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে পালিত ছাগল বাজারজাতকরণ

সুষ্ঠু খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় ১২-১৫ মাসের মধ্যে খাসী ২০-২২ কেজি ওজনের হয় । এ সময় খাসী বিক্রি করা যেতে পারে অথবা খাসীর মাংস প্রক্রিয়াজাত করেও বিক্রি করা যেতে পারে ।

সূত্রঃ

১. সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে দেশী ছাগল পালন, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা, জুন, ২০০১
২. ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল পালন, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা, মার্চ, ২০০৩

মডিউল - ৩২ ঃ
ছাগল ছানার মৃত্যু হার রোধে করণীয়

ধারণা করা হয় যে বর্তমানে বাংলাদেশে ছাগলের সংখ্যা প্রায় দুই কোটি । দেশের মোট ছাগলের শতকরা ৪৫ ছাগীই বাচ্চা উৎপাদনে সক্ষম । প্রতি বৎসর দেশে যে পরিমান ছাগলের বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে থাকে তার প্রায় ৩০ ভাগই বিভিন্ন কারণে মারা যায় । এতে দেশ বিপুল পরিমান আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে । অথচ ছাগল ছানার উপযুক্ত খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বাসস্থান ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাচ্চা মৃত্যুর হার রোধ করা সম্ভব । ছাগল ছানার জন্মকালীন ওজন, মৃত্যুর হার এবং বিভিন্ন সংক্রামক ও বিপাকীয় রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি ছাগী ও প্রজননকালে ব্যবহৃত পাঁঠার প্রজনন ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল । প্রজননকালীন সময় ছাগীর দৈহিক অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ । ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের একটি ছাগী সাধারণতঃ ৪-৫ মাস বয়সের মধ্যে গরম হয় । এসময় প্রজনন না করানো ভাল । ছাগীর দৈহিক ওজন কমপক্ষে ১২-১৩ কেজি হলে তাকে প্রজনন করানো উচিৎ । অন্যথায় কম দৈহিক ওজনের ছাগীকে প্রজনন করালে প্রসবকৃত বাচ্চার ওজন কম হয়ে থাকে যা বাচ্চা মৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ । এ ছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় বা কম ওজনের সময় গর্ভধারণ করলে ছাগীর দুধ উৎপাদন কম হয়, যা বাচ্চার বেঁচে থাকার ন্যুনতম প্রয়োজন মেটাতে পারে না । ফলে জন্মের কয়েকদিন পরেই ছাগল ছানার মৃত্যু ঘটে । আবার ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের একটি ছাগী এক সাথে ৩-৪ টি বাচ্চা প্রসব করে । কিন্তু ছাগীর দুধের বাট দুটি হওয়ায় সবগুলো বাচ্চা একসাথে মায়ের দুধ খেতে পায় না । ফলে অপেক্ষাকৃত দূর্বল বাচ্চা আরও দূর্বল হয়ে পড়ে । বাচ্চা মৃত্যুর হার রোধ করতে হলে ছাগীর গর্ভকালীন সময় হতে প্রসব পরবর্তী সময় পর্যন্ত মা ও ছাগল ছানার বিশেষ যত্ন নিতে হবে । নিম্নে ছাগল ছানার মৃত্যু হার রোধে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো ।

৩২.১ ঃ ছাগল ছানার মৃত্যু হার রোধে ছাগীর গর্ভকালীন ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগল ছানার মৃত্যু হার রোধে ছাগীর গর্ভকালীন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগল ছানার মৃত্যু হার রোধে ছাগীর গর্ভকালীন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

- ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের একটি ছাগী সাধারণতঃ প্রতিবারে ২-৪ টি বাচ্চা প্রসব করে । তাই গর্ভবতী ছাগীকে পর্যাপ্ত সুষম ও পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করতে হবে । এতে বাচ্চা ও ছাগীর রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে এবং ছাগল ছানার জন্মকালীন ওজন বৃদ্ধি পাবে । অন্যথায় জন্মের সময় বাচ্চা ওজনে কম ও দূর্বল হতে পারে; ফলে বাচ্চা মৃত্যুর হার বেড়ে যেতে পারে ।
- গর্ভেধারণের প্রথম তিন মাসে ছাগীকে যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তা গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায় এবং ছাগীর স্তন টিস্যুর বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। গর্ভের শেষ দুই মাসে ছাগী ও বাচ্চার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পরিমান কাঁচা ঘাস, দানাদার খাদ্য, ভিটামিন ও মিনারেল সাপ্লিমেন্ট এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা উচিৎ । এতে গর্ভস্থ বাচ্চার সুষম বৃদ্ধি ঘটবে এবং প্রসবকৃত বাচ্চার মৃত্যুর হার কমে যাবে ।
- যে সব ছাগীকে পূর্বে পিপিআর, গোটপক্স, একথাইমা, ব্রুসেলোসিস প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হয় নি তাদেরকে গর্ভের ৫ম মাসে উক্ত টিকাসমূহ প্রদান করতে হবে । এতে বাচ্চা তার মা থেকে উক্ত রোগসমূহের প্রতিষেধক পাবে ।
- গর্ভের শেষ ১-২ সপ্তাহে ছাগীকে ব্রড স্পেকট্রাম কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে ।
- গর্ভকালীন সময়ে অপুষ্টিতে আক্রান্ত বা ক্ষীণ স্বাস্থ্যের ছাগীকে সুষম খাবার সরবরাহের পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে একটি করে কাঁচা বা সিদ্ধ ডিম খাওয়ানো যেতে পারে । এতে ছাগীর আমিষের চাহিদা কিছুটা পূরণ হবে এবং গর্ভস্থ বাচ্চাও সবল হবে ।

গর্ভকালীন সময়ে ছাগীকে নিম্নের ছক অনুসারে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা হলে ছাগী সুস্থ সবল থাকবে এবং নবজাতক ছাগল ছানার ওজন বেশী হবে ।

ছাগীর ওজন (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম/দিন)	ঘাস (কেজি/দিন)	পানি (লিটার/দিন)
১৫	৮০০	২.২৫	১.৫
২০	৯০০	২.৪	১.৫
২৫	১০০০	২.৬	১.৫
৩০	১১০০	২.৮	২.০
৩৫	১২০০	৩.০	২.০
৪০	১২৫০	৩.৫	২.০

টেবিল ৩২.১ ঃ গর্ভকালীন সময়ে ছাগীর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

৩২.২ ঃ ছাগীর প্রসব পূর্ববর্তী ও প্রসবকালীন ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগীর প্রসব পূর্ববর্তী ও প্রসবকালীন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগীর প্রসব পূর্ববর্তী ও প্রসবকালীন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

- আসন্ন প্রসবা ছাগীকে প্রসবের কমপক্ষে ১-২ সপ্তাহ পূর্বে দলের অন্যান্য ছাগল হতে আলাদা করে একটি পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন, জীবানুমুক্ত ঘরে (প্রসুতি ঘর) রাখতে হবে ।
- প্রসুতি ঘরের মেঝে শুকনো, পরিস্কার ও জীবানুমুক্ত খড়-বিচালী বা চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে । অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম হতে ছাগীকে রক্ষা করতে হবে ।
- মশা-মাছি ও অন্যান্য কীট পতঙ্গের উৎপাত হতে ছাগীকে রক্ষা করতে হবে ।
- ছাগীকে যথারীতি সুষম ও পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করতে হবে ।
- প্রসবের লক্ষণ প্রকাশ পেলে ছাগীর পিছনের অংশ ও ওলান পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর ০.৫-১.০% দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে-মুছে দিতে হবে ।
- এসময় ছাগীর পাশে উপস্থিত থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রসবে সহায়তা করতে হবে (যেমন-বাচ্চার পা টেনে বের করা) ।
- প্রসবের সাথে সাথে বাচ্চাকে মায়ের সামনে দিতে হবে যাতে ছাগী বাচ্চার শরীর চেটে পরিস্কার করতে পারে। বাচ্চার নাক শ্লেষ্মাতে আটকে থাকার কারণে দম বন্ধ হয়ে বাচ্চা মারা যেতে পারে তাই প্রসবের সাথে সাথে বাচ্চার সমস্ত শরীর ও নাকের শ্লেষ্মা সরিয়ে নাকের মধ্যে ফু দিয়ে বাচ্চার শ্বাস প্রশ্বাসে সহযোগীতা করতে হবে।
- শীতের সময় দ্রুত বাচ্চার শরীর মুছে না দিলে শীতে বাচ্চার শরীরের অতিরিক্ত তাপমাত্রা দ্রুত হারাতে থাকে এবং বাচ্চা কাঁপতে কাঁপতে মারা যায় । এজন্য বাচ্চাকে উষ্ণ স্থানে অর্থ্যাৎ খড় বা চটের উপর রেখে চারদিক চট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে অথবা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
- বাচ্চা প্রসবের পরপরই বাচ্চার নাভি ২-৩ সে.মি. রেখে বাকী অংশ কেটে দিতে হবে এবং উক্ত স্থানে টিংচার অব আয়োডিন লাগিয়ে দিতে হবে ।
- প্রসবের পর ছাগীকে স্যালাইন খেতে দেওয়া ভাল ।

- ছাগীর জরায়ুতে যাতে ইনফেকশন না হয় সেজন্য জননাঙ্গকে ০.৫-১.০% পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে । প্রয়োজনে জরায়ুতে এন্টিবায়োটিক বোলাস প্রয়োগ করতে হবে ।

৩২.৩ ঃ ছাগল ছানার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগল ছানার খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগল ছানার খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

- সদ্য প্রসূত বাচ্চার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন শক্তি । নবজাত ছাগল ছানা শক্তি পায় মায়ের দুধ হতে । তাই প্রসবের ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে ছাগল ছানাকে মায়ের শাল দুধ খেতে সাহায্য করতে হবে । শাল দুধ দোহন করে বোতলে খাওয়ানো যেতে পারে ।
- খেয়াল রাখতে হবে যে সকল বাচ্চা যেন সমভাবে দুধ পায় । অপেক্ষাকৃত দূর্বল বাচ্চাকে নিজের হাতে ধরে মায়ের দুধ খাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে । জন্মের পর ১ম ৪-৫ দিন বাচ্চাকে শাল দুধ খাওয়াতে হবে ।
- জন্মের সময় বাচ্চার ওজন ১ কেজির কম হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি এক সপ্তাহ পর্যন্ত চিনির সিরা/ডেক্সট্রোজ দিনে ৩-৪ বার খাওয়ানো যেতে পারে । এতে বাচ্চার শরীরে শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বাচ্চা মৃত্যুর হার কমে যায় ।
- ছাগীর দুধ উৎপাদন কম কিন্তু বাচ্চার সংখ্যা যদি বেশী হয় তাহলে তিন মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে মায়ের দুধের পাশাপাশি কৃত্রিম উপায়ে গাভীর দুধ, বার্লি, পাউডার মিল্ক, ভাতের মাড় প্রভৃতি খাওয়ানো যেতে পারে।
- গরুর দুধ পাওয়া না গেলে প্রয়োজনে ছাগল ছানাকে মিল্ক রিপ্লেসার তৈরী করে দিনে ৩-৪ বার খাওয়ানো যেতে পারে । এতে ননীমুক্ত গুড়া দুধ (স্কিম মিল্ক) ৭০ ভাগ; চাল,গম বা ভূট্টার গুড়া ২০ ভাগ, সয়াবিন তেল ৭ ভাগ, লবন ১ ভাগ, ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট ১.৫ ভাগ এবং ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স ০.৫ ভাগ থাকে । উক্ত মিশ্রণের একভাগ, নয়ভাগ পানির সাথে মিশিয়ে ভালমত ফুটানোর পর ঠান্ডা করে ছাগল ছানাকে খাওয়াতে হবে।
- ছাগল ছানার ১৫ দিন বয়স হতে অল্প অল্প করে দানাদার খাদ্য এবং আঁশ জাতীয় খাবার (কাঁচা ঘাস, গাছের পাতা প্রভৃতি) খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে ।
- যে সকল ছাগল ছানা দীর্ঘ সময় ধরে মায়ের অপর্যাপ্ত দুধ পাওয়ার কারণে দূর্বল হয় তাদেরকে অন্যান্য সুষম খাবার সরবরাহের পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটি করে কাঁচা বা সিদ্ধ ডিম খাওয়ানো যেতে পারে । এতে ছাগল ছানার আমিষের চাহিদা কিছুটা পূরণ হবে এবং বাচ্চা সুস্থ ও সবল হবে ।

ছাগল ছানাকে নিম্নের ছক অনুসারে সুষম খাদ্য সরবরাহ করা হলে ছাগল ছানা সুস্থ সবল থাকবে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাবে ঃ

বয়স	প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ছাগলের দুধ খাওয়ানোর পরিমান	প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য দানাদার খাদ্য খাওয়ানোর পরিমান	কাচা ঘাস
০-১৪ দিন	১৫০ গ্রাম	-	-
১৫-৩০ দিন	১৫০ গ্রাম	সামান্য পরিমান	সামান্য পরিমান
৩১-৪২ দিন	১৫০ গ্রাম	২০ গ্রাম	সামান্য পরিমান
৪৩-৫৬ দিন	১৩০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
৫৭-৭০ দিন	১১০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
৭১-৯০ দিন	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী

টেবিল ৩২.২ ঃ বয়সভেদে ছাগল ছানার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

৩২.৪ ঃ ছাগল ছানার বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগল ছানার বাসস্থান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগল ছানার বাসস্থান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

- ছাগল ছানার মৃত্যু হার রোধের জন্য বাসস্থান ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।
- সদ্য প্রসূত ছাগল ছানাকে পরিস্কার পরিচ্ছন ও শুষ্ক জায়গা (ব্রুডিং পেন) তে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে ।
- শীতের সময় মেঝেতে ছালা বা খড় বিছিয়ে মার সাথে ছাগল ছানাকে রাখতে হবে ।
- প্রয়োজনে ছাগল ছানার শরীর গরম কাপড়া বা ছালা দিয়ে ঢেকে দেয়া যেতে পারে ।
- ছাগলের ঘরের বেড়া বা দেয়াল চট দিয়ে ঢেকে দেয়া দেতে পারে যাতে ঘর হতে শীত শীত ভাব দূর হয় ।
- প্রতিদিন খাদ্য ও পানির পাত্র পরিস্কার করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন ঘর ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে না হয় ।
- শীতে বা বৃষ্টির সময় ছাগর ছানাকে ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া উচিৎ নয় । এতে ঠান্ডা লেগে ছাগল ছানার নিউমোনিয়া হতে পারে ।
- বড় প্রাণীর আক্রমন হতে ছাগল ছানাকে রক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে ।

৩২.৫ ঃ ছাগল ছানার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগল ছানার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগল ছানার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

ছাগল ছানার পরজীবি নিয়ন্ত্রণ ঃ
বিভিন্ন কারণে ছাগল ছানার শরীরে উঁকুন, আঠালী, মাইট প্রভৃতি পরজীবির সংক্রমন হতে পারে । এর ফলে বাচ্চা রক্তশূন্যতায় ভুগে দূর্বল হয়ে পড়ে এবং মারা যায় । এ সব পরজীবির আক্রমন প্রতিরোধের জন্য ছাগল ছানাকে উঁকুন নাশক সাবান দিয়ে অথবা ০.৫% ম্যালাথিয়নের পানিতে গোসল করাতে হবে । ছাগল ছানার বয়স ২ মাস হলেই প্রতি সপ্তাহে দুইবার একে সাধারণ পানিতে গোসল করাতে হবে । শরীরে উঁকুন, আঠালী, মাইট প্রভৃতি পরজীবির সংক্রমন দেখা দিলে মাসে দুইবার ০.৫% ম্যালাথিয়নের পানিতে বাচ্চাকে গোসল করাতে হবে । গোসলের পরপরই ছাগল ছানার শরীর কাপড় বা ছালা দিয়ে মুছে দিতে হবে ।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে ছাগল ছানার পেটে গোল কৃমি, ফিতা কৃমি এবং যকৃত কৃমিসহ বিভিন্ন ধরণের কৃমি হতে থাকে । এর ফলে ছাগলের খাদ্য হজম কমে যায় এবং হজমকৃত খাদ্য শোষণে ব্যাঘাত ঘটে । এক পর্যায়ে বাচ্চা অপুষ্টিতে দূর্বল হয়ে মারা যেতে পারে । তাই বাচ্চার বয়স একমাসের অধিক হলে প্রতি চার মাস পরপর পায়খানা পরীক্ষা করে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে ।

ছাগল ছানার নিউমোনিয়া নিয়ন্ত্রণ ঃ
ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাংগাস প্রভৃতি জীবানু দ্বারা বিভিন্ন সময়ে ছাগল ছানার নিউমোনিয়া হতে পারে । প্রচন্ড শীত, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতকালীন সময় এবং ভেজা স্যাঁতসেঁতে ও অপরিস্কার বাসস্থান এ রোগের

সংক্রমন ত্বরান্বিত করে । এ ছাড়া শ্বাস নালীতে খাবার বা ঔষধ জাতীয় কোন পদার্থ ঢুকে গেলে এসপিরেশন নিউমোনিয়া হতে পারে । নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণগুলো হচ্ছে ঃ

- ঘন ঘন নিঃশ্বাস ও অল্প জ্বর (প্রধান লক্ষণ)
- শ্বাস প্রশ্বাসের সময় শব্দ হওয়া (ঘড়ঘড় শব্দ)
- রোগের শেষ পর্যায়ে শ্বাস কষ্ট
- ঘন ঘন কাশি এবং কাশির সময় বুকে ব্যাথা
- নাক দিয়ে সাদা ফেনাযুক্ত সর্দি বের হওয়া
- খাদ্য গ্রহণে অরুচি ও অনীহা
- বাচ্চার শরীরের তাপমাত্রা এক পর্যায়ে কমে যাওয়া এবং শ্বাসকষ্টে মৃত্যুবরণ

ছাগল ছানার নিউমোনিয়া রোগ হলে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী এর চিকিৎসা করাতে হবে । নিউমোনিয়া রোগ কোন একক সুনির্দিষ্ট জীবানু দ্বারা হয়না বলে টিকা দিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায় না । খামারের উন্নত ব্যবস্থাপনা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং অতিরিক্ত শীত, বৃষ্টি ইত্যাদি হতে ছাগল ছানাকে রক্ষার মাধ্যমে নিউমোনিয়া রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব । ঠান্ডা এড়ানোর জন্য শীতকালে গরম কাপড় বা চট দিয়ে ছাগল ছানাকে ঢেকে দিতে হবে এবং মেঝেতে খড়/চট বিছিয়ে তার উপর বাচ্চাকে রাখতে হবে ।

ছাগল ছানার ডায়রিয়া/পেটের পীড়া নিয়ন্ত্রণ ঃ

ছাগল ছানা জন্মের ১২-৪৮ ঘন্টার মধ্যে ই. কোলাই নামক এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা পেটের পীড়া রোগ হয় । বাচ্চার জন্মের পরপরই শাল দুধ খাওয়ালে এই রোগ হয় না । পেটের পীড়ার লক্ষণঃ

- সাদা বা হলুদ বর্ণের পাতলা পায়খানা হয়
- মুখ দিয়ে অত্যধিক লালা পড়ে
- বাচ্চার খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যায়
- বাচ্চা নিস্তেজ হয়ে যায়
- শরীরের তাপমাত্রা কমে যায়
- পেটে গ্যাস জমে যেতে পারে, ফলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়
- সময় মত চিকিৎসা না করালে ১২-১৪ ঘন্টার মধ্যে বাচ্চা মারা যায়

ছাগল ছানার পেটের পীড়া হলে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী এর চিকিৎসা করাতে হবে । দেহের পানি শূন্যতা পূরণের জন্য আক্রান্ত ছাগল ছানাকে ঘন ঘন স্যালাইন খাওয়াতে হবে ।

ছাগল ছানার টিকা প্রদান ঃ

রোগ প্রতিরোধ রোগ নিরাময়ের চেয়ে উত্তম । ছাগল ছানার কয়েকটি মারাত্মক রোগ টিকা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব । ছাগল ছানার মৃত্যুহার রোধ করতে হলে সময়মত এসব টিকা প্রয়োগ করতে হবে । নিম্নে বিভিন্ন বয়সে ছাগল ছানার টিকার বিবরণ ছক আকারে দেখানো হলো ঃ

টিকার নাম	প্রয়োগের বয়স		
	১ম ডোজ	২য় ডোজ	৩য় ডোজ
পিপিআর টিকা	৪ মাস		
ক্ষুরারোগ টিকা	৩ মাস		
গোট পক্স টিকা	৫ মাস		
এন্টারো টক্সিমিয়া টিকা	৬ মাস		
কন্টাজিয়াস একথাইমা টিকা	১-৩ দিন	১০-১৪ দিন	৩ মাস

টেবিল ৩২.৩ ঃ ছাগল ছানার টিকাদান সময়সূচি

মডিউল - ৩৩ ঃ
ভেড়া পালন

৩৩.১ঃ বাংলাদেশে ভেড়া পালনের সুবিধা ও সমস্যাসমূহ

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশে ভেড়া পালনের সুবিধা ও সমস্যাসমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন বাংলাদেশে ভেড়া পালনের সুবিধা ও সমস্যাসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ।

ভেড়া ছাগলের মতই একটি সম্ভাবনাময় চতুষ্পদ প্রাণী । সুদূর অতীত কাল হতে মানুষ পশম ও মাংসের জন্য ভেড়া পালন করে আসছে । বাংলাদেশের সর্বত্রই কমবেশী ভেড়া পালন করা হয়ে থাকে । তবে দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে এবং বরেন্দ্র অঞ্চলে ভেড়া পালন উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী । বাংলাদেশে ভেড়া পালন একটি লাভজনক পেশা হতে পারে । ভেড়ার খামারে বিনিয়োগকৃত অর্থ অতি অল্প সময়ে উঠে আসে ।

ভেড়া পালনের সুবিধাগুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

১. অল্প জায়গাঃ ভেড়া পালনের জন্য খুব বড় চারণভূমি না হলেও চলে । অল্প জায়গাতেই ভেড়া পালন করা সম্ভব।
২. খাদ্যঃ ভেড়া পালনের জন্য খুব বেশী খাদ্যের প্রয়োজন হয় না । বসত-বাড়ির আশেপাশের পতিত জমি, ক্ষেতের আইল এবং রাস্তার পার্শ্বের ঘাস ও লতাপাতা খেয়ে এরা প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান করতে পারে ।
৩. সহজ পরিচর্যাঃ ভেড়া পরিচর্যা সহজ । তাই ভেড়ার খামারে তুলনামূলকভাবে কম শ্রমের প্রয়োজন হয়। ভেড়া শান্ত প্রাণী হওয়ায় একজন মহিলা বা বাচ্চা ছেলের পক্ষেও একসাথে অনেকগুলো ভেড়ার পরিচর্যা করা সম্ভব ।
৪. স্বল্প মূল্য/সহজ বিনিয়োগঃ ছোট প্রাণী হওয়ায় ভেড়ার একক মূল্য কম । তাই ভেড়া পালনের জন্য তুলনামূলকভাবে কম মূলধনের প্রয়োজন হয় । ফলে দরিদ্র বা নিম্ন আয়ের মানুষের পক্ষেও ভেড়া পালনে বিনিয়োগ করা সম্ভব ।
৫. মাংস উৎপাদনঃ বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে যে সব ভেড়া পালন করা হয় তা মূলতঃ মাংস উৎপাদনের জন্য । ভেড়ার মাংস সুস্বাদু । একটি পূর্ণ বয়স্ক ভেড়া হতে গড়ে ২৫-৩০ কেজি মাংস পাওয়া যায় ।
৬. পশম উৎপাদনঃ বাংলাদেশে স্থানীয় ভাবে পালিত ভেড়াগুলো উন্নত জাতের না হওয়ায় এদের পশমও উন্নত মানের নয় । তবে এসব ভেড়া হতে প্রাপ্ত পশম হতে রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও প্রভৃতি অঞ্চলে কম্বল তৈরী করা হয়।

বাংলাদেশে ভেড়া পালনের সমস্যাগুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

বাংলাদেশে পারিবারিকভাবে যে সব ভেড়া পালন করা হয় তা উন্নত জাতের নয় । উচ্চ উৎপাদনশীল ভেড়া এদেশে পালন না করার কারণে এদের পশমের গুনগত মানও নিম্ন এবং গড় মাংস উৎপাদনও কম । ভেড়া পালন সংকান্ত জ্ঞানের অভাব এবং ভেড়া পালনে আগ্রহের অভাব এদেশে ভেড়া উৎপাদন বৃদ্ধির পথে একটি অন্যতম অন্তরায় । ভেড়ার খাদ্য, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণেও এসব ভেড়া হতে কাঙ্খিত উৎপাদনশীলতা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না । এ ব্যাপারে খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এদেশে পালন উপযোগী ভেড়া আমদানী করলে বাংলাদেশের খামারীগন ভেড়া পালন করে লাভবান হতে পারবে ।

৩৩.২ঃ ভেড়ার জাত ও শ্রেণী

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ভেড়ার জাত ও শ্রেণী সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ভেড়ার জাত ও শ্রেণী সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ।

আমরা পূর্বেই জেনেছি ভেড়া হতে দুধ, মাংস ও পশম উৎপাদন করা হয়ে থাকে । দুধ, মাংস ও পশম উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে ভেড়ার বিভিন্ন জাতের শ্রেণী বিন্যাস করা হয়ে থাকে । **দুগ্ধ উৎপাদন কারী ভেড়ার উল্লেখযোগ্য জাতগুলো হচ্ছেঃ**

১. ডরসেট
২. ফিনশিপ
৩. কুপওয়ার্থ
৪. পলিপে
৫. রোমানভ
৬. ফ্রিজিয়ান
৭. রাম্বুইলেট
৮. আইসল্যান্ডিক
৯. শ্রপশায়ার
১০. টারঘি ইত্যাদি

দুধ উৎপাদনের জন্য ইউরোপের অনেক খামারে ভেড়া পালন করা হয়ে থাকে । ইউরোপ ও আমেরিকায় ফ্রেশ পনির ও ইয়োগার্ট তৈরীতে ভেড়ার দুধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে । বাচ্চা দেওয়ার পর প্রতি ল্যাকটেশনে একটি ভেড়ী গড়ে ১০০ দিন দুধ প্রদান করে থাকে । ইউরোপের দুগ্ধ প্রদানকারী ভেড়ার জাত হতে গড়ে ২ হতে ৩.৫ লিটার পর্যন্ত দুধ পাওয়া যায় । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুগ্ধ প্রদানকারী ভেড়া হতে গড়ে প্রতিদিন ১ লিটার দুধ পাওয়া যায় ।

চিত্র-৩৩.১ঃ লিংকন জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.২ঃ রাম্বুইলেট জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.৩ঃ রোমানভ জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.৪ঃ টারঘি জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.৫ঃ ডরসেট জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.৬ঃ রোমনি মার্শ জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.৭ঃ আইসল্যান্ডিক জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.৮ঃ মেরিনো জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.৯ঃ ফ্রিজিয়ান জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.১০ঃ কটসওয়াল্ড জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.১১ঃ লোহি জাতের ভেড়া

পশম উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে ভেড়ার নিম্নবর্ণিত শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছেঃ

সরু পশম উৎপাদনকারী ভেড়া -	ক) মেরিনো
	খ) রাম্বুইলেট
লম্বা পশম উৎপাদনকারী ভেড়া -	ক) রোমনি মার্শ
	খ) লেষ্টার
	গ) লিংকন
	ঘ) কটসওয়াল্ড
মাঝারী পশম উৎপাদনকারী ভেড়া-	ক) ডরসেট
	খ) সেভিয়ট
	গ) শর্পশায়ার
	ঘ) সাফোক
কার্পেট পশম উৎপাদনকারী ভেড়া-	ক) ব্ল্যাক ফেস্‌ড
	খ) লোহি
	গ) হাইল্যান্ড
ফার পশম উৎপাদনকারী ভেড়া -	ক) কারাকুল

মেরিনো জাতের প্রতিটি ভেড়া হতে বছরে গড়ে ৮-১০ কেজি পশম পাওয়া যায় । রোমনি মার্শ জাতের ভেড়া হতে প্রতি বছর গড়ে ৫-১২ কেজি পশম পাওয়া যায় ।

মাংস উৎপাদনের জন্য বিশ্বের অনেক দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভেড়া পালন করা হয়ে থাকে । এর মধ্যে নিউজিল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য । মাংসল জাতের একটি পূর্ণ বয়স্ক ভেড়া হতে গড়ে ৪৫-৮০ কেজি মাংস পাওয়া যায় । উল্লেখযোগ্য **মাংসল জাতের ভেড়াগুলো হচ্ছেঃ**

ক) মেরিনো	(দৈহিক ওজনঃ ৬৫-১০০ কেজি)
খ) রোমনি মার্শ	(দৈহিক ওজনঃ ৮৫-১১০ কেজি)
গ) লিংকন	(দৈহিক ওজনঃ ৮০-১২০ কেজি)
ঘ) সেভিয়ট	(দৈহিক ওজনঃ ৬০-১০০ কেজি)

বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে যে সব ভেড়া পালন করা হয় তা উন্নত জাতের নয় । এগুলোর মধ্য হতে উচ্চ উৎপাদনশীল ভেড়া সনাক্ত করে উন্নত জাতের সাথে ওগুলোর সংকরায়নের মাধ্যমে এদেশে ভেড়ার জাত উন্নয়ন করা প্রয়োজন ।

৩৩.৩ ঃ ভেড়ার বাসস্থান ও পরিচর্যা

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ভেড়ার বাসস্থান ও পরিচর্যা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ভেড়ার বাসস্থান ও পরিচর্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ।

প্রচলিত পদ্ধতিতে ভেড়া পালন করলে ভেড়ার জন্য আলাদা বিশেষ কোন ঘরের প্রয়োজন হয় না । গোয়াল ঘর, মানুষের থাকার ঘরের এক পার্শ্বে কিংবা ঘরের পাশের বারান্দায় ভেড়া পালন করা হয়ে থাকে । তবে বেশী সংখ্যায় পালন করলে আলাদা ভাবে ভেড়ার ঘর নির্মান করা উচিৎ । বাঁশ, ছন বা খড় দিয়ে ভেড়ার ঘর তৈরী করা যেতে পারে । ঘরের মেঝে উঁচু করে তৈরী করতে হবে যাতে মেঝে সব সময় শুকনো থাকে ।

প্রয়োজনে ঘরে মাচা তৈরী করা যেতে পারে যাতে ঘর স্যাঁতসেঁতে না হয় । শুকনো খড় বা ছালা দিয়ে ভেড়ার বিছানা করে দেয়া যেতে পারে; এতে মেঝে শুকনো থাকবে । রোগ ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য ভেড়ার ঘর নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন ।

৩৩.৪ ঃ ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ।

ভেড়া থেকে ভাল উৎপাদন পেতে হলে চাহিদা মোতাবেক সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে । দুধ, মাংস ও পশম উৎপাদনে প্রচুর প্রোটিন বা আমিষের প্রয়োজন হয় । তাই ভেড়া হতে অধিক মাংস ও পশম পেতে হলে ভেড়াকে ঘাস, খড় ও লতা-পাতা খাওয়ানোর সাথে সাথে প্রোটিন জাতীয় দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে ।

ভেড়াকে নিম্ন বর্ণিত খাদ্য পরিমানমত খাওয়ানো যেতে পারে ঃ
ক) সবুজ ঘাস/রাফেজ জাতীয় খাদ্যঃ

- নেপিয়ার ঘাস
- পারা ঘাস
- ভূট্টা ঘাস
- গিনি ঘাস
- আলফা আলফা
- কাউপি
- বাঁধা কপি
- সূর্যমুখী গাছ, সরিষা গাছ, গোল আলু গাছ, আনারসের মাথা প্রভৃতি ।

খ) দানাদার খাদ্য

- খৈল (তুলাবীজ, নারকেল, তিল, তিসি, সয়াবিন, সরিষা, বাদাম প্রভৃতির খৈল)
- বীজ (সয়াবিন, জোয়ার, তুলাবীজ ইত্যাদি)
- ভূষি (গম, ভূট্টা, ছোলা ইত্যাদি)
- শুটকি মাছের গুড়া
- হাড়ের গুড়া
- রক্তের গুড়া
- গম ভাঙা, চাল ইত্যাদি ।

১.	সবুজ ঘাস	–	১.০ কেজি
২.	ঘাসের সাইলেজ	–	১-১.৫ কেজি
৩.	খড় (ভূট্টা, জোয়ার)	–	পরিমান মত
৪.	তিল/তিসি/সয়াবিন গুড়ো	–	১২০ গ্রাম
৫.	চুনা পাথর গুড়ো	–	০.২৫ আউন্স

টেবিল-৩৩.১ঃ ৫০ কেজি দৈহিক ওজনের একটি ভেড়ার খাদ্য ফর্মুলা

৩৩.৫ ঃ ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই প্যাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ।

লাভজনকভাবে ভেড়া পালন করতে হলে এর বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন । ভেড়া হতে অধিক পরিমানে মাংস, দুধ ও পশম পেতে হলে যেমন একে সুষম খাবার সরবরাহ করা প্রয়োজন তেমনি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভেড়াকে রোগ ব্যাধি মুক্ত রাখা প্রয়োজন । স্বাস্থ্যসম্মতভাবে লালন পালন করলে ভেড়ার অনেক সংক্রামক রোগ দমন/নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ।

পরজীবি নিয়ন্ত্রণঃ
ভেড়ার পশমের ভেতওে উঁকুন, আঠালি ও মাইট জাতীয় পোকার আক্রমন হয়ে থাকে । এসব পোকা রক্ত চুষে খায় বলে ভেড়ার উৎপাদন ক্ষমতা বাধাগ্রস্থ হয় । টক্সাফেন, ম্যালাথিয়ন প্রভৃতি ইনসেক্টিসাইড প্রয়োগ করে ভেড়াকে এসব পোকার আক্রমন হতে মুক্ত রাখা সম্ভব । এসব ইনসেক্টিসাইড পানিতে গুলে ভেড়ার শরীরে স্প্রে করতে হবে । কিংবা পানিতে মিশিয়ে উক্ত পানিতে ভেড়াকে চুবাতে (ডিপিং) হবে । এসব ঔষধ খুবই বিষাক্ত বিধায় খেয়াল রাখতে হবে যেন ঔষধ মিশানো পানি ভেড়ার মুখের ভিতরে, চোখে বা নাকে প্রবেশ না করে । এ ছাড়া অন্তঃপরজীবি হতে মুক্ত রাখার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ভেড়াকে নিয়মিত কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে ।

সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণঃ

ভেড়ার রোগ ব্যাধির মধ্যে কয়েকটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি রয়েছে । এগুলো হলো ঃ ক্ষুরারোগ, তড়কা, গলাফুলা, জলাতংক, বসন্ত, ধনুষ্টংকার প্রভৃতি । নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা প্রদান করে এসব রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ।

ভেড়ার পশম বড় হলে কাঁচি বা মেশিন দিয়ে ছোট করে ফেলা উচিৎ । এতে ভেড়া যেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তেমনি উৎপাদনও বৃদ্ধি পায় । পশম কাটা/ছাটার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ যাতে চামড়া/মাংস কাটা না পড়ে । কেটে গেলে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা উচিৎ এবং এন্টি সেপটিক ব্যবহার করা উচিৎ যাতে সংক্রমন না হয় ।বাচ্চা প্রসবের পূর্বে ও পরে প্রসুতি ও নবজাতক ছানার বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিৎ । পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাচ্চা প্রসব করালে প্রসবকালীন রোগ-ব্যাধি হতে ভেড়াকে মুক্ত রাখা সম্ভব হয় । এ সময় মায়ের জন্য ও বাচ্চার জন্য বিশেষ খাদ্যের ব্যবস্থা করা উচিৎ ।